সুভাষচন্দ্রের অন্যান্য রচনা

ভারত পথিক

পত্রাবলী ১৯১২-৩২

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম

১৯২০—১৯৪২

প্রথম খণ্ড

সূচী

প্রারম্ভ চিত্র

ডাবলিনে গৃহীত আলোকচিত্র- ১৯৩৬

নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২" এর প্রথম খণ্ডের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পাঠক-সমাজের স্বার্থে ও প্রকাশের সুবিধার জন্য গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে মূল গ্রন্থের নেতাজীর ভূমিকাসহ বারটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও ১৯২০ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের বাকি দশটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত নেতাজীর বহু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, অন্যান্য রচনা, পত্র ও সমকালীন কূটনৈতিক দলিল ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে ইউরোপে নির্বাসনকালে নেতাজী ১৯২০ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী রচনা করেন এবং গ্রন্থাকারে উহা ১৯৩৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইউরোপের রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী মহলে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। কিন্তু গ্রন্থে "সন্ত্রাসবাদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" উৎসাহিত করা হইয়াছে এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। গ্রন্থের পরবর্তী অংশটিও—১৯৩৫ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত সংগ্রামের বিবরণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে রচিত হয় এবং যুদ্ধের পর নেতাজীর সহধর্মিণীর সৌজন্যে পাওয়া যায়। মূল ইংরাজী গ্রন্থটি দুই অংশে পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইলেও বহু বৎসর ধরিয়া দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১৯৬৪ সালে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক সম্পূর্ণ ও পরিবর্ধিত আকারে মূল ইংরাজী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রন্থটির ইতালীয় ও জাপানী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনুবাদক শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কঠিন দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাব ও বক্তব্য অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী প্রকাশনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ-এর ঐকান্তিক সহযোগিতায় উচ্চ মানের গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ইঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য ও ধারা সম্যকভাবে অনুধাবন এবং নেতাজীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভাবাদর্শ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অবশ্য-পাঠ্য। আশা করি, বাঙলার ইতিহাস সাহিত্যে গ্রন্থটি তাহার যোগ্য উচ্চ মর্যাদার স্থান অধিকার করিবে এবং বাঙলার পাঠক-সমাজ পুস্তকটি সাদরে গ্রহণ করিবেন। জয় হিন্দ্

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো
নেতাজী ভবন
৩৮।২ লালা লাজপত রায় রোড
কলিকাতা ২০
১৮ই মার্চ, ১৯৭০

শিশিরকুমার বসু

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

এই গ্রন্থে বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে ইহা লিখিয়াছিলাম এবং সে সময়ে আমার স্বাস্থ্য মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিতে ধারণাতীত বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও এ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাওয়ার অসুবিধা আমার নিকট প্রবল বাধাস্বরূপ হইয়াছিল। লিখিবার সময় যদি আমি ভারতবর্ষে, কিংবা অন্ততঃ ইংলণ্ডেও থাকিতাম তাহা হইলে আমার কাজ অনেকটা সহজতর হইত। এরূপ পরিস্থিতিতে, স্মৃতি হইতে বেশীর ভাগ বর্ণনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। পাণ্ডুলিপিটি শেষ করিবার পর আরও কিছু কিছু কৌতূহলপ্রদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—যথা, ১৯৩৪ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন, ভারতীয় আইন সভার নির্বাচন, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ ইত্যাদি। প্রুফ্ মিলাইবার সময় বইটিকে আধুনিকোপযোগী করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংযোজন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আরও একটি দুর্ভাগ্য এই যে বইটিকে চূড়ান্ত রূপদানের কাজটিও ধীরে সুস্থে করিতে পারা যায় নাই। যখন এই কাজে ব্যাপৃত ছিলাম তখন ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য আমাকে তাড়াহুড়া করিয়া আমার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে।

এই গ্রন্থের লেখক তাঁহার বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশা করা যায় যে ঐ একই কাজে ভবিষ্যতেও লিপ্ত থাকিবেন। সুতরাং আশা করা যায় যে কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক হইবে এবং প্রসঙ্গতঃ বিদেশী পর্যবেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে। যদি এই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সফল হয় তাহা হইলে আমার শ্রম ব্যর্থ হইবে না।

উপসংহারে, শ্রীমতী ই. শেঙ্কল-কে—যিনি এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন—এবং যাঁহারা নানা প্রকারে আমার সহায়ক হইয়াছেন, সেই সকল বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হোটেল দ্য ফ্রান্স
ভিয়েনা
২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪

সুভাষচন্দ্র বসু

ভূমিকা

১

ভারতে রাষ্ট্রশাসনের পটভূমি

অতি প্রাচীন কাল হইতে সুরু করিলে গত তিন দশকেই শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। উহার পূর্বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাক্-বৃটিশ যুগকে অস্বীকার করাই বৃটিশ ঐতিহাসিক-গণের রীতি ছিল। যেহেতু তাঁহারাই প্রথমে আধুনিক ইউরোপের কাছে রাজনৈতিক ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেজন্য ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, আধুনিক ইউরোপ ভারতবর্ষকে এমন একটা দেশ ভাবিত যেখানে বৃটিশেরা আসিয়া দেশটাকে জয় করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে এবং উহাকে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আনিতে উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত, স্বাধীন নৃপতিগণ নিজেদের মধ্যে অবিরত লড়াই করিয়া চলিতেন।

যাহা হউক, ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে সুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কয়েকটি দশক বা শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচার করিলে চলিবে না, বরং উহা করিতে হইবে হাজার হাজার বছরের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, সে যে বিজিত, ভারত তাহার ইতিহাসে প্রথম কেবল বৃটিশ শাসনেই উহা উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছে। তাহার দীর্ঘ ইতিহাস এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দরুন ভাগ্যের নানা উত্থান-পতন সে পার হইয়া আসিয়াছে। কি ব্যক্তি কি জাতি—কাহারও পক্ষেই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথে মাঝে মাঝে অবক্ষয়, এমন কি বিশৃঙ্খলার ছেদ ঘটিলেও প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক একটা যুগ আসিয়াছে, আর উহা সর্বদাই খুব উন্নত স্তরের একটা কৃষ্টি ও সভ্যতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছে। কেবল মাত্র অজ্ঞতা কিংবা পক্ষ-পাতিত্বের বশবর্তী হইলেই একথা বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলিতে কি বুঝায় বৃটিশ শাসনেই ভারত তাহা প্রথম বুঝিতে সুরু করে। বস্তুতঃ, গ্রেট বৃটেন যদিও সুবিধার খাতিরেই ভারতে এক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করিয়াছে এবং সরকারী ভাষারূপে সর্বত্র অধিবাসীদের উপর ইংরাজীকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বিভেদ সৃষ্টি

করিবার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। তৎসত্ত্বেও, আজ যদি দেশে একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তীব্র ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে, উহা হইয়াছে সম্পূর্ণত এই কারণে যে, জনগণ তাহাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করিতে সুরু করিয়াছে তাহারা পরাভূত এবং সাংস্কৃতিক ও পার্থিব—রাজনৈতিক দাসত্বের উভয়বিধ যে শোচনীয় পরিণতি ঘটে তাহাও তাহারা যুগপৎ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যদিও ভৌগোলিক, জাতিতত্ত্বমূলক ও ঐতিহাসিক দিক হইতে ভারত যে কোনও পর্যবেক্ষকের কাছে এক সীমাহীন বৈচিত্র্যের দেশ, তবু এই বৈচিত্র্যের গভীরে একটা মূলগত ঐক্য নিহিত রহিয়াছে। অথচ শ্রীযুক্ত ভিনসেন্ট, এ, স্মিথ যেরূপ বলিয়াছেন: 'ভারতের এই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য সম্বন্ধেই ইউরোপীয় লেখকেরা সচরাচর বেশী সচেতন.........ভারতে যে একটা প্রগাঢ় মূলগত ঐক্য গোপনে বিরাজমান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই: ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক আধিপত্য হইতে সৃষ্ট অনৈক্য অপেক্ষা উহা অনেক বেশী গভীর। ভাষা, বর্ণ, শোণিত, পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও সম্প্রদায়ের বহু বৈচিত্র্য ছাড়াইয়া এই ঐক্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।'[১] ভৌগোলিক দিক হইতে, ভারতকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ বলিয়া বোধ হয়। উত্তরে যাহার সীমা নির্দেশ করিতেছে সুবিশাল হিমালয় পর্বত, অসীম সমুদ্র যাহার দুই দিক বেষ্টন করিয়া আছে—সেই ভারত ভৌগোলিক সত্তার একটা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতে বিভিন্ন জাতি লইয়া কখনও কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই—কেননা তাহার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করিয়া লইতে এবং তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চারিত করিতে সে সমর্থ হইয়াছে। এই বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ হিন্দু ধর্ম। উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই আপনি যান না কেন, এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য দেখিতে পাইবেন। সকল হিন্দুই ভারতবর্ষকে পবিত্রভূমি বলিয়া মনে করে। তীর্থক্ষেত্রগুলির মতই সারা দেশে[২] ছড়াইয়া আছে বহু পবিত্র স্রোতস্বিনী। যদি আপনাকে একজন ধার্মিক হিন্দু হিসাবে আপনার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনাকে একেবারে দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর হইতে উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত বদ্রীনাথ পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য-গণ, যাঁহারা দেশকে তাঁহাদের বিশ্বাসে দীক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহাদিগকে সর্বদাই সমগ্র ভারত পর্যটন করিতে হইত: আর তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদিগের

[১] ভিনসেন্ট, এ, স্মিথ রচিত দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভূমিকা পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য।
[২] অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'দি ফান্ডামেন্টাল ইউনিটি অব ইন্ডিয়া' (লংম্যানস, ১৯১৪) গ্রন্থে এই সকল ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যাইবে।

অন্যতম শঙ্করাচার্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারিটি 'আশ্রম' (monasteries) প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলি অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে। সর্বত্র একই শাস্ত্র পঠিত ও অনুসৃত হয়, আর যেখানেই আপনি ভ্রমণ করুন না কেন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য সর্বত্র সমান জনপ্রিয়। মুসলমানদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ একটা নূতন সমন্বয় গড়িয়া উঠে। যদিও তাহারা হিন্দুদিগের ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তবু তাহারা ভারতবর্ষকে তাহাদের দেশ করিয়া লইয়াছিল এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবন ও তাহাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্পরিক সহযোগিতায় একটা নূতন শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্ভব হইল, প্রাচীন কাল হইতে যাহা ভিন্ন—অথচ যাহা স্পষ্টতই ভারতীয়। স্থাপত্য, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইল—যাহা সংস্কৃতির এই দুইটি ধারার মধুর মিলনের প্রতীক হইয়া উঠিল। উপরন্তু, মুসলমান রাজাদিগের শাসন জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করে নাই; হস্তক্ষেপ করে নাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে যাহা গ্রাম্য সাধারণের পুরাতন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন ধর্ম, একটা নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৃষ্ট হইল, যাহা পুরাতনের সহিত মিলিত না হইয়া বরং দেশে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিল। পূর্বেকার আক্রমণকারিগণের কাছে ভারতবর্ষ যেরূপ তাহাদের দেশ হইয়া উঠিয়াছিল, বৃটেনের অধিবাসীদের কাছে তাহা হইল না। তাহারা নিজেদের ক্ষণিকের অতিথি বলিয়া মনে করিত; আর ভারতবর্ষ ছিল তাহাদের কাছে কাঁচা মালের উৎস-স্থল এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। অধিকন্তু, তাহারা মুসলমান শাসকগণের স্থানীয় ব্যাপারে একেবারে হস্তক্ষেপ না করার প্রাজ্ঞ নীতিকে অনুসরণ না করিয়া তাহাদের স্বৈরাচারকে অনুকরণ করিতে উদ্যত হইল। ইহার ফল হইল এই যে, ভারতীয় জনগণ তাহাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করিতে সুরু করিল যে—সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের উপর এমন একটা জাতি প্রভাব বিস্তার করিতেছে যাহারা সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং যাহাদের সহিত তাহাদের কোনও ব্যাপারেই কিছুমাত্র মিল নাই। এজন্যই ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইলে অতীতের রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পর্যালোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতার সূচনাকাল অন্ততপক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে, আর সেই সময় হইতেই কৃষ্টি ও সভ্যতার মোটামুটি একটা লক্ষণীয় ধারাবাহিকতা চলিয়া আসিতেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং

প্রসঙ্গত ইহা জাতি ও তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাণশক্তির পরিচায়ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যগুলি সঠিকভাবে প্রমাণ করে যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩000 অব্দে ভারত সভ্যতার একটা উন্নত স্তরে উপনীত হইয়াছিল। ইহা সম্ভবত আর্যদিগের ভারত বিজয়ের পূর্বে ঘটিয়াছিল। এই খননকার্যগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কি আলোকপাত করিয়াছে তাহা এখনই বলা কঠিন: তবে আর্যদিগের ভারত বিজয়ের পর হইতে আরও অনেক তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্ত্রের উল্লেখ আছে। যেখানে ইহা প্রচলিত ছিল, সেখানে উপজাতীয় গণতন্ত্র ছিল। তখনকার দিনে বৈদিক সমাজে[১] একেবারে ক্ষুদ্রতম ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল যথাক্রমে 'গ্রাম' (কিংবা Village) এবং 'জন' (বা Tribe)। পরবর্তী কালে মহাকাব্য সাহিত্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের[২] সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও প্রমাণ আছে যে. প্রাচীনতম কাল হইতে পৌরশাসন ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে দুই প্রকার সভার উল্লেখ আছে—সভা ও সমিতি (সংগতি বা সংগ্রামও বলা হইত)। 'সভা' বলিতে নির্বাচিত কয়েক জনের উপদেষ্টা পরিষদ বুঝাইত; এবং সকল মানুষের সম্মিলনকে 'সমিতি' বলা হইত। রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধকাল কিংবা জাতীয় বিপর্যয় ইত্যাদির[৩] মত প্রধান প্রধান কারণেই 'সমিতির' সভা ডাকা হইত।

ভারতে আর্যদিগের প্রভাব ও প্রাধান্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশের পরবর্তী ধাপে রাজশক্তির প্রসারের দিকে একটা সুস্পষ্ট ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে উত্তর ভারতে স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। রাজ্যবৃদ্ধির জন্যই যে এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত তাহা নহে, বরং বিজিত পক্ষ কর্তৃক বিজয়ীর প্রভুত্ব স্বীকার লইয়াও উহা হইত। বিজয়ী রাজাকে বলা হইত 'চক্রবর্তী' বা 'মণ্ডলেশ্বর', এবং জয়কে স্মরণীয় করিবার জন্য—'রাজসূয়' বা 'বাজপেয়' কিংবা 'অশ্বমেধ'-এর ন্যায় বিরাট বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইত। কেন্দ্রীভূত প্রভুত্বের প্রতি এই আগ্রহ ভারতীয় ইতিহাসের বৈদিক ও মহাভারতের যুগ

---

[১] কলিকাতার ১৫, কলেজ স্কোয়ারস্থ চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের Development of Hindu Polity and Political Theories গ্রন্থের পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য।

[২] কে. পি. জয়সওয়ালের 'রিপাবলিকস ইন দি মহাভারত' (J.O. and B. Res. Soc., প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩—৮) দেখা যাইতে পারে।

[৩] নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Development of Hindu Polity and Political Theories গ্রন্থের পৃঃ ১১৫—১৮ দ্রষ্টব্য।

ধরিয়া প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের আন্দোলন নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল। এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে পরবর্তী যুগে—অর্থাৎ বৌদ্ধ বা মৌর্য যুগে—যখন মৌর্য সম্রাটগণ প্রথম রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর ভারত পরিত্যাগের পর খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে এবং পরেও ভারতে বহু গণরাজ্য ছিল। মালব, ক্ষুদ্রক, লিচ্ছবি ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ছিল। শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়সওয়াল তাঁহার Hindu Polity পুস্তকে এরূপ গণরাজ্যগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, যখন এক সম্রাটের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করিয়াছিল তখন সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াও এই গণরাজ্যগুলি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসাবেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগে জনসাধারণের সভা ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক মৌর্য সম্রাটদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, যিনি খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আধুনিক ভারতবর্ষ লইয়াই যে শুধু অশোকের সাম্রাজ্য ছিল এমন নহে—আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং পারস্যের অংশও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য সম্রাটদিগের শাসনকালে, রাজ্যশাসনের পারদর্শিতা উন্নত স্তরে উপনীত হইয়াছিল। সামরিক সংগঠন ছিল সেকালের পক্ষে ত্রুটিশূন্য। শাসনপ্রণালী ছিল বিভক্ত; বিভিন্ন সচিবের অধীনে পৃথক পৃথক বিভাগ থাকিত। এখনকার পাটনার নিকটে রাজধানী পাটলিপুত্রের নগর-শাসনও প্রশংসাযোগ্য ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক দিক হইতে সমগ্র ভারত এই প্রথম একটি সুদৃঢ় শাসনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। অশোক যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র শাসনযন্ত্রই বৌদ্ধ মতবাদের অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা তাঁহার সাম্রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সন্তুষ্ট না হইয়া অশোক এই ধর্মের অত্যুন্নত নীতিগুলি প্রচার করিবার জন্য—একদিকে জাপান ও অন্যদিকে তুরস্ক পর্যন্ত—এশিয়ার সকল প্রান্তে বহু ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। এই যুগকে অনেকে ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ বলিয়াছেন, যখন জীবনের[১] প্রত্যেকটি বিভাগে একই রকমভাবে সর্বতোমুখী অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে অধঃপতন সুরু হইল এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার একটা ছেদ ঘটিল। প্রধানত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের উপর

---

[১] গ্রীক মেগাস্থিনিসের মত একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক উপরোক্ত বিষয়গুলির সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

খুব বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত হয় এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। দর্শনের ক্ষেত্রে, উপনিষদগুলিতে যে বেদান্ত দর্শনের কথা প্রথম বলা হইয়াছিল উহা পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ-প্রথার পুনঃ প্রবর্তন ঘটিল এবং শেষের দিকে বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনের ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহার স্থলে এক নূতন বাস্তবতাবোধ জাগ্রত হইল। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল; এবং উহার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিল। গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত; তিনি ৩৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্ত যুগে দেশ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যই লাভ করে নাই, উপরন্তু শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও বিকাশ[১] লাভ করিয়াছিল এবং পুনরায় চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নব-জাগরণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে ঘটে; এবং সেজন্যই গোঁড়া হিন্দুরা পূর্বের বৌদ্ধ যুগ অপেক্ষা এই যুগকে অধিকতর গৌরবের যুগ বলিয়া মনে করেন। গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে পুনরায় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক—উভয় দিক দিয়া এশিয়া, ও রোমের মত ইউরোপের কোনও কোনও দেশের সঙ্গেও ভারতের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে। পঞ্চম শতাব্দীর পর গুপ্ত সম্রাটগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটিলেও, এই সাংস্কৃতিক জাগরণ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আর একবার উন্নতির শীর্ষে না পৌঁছান পর্যন্ত ব্যাহত হয় নাই; সেই সময়ে রাজা হর্ষের আমলে দেশ পুনরায় রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

ইহা খুব বেশী দিন স্থায়ী হইল না এবং কিছুকাল পরে আর একবার পতনের লক্ষণসমূহ দেখা দিল। ভারতীয় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল—মুসলমানদিগের আক্রমণে। ভারতের বুকে তাহাদের অভিযান প্রথম সুরু হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কিন্তু দেশ[২] জয় করিতে তাহাদের কিছু সময় লাগিয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ বিন তুঘলক দেশের একটি বিরাট অংশ এক শাসনের অধীনে আনিয়া প্রথম সাফল্য অর্জন করেন; কিন্তু দেশে ঐক্য ও সর্বতোমুখী অগ্রগতির একটা নূতন যুগের সূচনা হয় মুঘল বাদশাহদিগের দ্বারাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাটগণের শাসনকালে ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পেঁছায়। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আকবর, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন। দেশের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাই আকবরের প্রধান কীর্তি ছিল না, বোধ হয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল,—পুরাতনের সঙ্গে সংস্কৃতির নূতন

---

[১] এ বিষয়ে নিরপেক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন চৈনিক তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক ফা-হিয়েন।

[২] সিন্ধু জয় করা হয় অষ্টম শতাব্দীতে কিন্তু উহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল।

ধারার মিলন ঘটাইবার জন্য একটি নূতন সাংস্কৃতিক সমন্বয়সাধন ও নূতন সংস্কৃতির[১] সৃষ্টি। তিনি যে শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিলেন উহাও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘলদিগের মধ্যে শেষ প্রধান সম্রাট; তিনি ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে সুরু করে।

উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, প্রাচীন কালে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল। সমশ্রেণীর উপজাতি বা বর্ণের মধ্যেই উহা সচরাচর গড়িয়া উঠিত। মহাভারতে এই সকল উপজাতীয় গণতন্ত্রকে বলা হইত 'গণ'[২]। এই পুরাপুরি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি ছাড়া, যে সকল রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল সেগুলিতেও জনগণ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত; কেন না রাজা ছিলেন কার্যতঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। এই বিষয়টি, যাহা বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে এখন পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত হইয়াছে। রাজনৈতিক বিষয়গুলি ছাড়া, অন্যান্য বিষয়েও জনগণ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত।

প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে 'পৌর' ও 'জনপদ' নামে জনসংস্থাগুলির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বোক্তটি আমাদের এখনকার পৌরসংঘগুলির অনুরূপ এবং পরোক্তটির দ্বারা সম্ভবত কোন প্রকারের গ্রাম্য জনসংস্থা বুঝানো হইত। উপরন্তু, জাতিভেদ থাকায় 'পঞ্চায়েতের'[৩] শাসনে শ্রেণী-গণতন্ত্রের প্রথার মাধ্যমে জনগণ সামাজিক ব্যাপারগুলিতে স্ব-শাসিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বহু লোকপ্রিয় 'পঞ্চায়েৎ' ছিল: ঐগুলি গ্রাম্য শাসনই শুধু চালাইয়া যাইত না—উপরন্তু জাতিভেদের বিধানগুলি কার্যকরী করা ও শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষাও ঐগুলির কাজ ছিল। পরবর্তী কালে সমগ্র বৌদ্ধ যুগ ধরিয়া জনসাধারণ অনেকটা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে। এই যুগে 'সভা' ও 'ভোট' জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে এই সকল ক্ষমতা গ্রাস করা হয় নাই অথবা যে সকল প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য তখনও ছিল সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়

[১] ধর্মগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাইবার জন্যও আকবর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব ধর্মের সারকথা লইয়া একটা নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'দীন ইলাহি'। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অনেক সমর্থক পাইয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর এই নূতন ধর্মের আর কোনও সমর্থক রহিল না।

[২] পরে ১৯২৭ সালেও লেখক স্বয়ং উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামের খাসি উপজাতির মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছেন।

[৩] পঞ্চায়েৎ বলিতে প্রকৃত অর্থে পাঁচ জনের সমিতি বুঝায়। ইহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

নাই। গুপ্ত ও হর্ষের সাম্রাজ্যও ঐ একই ধারায় চলিয়াছিল। মুসলমান শাসকদিগের আমলে যদিও অসংযত স্বেচ্ছাচার দেখা গিয়াছে, তথাপি প্রাদেশিক কিংবা স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অবশ্য 'সুবা' বা প্রদেশের শাসনকর্তা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু সম্রাটের রাজকোষে ঠিক মত রাজস্ব জমা পড়িলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইত না। কখনও কখনও খামখেয়ালী কোনও শাসক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন যিনিই দখল করুন না কেন—ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারে জনগণ মোটের উপর পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সকলেরই এই দোষ যে, তাঁহারা এই বিষয়টি অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন; এবং যখন তাঁহারা তাচ্ছিল্যভরে স্বেচ্ছাচারের কথা বলেন—প্রাচ্যদেশবাসিগণ নাকি যাহাতে অভ্যস্ত—তখন তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, এই স্বেচ্ছাচারের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে জনগণ বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিত যাহা বৃটিশ শাসনে সম্ভব হয় নাই। আর্যদের ভারত বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও, স্ব-শাসিত বহু গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জনজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উত্তরের আর্য রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যেমন, তেমনই দক্ষিণের[১] তামিল রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য। কিন্তু বৃটিশ শাসনে এই সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ বাহু প্রসারিত হইয়াছে সুদূরতম পল্লী পর্যন্ত। এমন এক বর্গ ফুট জমি নাই যেখানে লোকে অনুভব করে যে, তাহাদের স্বীয় বিষয়কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাহারা স্বাধীন। রাজনৈতিক সাহিত্য সম্বন্ধেও বলা যায়, প্রাচীন ভারতের যথেষ্ট গর্ব করিবার আছে। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে মহাভারত হইতেছে তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্মশাস্ত্রগুলির এবং সেই সঙ্গে ঐগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল—সেগুলিরও মূল্য অত্যধিক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহলোদ্দীপক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; উহা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্ট হয়।

আমাদের কাহিনীর মূল বক্তব্যে ফিরিয়া গেলে বলিতে হয়, ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হওয়ায় প্রশ্ন উঠিল, কোন্ শক্তি উহার স্থান অধিকার করিবে। প্রায় এই সময়ে দেশীয় দুইটি শক্তি—মধ্য-ভারতের মারাঠা ও উত্তর-পশ্চিমের শিখ শক্তি—আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। মারাঠা শক্তিকে সংহত করিয়াছিলেন শিবাজী (১৬২৭-৮০); যেমন সেনাপতি হিসাবে, তেমনই

[১] এই প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের কথা অনুধাবনযোগ্য।

শাসক হিসাবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি টিঁকিয়া ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যে তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় তাহাতে উহার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়: এবং অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। মারাঠা শাসন যদিও উদার স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল তথাপি উহা গর্ব করিতে পারিত। মহারাজা রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯) শিখ শক্তিকে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী ও চমৎকার অসামরিক শাসনব্যবস্থার জন্য একত্র করেন; তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় একটা সুন্দর সৈন্যবাহিনী ও চমৎকার অসামরিক শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার মৃত্যুর পর, সমান যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেহ তাঁহার স্থান দখল করিতে পারিল না: এবং যখন শিখ ও বৃটিশের মধ্যে লড়াই শুরু হইল তখন শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন দেশ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার একটি যুগের মধ্য দিয়া পার হইতেছিল এবং নূতন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবিধি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিকট সে একটি ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিল। একের পর এক পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ আসিল। তাহাদের প্রত্যেকেই বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বিবদমান নায়কদিগের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। পরিণামে, ফরাসী ও বৃটিশের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হইল। ভাগ্য করুণা করিল বৃটিশকে। উপরন্তু, বৃটিশ কূটনীতি ও রণকৌশল ছিল অধিকতর ধূর্ত ও বিচক্ষণ—এবং ফ্রান্স তাহার দেশীয় লোকদের যে সাহায্য দিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক সাহায্য বৃটিশেরা লাভ করিয়াছিল তাহাদের স্বদেশী সরকারের নিকট হইতে। ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতকে তাহাদের অভিযানের ঘাটি করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছিল। বৃটিশেরা ঐতিহাসিক নজিরকে অনুসরণ করিয়াছিল: তাহারা বাঙ্গলা জয় করিয়া উত্তর দিক হইতে অভিযান চালাইয়াছিল এবং ফরাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

ভারতীয় ইতিহাসের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার পর আমরা সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করিতে পারি:

(১) উত্থানের কোনও যুগের পরেই দেখা গিয়াছে পতনের যুগ: তাহার পর পুনরায় নূতন করিয়া অভ্যুত্থান হইয়াছে।

(২) প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ফলেই পতন ঘটিয়াছে।

(৩) নব নব ভাবধারার সৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে নূতন প্রাণসঞ্চারের ফলেই অগ্রগতি এবং নূতন করিয়া সংহতি সম্ভব হইয়াছে।

(৪) জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সামরিক নৈপুণ্যের দিক হইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রত্যেকটি নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে।

(৫) সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে সব সময়েই বিদেশী উপাদানগুলিকে ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। বৃটিশেরাই ইহার প্রথম ও একমাত্র ব্যতিক্রম।

(৬) কেন্দ্রীয় শাসনে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও, জনসাধারণ বরাবরই বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে।

২

ভারতে বৃটিশ শাসনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংলন্ড ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। এই কোম্পানী একটা রাজকীয় সনদ লাভ করিয়াছিল যদ্দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়, রাজ্যলাভ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহারা প্রচুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভে সাফল্য অর্জন করে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানী ও তখনকার দিনের স্থানীয় ভারতীয় শাসকগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে; এবং বাঙ্গলার মত কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহা পরিণত হয় সশস্ত্র সংঘর্ষে। এই প্রকার একটা সংঘর্ষে বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসক নবাব সিরাজদ্দৌলা কোম্পানীর সম্মিলিত বাহিনী ও চক্রান্তকারী ভারতীয় স্বদেশদ্রোহিগণ কর্তৃক পরাজিত হন। প্রকৃত-পক্ষে উহাই ছিল রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত জয়ের সূচনা। কয়েক বৎসর পরে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম--যিনি নামে মাত্র তখন ভারতের শাসক ছিলেন—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করেন। এই দেওয়ানী মঞ্জুর করার অর্থ হইল এই যে, এই সকল অঞ্চলের রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলিয়া গেল। এইরূপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইয়াও শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হইল। পরবর্তী কয়েক বছরে কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি ও কুশাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ দেখা গেল। সেজন্য, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য একটি আইন পাস হইল, যাহাকে বলা হইত লর্ড নর্থের নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইন পাস হওয়ার

সংগে সংগে শাসনব্যবস্থায় প্রধান যে পরিবর্তন দেখা গেল তাহা এই যে, বাংগলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে একজন গভর্নর-জেনারেলের অধীনে আনা হইল—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী একে অপরের অধীন ছিল না। তিনি চারিজন কাউন্সিলারের সাহায্যে এই সকল রাজ্য শাসন করিবেন; বাংগলায় থাকিবে তাঁহার প্রধান কার্যালয়। এই প্রবর্তিত নূতন ব্যবস্থায় নানাবিধ ত্রুটি ছিল—এতদ্ব্যতীত, গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। অতএব, কিছুকাল পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে আর একটি আইন পাস হইল, যাহাতে একটা বোর্ড অব কন্ট্রোলের ব্যবস্থা হইল। এই বোর্ডে মন্ত্রিপরিষদের বহু সদস্য ছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র কার্যধারাই উহা পরিচালনা করিতে লাগিল। অংশতঃ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এই বোর্ড অব কন্ট্রোল নিয়োগের ফলে ঘটনাক্রমে ভারতের উপর বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

মধ্যে মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উহার সনদ নূতন করিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হইত। ১৮৩৩-এর সনদ আইনে কোম্পানীর মর্যাদা ও দায়িত্বে বিশেষ একটি পরিবর্তন সূচিত হইল। এই আইন পাস হওয়ার ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকিল না; বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত একটা প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল—যাহা বৃটিশ সম্রাটের পক্ষে ভারত শাসন করিবে। এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে, সমগ্র সামরিক ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত হইল। কুড়ি বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই সনদ আইন নূতন করিয়া অনুমোদন লাভ করিল তখন কোম্পানীর উপর গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়িয়া গেল। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সদস্যদিগের এক-তৃতীয়াংশ বৃটিশ সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে বাংগলাকে পৃথক একটি প্রদেশে পরিণত করায় প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলি হইতে ভারত গভর্নমেন্ট আলাদা হইয়া গেল। ভারতের জন্য একটি আইন পরিষদের ব্যবস্থাও আইনে করা হইল; উহা বারো জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাঁহারা সকলেই আর যাহাই হউন না কেন পদস্থ কর্মচারী হইবেন। ১৮৫৩ সালে সনদের নূতন করিয়া অনুমোদন প্রসংগে হাউস অব কমনস্-এ আলোচনাকালে, জন ব্রাইট কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'উহা দেশে অবিশ্বাস্য মাত্রায় দুর্নীতি ও বিশৃঙখলা এবং জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ-

দারিদ্র্য ছড়াইয়াছে।' তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, ভারতে শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বৃটিশ সম্রাটকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার এই উপদেশে কর্ণপাত করা হইল না, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে বিপ্লব (যাহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' আখ্যা দিয়াছেন) ঘটিল। এই বিদ্রোহ দমনের পর, ১৮৫৮-র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে একটা নূতন আইন পাস হইল। এই আইনের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা বৃটিশ সম্রাট গ্রহণ করিলেন। এই আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়া একটা রাজকীয় ঘোষণা প্রচার করিলেন, যাহা ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং কর্তৃক ঘোষিত হইল। বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট বৃটিশ মন্ত্রিসভা দায়ী থাকার দরুন বৃটিশ পার্লামেন্ট কার্যতঃ ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া উঠিল।

১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট পাস হওয়ায় পরবর্তী প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, যাহাতে অনধিক বারো ও ন্যূনপক্ষে ছয় জন সদস্য থাকিবেন; তাঁহাদের অর্ধেককে বে-সরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদগুলিরও প্রবর্তন করা হইল; ঐগুলি অংশতঃ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বে-সরকারী সদস্যদিগের দ্বারা গঠিত হইবে। এইরূপে বাঙ্গলা দেশ ১৮৬২ সালে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা (যাহার নাম এখন যুক্তপ্রদেশ) ১৮৮৬ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ লাভ করিল।

১৮৫৭-র বিপ্লব ব্যর্থ হইবার পরই আসে একটি প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং এই যুগে ভারতে সমস্ত বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং সমগ্র জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হয়। গত শতাব্দীর নবম দশকে রাজনৈতিক অবসাদ কাটিয়া যায় এবং জনসাধারণ আর একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে শুরু করে। এবার স্বাধীনতাপ্রেমী আর প্রগতিশীল ভারতীয়দের নীতি ও কৌশল ১৮৫৭-র নীতি ও কৌশলগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে যখন কোনও প্রশ্নই উঠে না, তখন উহার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আন্দোলন চালানোই স্থির হইল। এইরূপে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করাই ছিল উহার লক্ষ্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ভারত গভর্নমেন্ট বুঝিতে পারিলেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতএব ১৮৯২ সালে আর একটা আইন পাস হইল—যাহা ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট নামে খ্যাত। এই আইনের দ্বারা আইন পরিষদকে প্রশ্ন তুলিবার

এবং বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইল, যদিও বাজেটের উপর ভোট দানের অধিকার স্বীকৃত হইল না। আইন পরিষদগুলিতে আরও ব্যবস্থা হইল যে গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বেসরকারী ব্যক্তি গ্রহণ করা হইবে। গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও ষোলজন করা হইল।

বর্তমান শতাব্দীর জন্মলগ্ন হইতেই ভারতে ব্যাপকভাবে একটা জাতীয় জাগরণ দেখা গেল এবং যে বাঙ্গলা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন বৃটিশের দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই বাঙ্গলাই হইল এই নূতন আন্দোলনের পথিকৃৎ। ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ঐ প্রদেশকে বিভক্ত করার হুকুম দিলেন। এই কার্যের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইল তাহা হইল শাসনব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন—কিন্তু জনগণ অনুভব করিল যে, বাঙ্গলার এই নব অভ্যুদয়কে দুর্বল করাই উহার আসল উদ্দেশ্য। এই বিভাগের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় প্রচন্ড একটা বিক্ষোভ গড়িয়া উঠিল, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়িয়া একটা শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হইল। ঐ আন্দোলনের সময় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক পন্থা হিসাবে বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের চেষ্টা হইল। এই সকল ঘটনার চাপে গভর্নমেন্ট বিক্ষুব্ধ জনতাকে আর সামান্য কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হইলেন: এবং তজ্জনাই মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার ব্যবস্থা। লর্ড মর্লি ছিলেন তখন ভারতসচিব, আর ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের কথা প্রথম ঘোষিত হয় এবং অবশেষে ১৯০৯-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট-রূপে উহা আইন হইয়া পাস হয়। সরকারী প্রেরণায় এই ঘোষণার কয়েক মাস পূর্বে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান নেতাদের এক প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আসন্ন সংস্কারের ব্যাপারে তাঁহাদের দাবী ছিল এই যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে,—যেগুলির জন্য সাধারণভাবে ভারতীয় নির্বাচকমন্ডলীর নিকট নহে,—কেবলমাত্র মুসলমান ভোটদাতাগণের নিকটই ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমান নেতৃবৃন্দের এই দাবী, যাহাকে ভারতে 'পৃথক নির্বাচন' বলা হয়, ১৯০৯-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট-এ পূরণ করা হইয়াছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রদেশেও আইন পরিষদগুলিকে বাড়াইবার বন্দোবস্ত এই আইনে করা হয়। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, প্রস্তাব আনা, বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যাপারে সদস্যগণ আরও কিছু ক্ষমতা লাভ করেন। যাহাই হউক, নির্বাচন-পদ্ধতি ছিল অপ্রত্যক্ষ, আর সেজনাই বহু ভারতীয় ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট-এর তুলনায় এই আইনকে কোনও কোনও বিষয়ে একেবারে উল্টা ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নির্বাচন-কেন্দ্রগুলি ছিল

অত্যন্ত ক্ষুদ্র; ঐগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎটির ভোটদাতা[১] ছিল মাত্র ৬৫০ জন।

মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার চালু হইবার পর বড়লাটের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্যরূপে এই প্রথম একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়, এবং স্যার (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহই প্রথম এই সম্মান অর্জন করেন। ইহার পরই রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণে আসেন—প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসারে দিল্লীতে সম্রাটরূপে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। এই ব্যবস্থার জন্য এবং ভারতের রাজধানী কালকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরের ব্যাপারেও বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জই ছিলেন সমানভাবে প্রধানতঃ দায়ী। লর্ড হার্ডিঞ্জের একটা আশ্চর্য ঐতিহাসিক চেতনা ছিল এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা ভারতে বৃটিশ শাসন অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড কার্জনের মত অন্যান্য সকলে এই সকল পরিবর্তনকে পছন্দ করেন নাই,—বরং তাঁহাদের ধারণা ছিল যে দিল্লীতে বহু সাম্রাজ্যের সমাধি রচিত হইয়াছে। যাহা হউক, ১৯১১-র ডিসেম্বরে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভ্রমণ ও বঙ্গ-ভঙ্গ রদ জনচিত্তকে শান্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এক বিভেদ দেখা দিল, যাহার ফলে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে 'জাতীয়তাবাদিগণ' (অথবা 'চরমপন্থিগণ') বিতাড়িত হইলেন। উপরন্তু, পুণার লোকমান্য বি. জি. তিলকের মত কারাবাসের দরুন অথবা বাঙ্গলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মত স্বেচ্ছানির্বাসনের ফলে কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের অনেকে রাজনৈতিক রংগমঞ্চ হইতে কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ফলে মহাযুদ্ধ সুরু হওয়া পর্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল; সেই সময়ে বিপ্লবপন্থী দল, এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই যাহাদের জন্ম, খুব সক্রিয় হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনমত চাহিয়াছিল যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে তাহাদের শাসননীতি ঘোষণা করুক। এই দাবী উত্থাপন করার কারণ বৃটেন প্রচার করিয়াছিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও নিপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীনতার জনাই সে লড়াই করিতেছে। ভারতের জনমতকে শান্ত করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারতসচিব শ্রীযুক্ত ই. এস. মন্টেগু ঘোষণা করিলেন ঃ মহামান্য সরকার বাহাদুরের নীতি হইতেছে 'শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়-দিগকে অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণের সুযোগ দান; এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধাপে ধাপে ভারতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমশঃ উন্নতি সাধন'। এই

[১] স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার—'এ নেশন ইন মেকিং' পৃঃ ১২৩—২৫—গ্রন্থে বোধহয় এই কথাই বলিয়াছেন।

ঘোষণানুরূপ কাজ করার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত মন্টেগু ভারতে আগমন করেন এবং ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার সম্বন্ধে ভারতসচিব ও তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের এক যুক্ত রিপোর্ট প্রচারিত হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে যে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছিল উহা ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এর রূপ গ্রহণ করে। এই আইনের দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রধান যে পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহা হইল দ্বৈতশাসনরূপ গভর্নমেন্টের গঠন। প্রদেশগুলিতে 'হস্তান্তরিত' ও 'সংরক্ষিত'—এই দুইটি অংশে গভর্নমেন্ট গঠিত হইবে। শিক্ষা, কৃষি, আবগারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মত হস্তান্তরিত বিভাগগুলি মন্ত্রিগণ পরিচালনা করিবেন; তাঁহারা অবশ্যই আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হইবেন এবং উক্ত পরিষদের ভোটের দ্বারা তাঁহাদিগকে অপসারণ করা চলিবে। পুলিস, বিচার বিভাগ ও অর্থ—এই সংরক্ষিত বিভাগগুলি গভর্নরের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ দেখিবেন; মহামান্য সরকার বাহাদুর তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারা আইন পরিষদের ভোটাভুটির মুখাপেক্ষী থাকিবেন না। এইরূপে যে সকল মন্ত্রীর উপর 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলির ভার থাকিবে তাঁহাদিগকে এবং 'সংরক্ষিত' বিভাগের ভাবপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণকে লইয়াই গভর্নরের মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে কোনও দ্বৈতশাসন চলিবে না গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণই সকল বিভাগ পরিচালনা করিবেন, তাঁহারা মহামান্য সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগুলির নিকট দায়ী থাকিবেন না যাহা নিম্নতর সভা অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং উচ্চতর সভা অর্থাৎ ব্যবস্থা·পরিষদ এই দুই অংশে গঠিত হইত। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগুলি গঠিত হইবে শুধু বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এবং ভারতীয় নৃপতিগণের দ্বারা যে সকল দেশীয় রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, বৃটিশ গভর্নমেন্টেব সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসাবে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সকল সংস্কারেব অপর্যাপ্ততা, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে রাজশক্তির সশস্ত্র সৈন্যগণের নৃশংস আচরণ এবং তুরস্ককে বিভক্ত করার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টা

ভারতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। কিন্তু দেশে এই অভূতপূর্ব জাগবণ সত্ত্বেও বাজনৈতিক দিক দিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট আর অগ্রসর হইলেন না। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এ দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে আর কতটা অগ্রসর হওয়া যায় তাহা স্থির করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করার বিধান ছিল। এই বিধানানুসারে ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটা রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হয়।

১৯৩০ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। অতঃপর নূতন শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি পরীক্ষার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এক গোল টেবিল বৈঠক আহূত হয়। গোল টেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশনের পর, নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের নিজেদের প্রস্তাব লইয়া আগাইয়া আসিলেন। এই সকল প্রস্তাব ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে এক শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়। শ্বেতপত্রটি বৃটিশ পার্লামেন্টের[১] উভয় সভার একটা যুক্ত কমিটির সম্মুখে বিবেচনার্থ যথাসময়ে উপস্থাপিত করা হয়।

৩

ভারতে নবজাগরণ

ইংলন্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দেশ কর্তৃক রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত-জয়ের কথা চিন্তা করিলে প্রথমেই যাহা মনে উদয় হয় তাহা হইল এই যে, এরূপ একটা অদ্ভুত কার্য কিরূপে আদৌ সম্ভব হইল। কিন্তু ভারতীয়দিগের প্রকৃতি ও ঐতিহ্য জানা থাকিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ভারতবাসী বিদেশীর প্রতি কখনও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে নাই। এই প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে অংশতঃ সমগ্র জাতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং কিছুটা দেশ বিরাট বলিয়া যত সংখ্যায় লোক এদেশে আসুক না কেন তাহাদের স্বাগত জানানো সম্ভব হইয়াছে। অতীতে, কত নূতন নূতন জাতি ও উপজাতি কর্তৃক ভারত বার বার আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বিদেশী হিসাবে আসিলেও অচিরেই ভারতকে তাহাদের দেশ করিয়া লইয়া থাকিয়া গিয়াছে—আগন্তুকের মনোভাব কাটাইয়া উঠিয়া তাহারা এই রাষ্ট্রেরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর, বিদেশীদের আগমনের পর কোনও সময়েই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই। শীঘ্রই একটা বুঝাপড়া সম্ভব হইত এবং বিদেশীরা এই বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের সভ্য হইয়া যাইত।

এইরূপে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ—ইউরোপের এই সকল জাতির ভারতে প্রথম আগমনের ফলে কোনও সন্দেহ বা ঘৃণা কিংবা বৈরীভাব জাগ্রত হয় নাই। ইহা ভারতের ইতিহাসে কোনও নূতন ব্যাপার ছিল না—অন্ততঃ লোকে তাহাই মনে করিত। বিদেশীদের অধিকাংশই হয় শান্তিপ্রিয়

[১] যুক্ত পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বেতপত্রে সামান্য যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছিল, যুক্ত কমিটি এমন কি সেগুলিও আরও ছাঁটিয়া দিয়াছে।

ধর্মপ্রচারক অথবা ব্যবসায়ী ছিল বলিয়াও কোনও প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদিগকে বহু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং শান্তিতে তাহাদের কাজকর্ম চালাইবার জন্য অঞ্চলবিশেষ দখল করার অনুমতিও তাহারা লাভ করিয়াছে। এমন কি যখন বিদেশীরা কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করিয়াছে তখনও তাহারা সর্বদাই কোনও এক শ্রেণীর লোকের পক্ষাবলম্বনের প্রতি সতর্ক ছিল, যাহাতে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধতার সম্মুখীন তাহাদের না হইতে হয়। এইদিক হইতে বিচার করিলে বৃটিশের কূটনীতি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে প্রশ্ন এই যে, কেন এক শ্রেণীর ভারতবাসী তাহাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে বিদেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। উহার উত্তর ইতি-পূর্বেই উপরে দিয়াছি। ভারতের তুলনায় আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপালের মত প্রতিবেশী দেশগুলি এখনও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন: কারণ এই সকল দেশের লোকেরা বিদেশীদের প্রতি সর্বদাই সন্দিগ্ধ ও বৈরীভাবাপন্ন। কূটনীতি ছাড়া ইউরোপীয়দের কৃতিত্বের আরও একটা কারণ ছিল—তাহাদের শ্রেষ্ঠতর সামরিক নৈপুণ্য। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, যদিও সে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার বিজ্ঞান-সাধনা ও যুদ্ধবিদ্যার কৌশলে আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া চলিয়াছিল, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে আর আধুনিকোপযোগী ছিল না। তাহার ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমান পৃথিবী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইউরোপে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধগুলির ফলে বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং ইউরোপীয় জাতিগুলি যখন প্রাচ্যাভিমুখে ধাবিত হয় তখন এই জ্ঞান তাহাদের খুব কাজে লাগিয়াছিল। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বাহ্যতঃ প্রথম যে সঙ্ঘর্ষ হয় উহা দেখাইয়া দিয়াছে যে, সামরিক দক্ষতার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, বৃটিশদিগের ভারতবিজয়ের পূর্বে ভারতীয় শাসকগণ স্থল আর নৌবাহিনীতে ইউরোপীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

ভারতে বৃটিশদিগের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হয় বাঙ্গলাদেশে। শাসক সিরাজদ্দৌলা ছিলেন একজন যুবক, যাঁহার বয়স তখনও ত্রিশের নীচে। তথাপি, তাঁহার সমর্থনে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বৃটিশরা কি সমূহ বিপদের কারণ,—এই প্রদেশে একমাত্র তিনিই বুঝিয়াছিলেন এবং এই দেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার যে গভীর দেশপ্রেম ছিল তদনুপাতে যদি কূটবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাকে গদিচ্যুত করার জন্য ইংরাজেরা মসনদের

প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রভাবশালী মীরজাফরকে তাহাদের দলে টানিয়া লইয়াছিল; এবং সিরাজদ্দোলার পক্ষে তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সহিত আঁটিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। যাহা হউক, মীরজাফরের ইহা বুঝিতে বেশী দেরী হয় নাই যে, বৃটিশেরা তাঁহাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দোলা গদিচ্যুত হন কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে বহু দশক লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য অংশ, যাহা তখনও স্বাধীন ছিল, বৃটিশের এই জয়ের বিপদ বুঝিয়া উঠে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বাঙ্গলাদেশই প্রথম বৃটিশ শাসনাধীনে আসে —সেজন্য বৃটিশ শক্তির সংহতি এখানেই প্রথম সুরু হইবে ইহা স্বাভাবিক। পুরাতন শাসনব্যবস্থার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটা অরাজকতার যুগ দেখা দিল এবং সবকিছু ঠিক করিয়া লইতে বৃটিশের কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন গভর্নমেন্টকে একটা দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর তাহাদের শাসনব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইল। ইহা স্বাভাবিক যে, একটি বিরাট দেশকে পরিচালনার জন্য গভর্নমেন্টকে তাঁহাদের নিজেদের ধারায় নূতন এক শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল, যাহারা তাহাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ চালাইতে সক্ষম হইবে। ভারতীয়রা বৃটিশ ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দক্ষ হইয়া উঠুক, বৃটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহা চাহিয়াছিল। ইত্যবসরে, বৃটিশ ধর্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীদের নিকট তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন সূত্রের ভিতর দিয়া বৃটিশের দিক হইতে ভারতে সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা প্রচারের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাই ভারতবাসীর বিদ্রোহের প্রথম কারণ। যে পর্যন্ত বৃটিশেরা কেবল মাত্র ব্যবসা করিয়াছে, ততদিন তাহারা নিতান্তই ব্যবসায়ী বলিয়া কেহ তাহাদের লইয়া মাথা ঘামায় নাই; যতদিন তাহারা শুধু মাত্র শাসনকার্য চালাইয়াছে ততদিন লোকে গ্রাহ্য করে নাই; কেননা অতীতে ভারতবাসী বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে এবং গভর্নমেন্টের পরিবর্তন সত্ত্বেও তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সর্বদা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে—কারণ অতীতে কোনও গভর্নমেন্টই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই। সভ্য করার লক্ষ্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা হইতেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে 'ইংরাজভাবাপন্ন' করার জন্য বৃটেনের পক্ষ হইতে চেষ্টা সুরু হইল। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্ম প্রচারে খুব সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে সরকারও বৃটিশ ধাঁচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত করিলেন। সমগ্র

শিক্ষাব্যবস্থাই বৃটিশ আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইংরাজীকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও শিক্ষার মাধ্যম করা হইল। শিল্পকলা ও স্থাপত্যেও দেশে বৃটিশ নক্সা চালু করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গভর্নমেন্ট নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে গিয়া বিশেষ বিবেচনার পর জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে এমন একটি জাতি গড়িয়া তোলা, যাহারা জাতিতে ছাড়া আর সর্বদিক দিয়া ইংরাজ হইয়া উঠিবে। নূতন স্কুলগুলিতে ছাত্রেরা চিন্তায়, বাক্যে, আহারে ও বেশভূষায় ইংরাজদিগের মতই চলিতে সুরু করিল। যে নব্য সম্প্রদায় এই সকল স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল, প্রাচীনকাল হইতে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির ফলে তাহাদিগকে আর ভারতীয় নয় বরং ইংরাজ বলিয়া মনে হইত।

এক নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই আশঙ্কার সম্মুখীন হওয়ায় দেশবাসীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহের প্রথম জীবন্ত প্রতিমূর্তি রাজা রামমোহন রায়,—এবং তিনি যে আন্দোলনের জনক ছিলেন উহা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। একটি ধর্মীয় অভ্যুত্থানের দূত হিসাবে রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কলুষতা প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করিয়া বেদান্তের মূলনীতিগুলিতে ফিরিয়া যাওয়ার উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন। ইউরোপের আধুনিক জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও উপকারী তাহা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একটা সর্বতোমুখী অভ্যুত্থানের জন্যও তিনি প্রচার চালাইয়াছিলেন। সেজন্য ভারতে যখন নবজাগরণ সুরু হয়, তখন প্রারম্ভেই উহার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় নবযুগের প্রবক্তারূপে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার পর ব্রাহ্ম সমাজের নেতারূপে আবির্ভাব ঘটে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি যে পবিত্র জীবন যাপন করিতেন, যাহা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের কথা স্মরণ করাইয়া দিত, তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ লোকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহর্ষি (a great saint) উপাধি দিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি অন্যতম। তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্র সেনকে খৃষ্টের বাণী ও উপদেশের দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং জনজীবনে সামাজিক সংস্কারের উপর তিনি খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এরূপ প্রাণশক্তি ছিল এবং ভাবধারাসমূহকে কার্যকরী করার জন্য তিনি এরূপ প্রাণমন দিয়া লাগিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একটা ভাঙ্গন দেখা দিল। যাঁহারা সংস্কারের তত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই প্রাচীনতর সম্প্রদায় নিজেদের

আদি বা মূল ব্রাহ্ম সমাজ বলিতেন। বাকী সভ্যাদিগের মধ্যেও আবার ভাঙ্গন ঘটিল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা নিজদিগকে নববিধান কিংবা the New Dispensation নাম দিয়াছিলেন; এবং অপর দল নিজেদের বলিতেন সাধারণ (বা general body) ব্রাহ্ম সমাজ। যাহা হউক, ব্রাহ্ম সমাজের সকল শাখার মধ্যেই কোনও কোনও নীতি ছিল এক। তাঁহারা সকলে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। ধর্মীয় সাধনায় পৌত্তলিকতার নিন্দা তাঁহারা সকলেই করিতেন এবং সমাজে জাতিভেদ-প্রথা রদেরও তাঁহারা প্রবক্তা ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কোনও কোনও স্থানে উহা ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—যথা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে উহার নাম ছিল প্রার্থনা সমাজ।

ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়দিগের এই নব্য সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক দীক্ষিত হন নাই তাঁহারাও উহার সংস্কার ও প্রগতির তাৎপর্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের অত্যাধুনিক ভাবধারাসমূহ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদিগের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের মধ্যে যাহা কিছু ছিল উহার সমস্তই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে তাঁহারা উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন নব্য যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সাড়া জাগাইতে পারে নাই। প্রায় এই সময়ে, গত শতাব্দীর নবম দশকে দুইজন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা জনগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হন, যাঁহারা নবজাগরণের ভবিষ্যৎ গতিপথে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে ভাগ্যনির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা হইলেন সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু রামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দু রীতিতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন যুবক, গুরুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। রামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বিরোধ দূর করিতে বলিয়াছেন। ইহাও তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে ত্যাগ, সংযম ও কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া ধর্মীয় সাধনায় মূর্তির আবশ্যকতা তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং সমাজের অতি-আধুনিক অনুকরণ-স্পৃহার নিন্দা করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে, তিনি শিষ্যকে ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁহার ধর্মোপদেশগুলির প্রচারকার্যের ভার এবং স্বদেশবাসীদিগকে জাগাইয়া তুলিবার দায়িত্ব দিয়া যান। ঐ উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী-দিগের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন—যাহার লক্ষ্য ছিল, ভারতে ও ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় হিন্দু ধর্মের প্রকৃত রূপটি প্রচার করা ও তদনুযায়ী চলা; উপরন্তু, সুস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রতিটি

উদ্যোগকে প্রেরণা দানে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উৎস। তিনি নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ববোধ, তাহার ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার চেতনা সঞ্চারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও স্বামীজি কখনও কোনও রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেন নাই, তথাপি যে কেহ তাঁহার বা তাঁহার রচনাবলীর সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার মধ্যেই একটা দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ বাঙলা দেশ সম্বন্ধে যত দূর বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক স্রষ্টা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯০২ সালে তিনি খুব অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রভাব বরং আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস যে সময়ে বাঙলা দেশে বিরাজ করিতেছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়েই আর একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তিনি ছিলেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক ছিল সর্বাধিক। ব্রাহ্ম সমাজের মত ইহা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলির দিকে ফিরিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল, এবং পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ও অসার যাহা কিছু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তাহার নিন্দা করিয়াছে। যে জাতিভেদ-প্রথা অতি প্রাচীন কালে ছিল না তাহা রহিত করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মত আর্যসমাজও প্রচার চালাইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মত ছিল এই যে, লোককে খাঁটি আর্য ধর্মে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং প্রাচীন কালের আর্যদিগের মত জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। 'বেদে ফিরিয়া চল'—ইহা ছিল তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্বনি। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ—দুই-ই লোককে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে কখনও এরূপ কোনও চেষ্টা হয় নাই; কারণ রামকৃষ্ণ একটি নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। উপরন্তু একদিকে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও খৃষ্টধর্মের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে অপরদিকে আর্যসমাজের সকল প্রেরণার উৎস ছিল স্বদেশী। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি যাহার উপরেই তাহাদের প্রভাব পড়িয়াছে তাহার ভিতরেই একটা আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যেই ভারতের একটা বিরাট অংশ জুড়িয়া বৃটিশ শাসন বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভারতবাসী ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে যে, এই নূতন আক্রমণকারিগণ পূর্বেকার আক্রমণকারীদিগের মত নয়। তাহারা কেবল মাত্র অর্থোপার্জন বা ধর্ম প্রচার করিতে আসে

নাই, বরং দেশটাকে জয় করিয়া শাসন করিতে আসিয়াছে এবং পূর্বেকার আক্রমণকারীদিগের মত তাহারা ভারতকে তাহাদের দেশ করিয়া লইতে নয় বরং বিদেশী হিসাবে শাসন করিতে উদ্যত। এই জাতীয় দুর্দৈবের উপলব্ধি, যে বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন তাহারা হইয়াছে ঐ সম্বন্ধে জনসাধারণকে দ্রুত জাগ্রত করিয়া তুলিল। ইহার পরিণতি হইল ১৮৫৭ সালের বিপ্লব। ইহা কোনও ক্রমেই কেবলমাত্র সৈন্যদিগের বিদ্রোহ ছিল না—ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যাহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিতে অভ্যস্ত—বরং ইহা ছিল একটি প্রকৃত জাতীয় বিপ্লব। ইহা ছিল এরূপ একটি বিপ্লব—যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যোগ দিয়াছে এবং তাহারা সকলে একজন মুসলমানের নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়াছে। সেই মুহূর্তে মনে হইয়াছিল বুঝি বা ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যাইবে। কিন্তু নিতান্তই অদৃষ্টবশতঃ অতি অল্পের জন্য তাহারা জিতিয়া গেল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হইবার অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি হইতেছে পাঞ্জাবের শিখদিগের মত কোনও কোনও অঞ্চল হইতে সমর্থনের অভাব এবং নেপালের গুর্খাদের বৈরিতাসাধন। বিপ্লব দমন করার অব্যবহিত পরেই একটা আতঙ্কের রাজ দেখা দিল এবং দেশকে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরস্ত্র করা হইল। ইহার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল, এবং ঐ সময়ের মধ্যে কেহই মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। গত শতাব্দীর নবম দশকে পরিবর্তন শুরু হইল। ভারতবাসী তাহাদের সাহস ফিরিয়া পাইতে আরম্ভ করিল, এবং আধুনিক জগতের জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া বিদেশীদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৮৫ সালে জন্ম হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের: আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নয় বরং নিয়মতান্ত্রিকতার পথে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।)

পশ্চিম-ভারতের জাগরণ উত্তর-ভারতের মত ছিল না: ধর্মীয় আন্দোলন অপেক্ষা শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনরূপেই উহা অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই জাগরণের স্রষ্টা বিচারপতি এম. জি. রানাডে; পরে শ্রীযুক্ত জি. কে. গোখেল তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে শ্রীযুক্ত বি. জি. তিলক, শ্রীযুক্ত জি. জি. আগারকার ও শ্রীযুক্ত ভি. এস. আপ্তে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীযুক্ত গোখেল এই সমিতিতে যোগ দেন। পরে লোকমান্য তিলক ও শ্রীযুক্ত গোখেলের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে। তিলক গোখেলের মত সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন না এবং রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 'চরমপন্থীদের' দলে; এবং গোখেল ছিলেন বিশিষ্ট 'মধ্যপন্থী' নেতাদিগের অন্যতম। ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত গোখেল সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতের

সেবা করিবার জন্য জাতীয়তার প্রচারকদিগকে শিক্ষা দান এবং নিয়মতান্ত্রিক সমস্ত উপায়ে ভারতবাসীর যথার্থ কল্যাণসাধন'। দেশবাসীকে জাগাইবার জন্য লোকমান্য তিলক বিভিন্ন যে সকল উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল গণপতি উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন ও শিবাজী-উৎসব: প্রথমটি একটা ধর্মীয় উৎসব হইলেও তিনি উহার জাতীয় তাৎপর্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অপরটি প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রে বিখ্যাত নেতা শিবাজীর জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত হইত।

১৮৮৬ সালে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি ও কর্নেল ওলকট দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের নিকট এডিয়ারে যে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, সামাজিক ও জন-জীবনে উহা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছিল। ১৮৯৩ সালে শ্রীযুক্তা বেসান্ত ভারতে এই সমিতিতে যোগদান করেন এবং ১৯০৭ সালে উহার সভাপতি হন: ১৯৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু ধর্মের উপর যে সকল আক্রমণ হইয়াছিল সেগুলির বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তা বেসান্ত কঠোর সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। এমন কি হিন্দু ধর্মের ভুল-ভ্রান্তি ও অনাচারগুলিকে আক্রমণ না করিয়া বরং তিনি ঐগুলির তাৎপর্য উপস্থাপিত করিতেন। তদ্দ্বারা তিনি দেশবাসীর মনে তাহাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্যের আঘাতের ফলে একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। তাঁহার ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের ফলে তাঁহাকে ঘিরিয়া যে বিশাল অনুগামিবৃন্দ গড়িয়া উঠা সম্ভব হয়, উহার মূল্য ও শক্তি তখনই তাঁহার কাছে খুব বেশী প্রতীয়মান হইয়াছিল যখন ১৯১৬-১৭ সালে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক প্রচণ্ড অভিযান চালাইয়াছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বিদেশী গভর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গাড়িয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। পূর্বে যেরূপ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সংগে সংগে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা আর সেরূপ রহিল না। দেশের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে বহু শাখা-প্রশাখা এবং কেন্দ্রের আদেশাধীন কঠোর আমলাতান্ত্রিক শাসন লইয়া ইহা ছিল খুবই একটা জটিল ব্যবস্থা। বিদেশী শাসন বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়—তাহাদের ইতিহাসে দেশবাসী এই প্রথম ইহা অনুভব করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা গেল বৃটিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সহিত নবজাগ্রত জাপানের লড়াই এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবীতে সর্ব-শক্তিমান জারের সহিত রুশ জনসাধারণের সংগ্রাম। প্রায় এই সময়ে শাসকদিগের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল, এবং গুরুতর রাজনৈতিক অশান্তির লক্ষণসমূহ দেখা দিল বাঙলা

দেশে; উহাকে অংকুরে বিনাশ করিবার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করার আদেশ জারী করিলেন। ইহা ছিল দেশব্যাপী বিদ্রোহের ইংগিত এবং সর্বত্র লোকে অনুভব করিতে লাগিল যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই যথেষ্ট নহে। বঙ্গ-ভঙ্গকে সংগ্রামের আহ্বানরূপেই ধরিয়া লইয়া উহার জবাবে বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেশের লোক বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের এক আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য, ললিতকলা ও কারিগরি-শিল্পের উন্নতিতে গভীর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রদান ও নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে যুবকদিগকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই নূতন আন্দোলনকে গভর্নমেণ্ট স্বভাবতঃই সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই এবং উহাকে দমন করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। সরকারী নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে, বহু যুবক বোমা ও রিভলভারের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত, এবং ইহা দমনের জন্য গভর্নমেন্ট ১৯০৯ সালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙ্গালী যুবকদিগকে দৈহিক কসরৎ শিক্ষা দানের কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটা মতানৈক্য ঘটিল। বামপন্থী নেতাগণ—পুণার লোকমান্য তিলক ও বাঙ্গলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—কংগ্রেসের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বৃটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিতে চাহিলেন, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তাঁহারা সন্তুষ্ট রহিলেন না। বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ শা মেটা, পুণার শ্রীযুক্ত জি. কে গোখলে এবং বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত (পরে স্যার উপাধি-প্রাপ্ত) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দক্ষিণপন্থী নেতাগণ অধিকতর মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। এই বিরোধে একটা মাঝামাঝি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে যখন বামপন্থীরা ('জাতীয়তাবাদী' বা 'চরমপন্থী'রূপেও পরিচিত) পরাজিত হইলেন তখন একটা প্রকাশ্য দলাদলি শুরু হইল এবং কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণ-পন্থীদের ('মধ্যপন্থী' বা 'উদারপন্থী'রূপেও অভিহিত) হাতে চলিয়া গেল। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই রাজদ্রোহের জন্য লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ নির্বাসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেন। কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার, গভর্নমেণ্টের নির্যাতন ও তাঁহাদের নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতির ফলে বামপন্থীদের (বা চরমপন্থীদের) ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটা দুঃসময়ের মধ্য

দেয়া যাইতে হয় এবং মধ্যপন্থীদিগের একচেটিয়া প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ সালের যে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারকে মধ্যপন্থীরা স্বাগত জানাইয়াছিলেন এবং চরমপন্থীরা নিন্দা করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের নিকট উহা সাময়িক একটা মীমাংসার মত কাজ করিয়াছিল। ভারতের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং জেল হইতে লোকমান্য তিলকের প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিঃসন্দেহে উন্নতি ঘটে। ১৯১৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের দুইটি শাখার মধ্যে একটি আপোষ হইল এবং চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীরা পুনরায় একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্ণৌতে আরও একটি আপোষ হইয়াছিল কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে। এই বুঝাপড়ার ফলে স্বায়ত্তশাসনের একই দাবী পেশ করিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং সংশোধিত শাসনতন্ত্র অনুসারে 'পৃথক নির্বাচনের' ভিত্তিতে আইন-সভাগুলিতে মুসলমানদিগের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারেও একমত হইল। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা হইল: দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়া তিনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে সেখান হইতে ভারতে ফিরেন। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর, ভারতের স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া লোকমান্য তিলক, শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না বিরাট এক অভিযান শুরু করেন। এই ব্যাপারে ১৯১৭ সালে গভর্নমেন্ট কর্তৃক শ্রীযুক্তা বেসান্ত অন্তরীণ হন, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। চরমপন্থীরা শ্রীযুক্তা বেসান্তকে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের সভানেত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মধ্যপন্থীরা উহাতে বাধা দেন। শেষ মুহূর্তে একটি মীমাংসা হওয়ায় উভয় পক্ষের সমর্থনে শ্রীযুক্তা বেসান্ত সভানেত্রী হন। যাহা হউক, উহাই ছিল কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন—যাহাতে মধ্যপন্থীরা যোগ দেন; কেননা, পরের বছর তাঁহারা পৃথক হইয়া গিয়া তাঁহাদের নিজেদের ভিন্ন একটি দল গঠন করেন, যাহার নাম দেওয়া হয় অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন। ১৯১৭ সালে বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগু এই মর্মে এক বিবৃতি দিলেন যে, দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ধাপে ধাপে গড়িয়া তোলাই ভারতে বৃটিশ শাসনের লক্ষ্য। তাহার পর শীঘ্রই শ্রীযুক্ত মন্টেগু ভারতে আগমন করেন এবং আসন্ন সংস্কার সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে একত্রে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, যাহা মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে

বিবেচনা করিয়া দেখা হয় কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া কংগ্রেস উহা প্রত্যাখ্যান করে। পাটনার সুবিখ্যাত এডভোকেট ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম ঐ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে নূতন এক শাসনতন্ত্র তৈয়ারী করিয়া পাস করাইয়া লন। ভারতে জাতীয়তাবাদিগণ এই শাসনতন্ত্রকে অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিকে যখন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইতেছিল, তখন অন্যদিকে ভারত গভর্নমেন্ট দেশবাসীর জন্য নূতন করিয়া শৃঙ্খল রচনা করিতেছিলেন। দেশবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট কর্তৃক নূতন এক আইন পাস হইল, যদ্দ্বারা লোককে রাজনৈতিক কারণে অনির্দিষ্ট কাল বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা যাইবে। এই আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাবে আন্দোলনকে দমনের চেষ্টায় জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় সেনাবাহিনী অমৃতসরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। অমৃতসরের এই হত্যাকাণ্ড শুধু ভারতে নয়, ইংলন্ডে ন্যায়বিচারবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি সকলের মধ্যেও যে প্রচণ্ড ক্রোধ সঞ্চারিত করে তাহার তুলনা নাই। অমৃতসরের ঘটনার পর, দুইটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়—কংগ্রেস কর্তৃক একটি ও অপরটি গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে। উভয় কমিটিই তীব্র ভাষায় সেনাবাহিনীর কার্যের নিন্দা করেন, যদিও কংগ্রেস তদন্ত কমিটির নিন্দার ভাষা ছিল তীব্রতর। কিন্তু ভুক্তভোগীদের ক্ষতি-পূরণ ও দুষ্কৃতিকারীদিগের শাস্তি বিধানের জন্য গভর্নমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। যদিও নূতন শাসনতন্ত্রের ধরন সন্তোষজনক ছিল না, তৎসত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে উহাকে কার্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু যখন অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মনোভাব প্রকাশ পাইল তখন দেশবাসীর মন দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে তুরস্ককে বিভক্ত করিবার জন্য মিত্র শক্তিবর্গের চেষ্টা ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্রোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চলিয়া গেল। তুরস্কের সুলতান, যিনি 'খলিফা' বা ঐশ্লামিক জগতের ধর্মগুরুও ছিলেন, তাঁহাকে সমর্থন করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন নামে একটা আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় খিলাফৎ নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত গান্ধীর মধ্যে একটা বুঝাপড়া হইল। শাসন-সংস্কার, বিশেষতঃ নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সেই বছরের নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব স্থির করিবার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন বসিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিল

যে, নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি অসহযোগের নীতি গ্রহণ করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনটি কারণ দেখানো হইয়াছিল—পাঞ্জাবের নৃশংস আচরণ, তুরস্কের প্রতি গ্রেট বৃটেনের মনোভাব ও নূতন সাংবিধানিক সংস্কারের অপ্রতুলতা।

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরুইন এই মত পোষণ করেন যে, ইংলন্ডে ও উহার রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের জন্য গৃহীত প্রত্যেকটি ব্যবস্থার সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী সময়ের ব্যবধানে, ভারতে অগ্রগতির একটা যোগ রহিয়াছে। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি এই যে, ইংলন্ডে বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য সকল অংশে গণ-আন্দোলনের পরেই আসিয়াছে ১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৬১-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট এবং ১৯০৯-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট। লর্ড আরুইন যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া বলা যায় যে, গঠনমূলক দিক হইতে বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্যত্র যেমন, ভারতেও তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা গুরুত্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নির্দেশ করিতেছে। ১৮৪৮-এর বিশ্ব বিপ্লবের পরে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় এমন এক সময়ে যখন বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রান্তেও একই রকমের অভ্যুত্থান ঘটিতেছিল :- দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়, এবং উহা ছিল ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সমসাময়িক। মহাযুদ্ধ চলিবার সময় যে বিপ্লবের চেষ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় একই সময়ে উহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও কম অনস্বীকার্য নয় যে, ১৯২০-২১ সালের আন্দোলন, আয়ার্ল্যান্ডের সিন ফিন বিপ্লব, তুর্কীদিগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা, এবং যে সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, সেগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছিল। অতএব, গত এবং বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যে সকল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল তাহার সহিত মূলগত ভাবে ভারতের এই জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৪

সংগঠন, দল ও ব্যক্তিত্ব

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে ভারতের বিভিন্ন সংগঠন, দল ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রধান দল বা সংগঠন হইতেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস; ইহা ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা ভারত জুড়িয়া ইহার শাখা আছে। প্রায় ৩৫০ জন সদস্য লইয়া সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে—ইহাকে বলা হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি এক বৎসরের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে—উহাকে ওয়ার্কিং কমিটি বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের একটি করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আছে, আর এই কমিটির অধীনে থাকে জেলা, মহকুমা (কিংবা তহশীল বা তালুক), ইউনিয়ন ও গ্রাম কংগ্রেস কমিটি। নির্বাচনের নীতিতে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হইয়া থাকে। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতেছে 'শান্তিপূর্ণ ও বৈধ সকল উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন'। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতা[১]—কার্যতঃ তিনিই একচ্ছত্র অধিনায়ক। ১৯২৯ সালের পর হইতে তাঁহার নির্দেশানুসারেই ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হইয়াছে; এবং তাঁহার ও তাঁহার নীতির নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কাহারও উক্ত কমিটিতে স্থান হয় না।

কংগ্রেসের মধ্যে একটা শক্তিশালী বামপন্থী দল আছে, যাঁহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক—অর্থাৎ জাতিভেদ, জমিদার বনাম কৃষক এবং পুঁজিবাদ ও শ্রম সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নে গণতান্ত্রিক মত পোষণ করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধিকতর বলিষ্ঠ ও কার্যকরী নীতির সমর্থনও এই দল করেন। এই সকল প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর মত অপেক্ষাকৃত আপোষমূলক ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে বামপন্থী দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট-জেনারেল ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—স্বর্গতঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র ও পেশার দিক হইতে প্রাক্তন এডভোকেট, এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—লাহোরের সুবিখ্যাত মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ মহম্মদ আলম এক পাশী ভদ্রলোক ও পেশায় এডভোকেট, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরীম্যান—

[১] প্রকৃত নেতা কংগ্রেস সভাপতি নহেন। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যাঁহাকেই সভাপতি করা হউক না কেন, তিনি পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতিরূপে থাকিয়া যান। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি কর্তৃক মনোনয়নের ফলে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।

লাহোরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ এস. কিচলু এবং বর্তমান গ্রন্থের লেখক। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং ডাঃ কিচলু ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক[১] ব্যতীত আর সকলে মহাত্মার পক্ষে যোগ দিয়াছেন। বিশিষ্ট নেতাদিগের মধ্যে অনেকে না থাকিলেও বামপন্থী দল মোটের উপর শক্তিশালী। এই ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভূমিকাটি কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহার ধারণা ও মত সংস্কারবাদীর মত এবং নিজেকে তিনি পুরা সমাজতন্ত্রবাদী বলেন—অথচ কার্যক্ষেত্রে তিনি মহাত্মার একজন অনুগত শিষ্য। ইহা বলা বোধ হয় ঠিক হইবে যে, বুদ্ধির দিক হইতে তিনি বামপন্থী দলের, কিন্তু হৃদয়টা তাঁহার পড়িয়া আছে মহাত্মা গান্ধীর নিকট।

অন্যান্য নেতাদিগের মধ্যে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান নেতা খান আবদুল গফুর খান (সীমান্ত গান্ধীরূপে যিনি সকলের পরিচিত) বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়; কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক রূপ ঠিক কি তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন ও যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের ঝোঁক বামপন্থী দলের দিকে হইলেও তাঁহারা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুগামী। মধ্যপ্রদেশের নেতৃবৃন্দ শেঠ গোবিন্দ দাস ও পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ মিশ্রেরও ঝোঁক বামপন্থীদের দিকে। ১৯২০ সালের পূর্বে জাতীয় আন্দোলনে যাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে পুণার লোকমান্য তিলক, কলিকাতার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, পুণার শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ শা মেটা মারা গিয়াছেন। প্রথম দুইজন বামপন্থী দলে ছিলেন, এবং বাকী সকলে দক্ষিণপন্থীদের দলে। ১৯২০ সালের পর হইতে যে সকল নেতা প্রধান অংশগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারা এখন জীবিত নাই লাহোরের লালা লাজপৎ রায়, কলিকাতার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল। কংগ্রেস হইতে যে সকল বিশিষ্ট নেতা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৯০৯ সালের পর হইতে ফরাসী পণ্ডিচেরীতে ধর্মীয় জীবন যাপন করিতেছেন, এবং মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৯৩০ সালে সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৩৪ সালের মে মাস হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠনের জন্য বামপন্থীদিগের অনেকে হাত মিলাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ ও

[১] করাচীর স্বামী গোবিন্দানন্দও দৃঢ়ভাব সহিত বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাইতে এই দল এখন পর্যন্ত সর্বাধিক সমর্থন লাভ করিয়াছে—তবে সারা ভারত হইতেও সমর্থন আসন্ন। ভবিষ্যতে এই দল কিরূপ হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে, কারণ যাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন হয় জেলে নতুবা ভারতের বাহিরে। বর্তমানে দলগুলির পুনর্বিন্যাস চলিতেছে এবং রাজনীতিতে শীঘ্রই নূতন করিয়া দল গঠন করা হইবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী একটি মুসলমান গোষ্ঠী আছে এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট—অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে উহার নিজস্ব প্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন। এই গোষ্ঠীতে আছেন কলিকাতার মৌলানা[১] আবুল কালাম আজাদ, দিল্লীর ডাঃ এম এ. আনসারী এবং লাহোরের[২] ডাঃ মহম্মদ আলম। কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও বেশী ঝোঁক হিন্দু মহাসভার প্রতি যেমন, বারাণসীর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও বেরারের শ্রীযুক্ত এম এস. অ্যানের কথা বলা যায়।

১৯১৮ সালের পূর্বে, চরমপন্থী (বা জাতীয়তাবাদী) এবং মধ্যপন্থী (বা উদারপন্থী)—কংগ্রেসের মধ্যে এই দুইটি দল ছিল। ১৯০৭ সালে চরমপন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হন কিন্তু ১৯১৬ সালে একটা মিটমাট হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালে, চরমপন্থিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যপন্থীরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। লিবারেল পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ হইতেছেন এলাহাবাদের স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, বোম্বাইয়ের স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও স্যার ফিরোজ শেঠনা, মাদ্রাজের মাননীয় ভি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও স্যার শিবস্বামী আয়ার, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মার বিশ্বস্ত সমর্থক তাঁহারা হইতেছেন-গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, দিল্লীর ডাঃ এম এ আনসারী; পাটনার ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ; ল্যাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম ও সর্দার শার্দুল সিং; এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী; বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু; কলিকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ; নাগপুরের শ্রীযুক্ত অভয়ঙ্কর; করাচীর শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম এবং কলিকাতার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ইঁহাদের মধ্যে, সকলের মতে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক।

[১] মৌলানা অর্থশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত মুসলমান, ঠিক যেমন পণ্ডিত বলিতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বুঝায়। তবে ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, যেমন কাশ্মীরে, জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, সকল ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই পণ্ডিত কথাটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[২] এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত শেরওয়ানী, দিল্লীর শ্রীযুক্ত আসফ আলি ও লক্ষ্ণৌর শ্রীযুক্ত খালিকুজ্জমানও এই গোষ্ঠীতে আছেন। ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে আইন সভার নির্বাচনে প্রথমোক্ত দুইজন নির্বাচিত হইয়াছেন।

সকল সম্প্রদায়ের সদস্যদিগকে লইয়া উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও বহু সাম্প্রদায়িক দল আছে, যাহাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হইতেছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগের স্বার্থ রক্ষা করা। মুসলমানদিগের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সর্বাপেক্ষা প্রধান দল; উহা প্রথম শুরু হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২০ হইতে শুরু করিয়া ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি। কিন্তু ১৯২৪ সালে খলিফার পদ তুলিয়া দেওয়ার পর ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়, এবং মুসলিম লীগ পুনরায় উহার পূর্বগুরুত্ব লাভ করে। মুসলিম লীগ ছাড়া, অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স-এর মত অন্যান্য বহু দল সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ হইতেছেন আগা খাঁ; শ্রীযুক্ত এম. এ. জিন্না (যিনি ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন), লাহোরের স্যার মহম্মদ ইকবাল; যুক্তপ্রদেশের স্যার মহম্মদ ইয়াকুব এবং পাটনার শ্রীযুক্ত সফী দাউদী। মৌলানা শওকৎ আলি, যিনি এক সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা ছিলেন,—তিনি কয়েক বার সাম্প্রদায়িক মুসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক নেতৃগণ ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ—ইঁহাদের মধ্যে স্যার আব্দার রহিমের ভূমিকা মাঝামাঝি।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্টি হইয়াছে হিন্দু মহাসভার, যাহার উদ্দেশ্য হিন্দুদিগের অধিকারগুলি রক্ষা করা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে ইহার প্রভাবশালী সমর্থক আছে। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে আছেন কলিকাতার শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মডার্ন রিভিউ-র সম্পাদক), নাগপুরের ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে; লাহোরের ভাই পরমানন্দ ও পুণার শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকার। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যদিও কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তিনিও হিন্দু মহাসভায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা ছাড়াও অন্যান্য বহু সাম্প্রদায়িক দল আছে। যথা,—অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান, শিখ (পাঞ্জাবের) এবং হিন্দুদিগের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীগুলির স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা অর্থাৎ যতটা সম্ভব সুবিধা আদায়ের জন্য তাহাদের নিজেদের দল। এই সকল দলের মধ্যে যে দলটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতেছে—মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি অব্রাহ্মণদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং উহার নীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় গভর্নমেন্ট-ঘেঁষা। ভারতের সর্বত্র অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দল আছে, যাহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকে। পাঞ্জাবের শিখেরা মোটের উপর তীব্র জাতীয়তাবাদী।

যে সকল রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করিয়াছি, সেগুলি যখন কোন এক রাজনৈতিক কর্মসূচী তুলিয়া ধরিয়া গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বা তাহাকে বাধা দান করিয়া কোনও প্রকার আন্দোলন চালায় তখন সরকার-প্রদত্ত ছিটাফোঁটা সুযোগ-সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া সাম্প্রদায়িক দলগুলি অধিকতর ব্যস্ত থাকে। ভেদনীতির কালজীর্ণ কৌশলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের প্রভাবকে দুর্বল করিয়া উহাকে প্রতিহত করিবার প্রয়াসেই গভর্নমেন্ট এই সকল দলকে খুব উৎসাহ দিয়া থাকে। ১৯৩০ সালে ও তাহার পরে গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে যখন ভারতবাসীর ভোটে নির্বাচিত না করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করেন—এবং এই সকল মনোনয়নের সময়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াইয়ের সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক দলগুলির কোনও সম্পর্ক নাই, সেগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় তখনই ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রয়োজন দেখা দিলেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট রাতারাতি নেতা সৃষ্টি করেন এবং বৃটিশ পত্রিকাগুলির সৌজন্যে তাঁহাদের নাম সারা বিশ্বে তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন। যখন ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বিবেচনাধীন ছিল, তখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করার জন্য মাদ্রাজের স্বর্গতঃ ডাঃ টি. এম. নায়ারকে লন্ডনে নেতা দাঁড় করানো হয়। ১৯৩০ সালে ও তাহার পরে, সদাশয় বৃটিশ গভর্নমেন্ট ডাঃ আম্বেদকরকে নেতা তৈয়ারী করিয়াছেন কারণ জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

গুরুত্বের দিক হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরেই শ্রমিক ও কৃষক দলগুলি। অবশ্য কৃষক সংগঠন অপেক্ষা শ্রমিক সংগঠনের অধিকতর অগ্রগতি হইয়াছে। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম স্থাপিত হয় এবং ঐ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এন. এম. যোশী অন্যতম। সেই হইতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রচন্ড ঝড়-ঝাপটা পার হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৯২৯ সালে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে নাগপুর অধিবেশনে একটা ভাঙ্গন দেখা দেয়,—শ্রীযুক্ত এন. এম. যোশী; শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরি; শ্রীযুক্ত শিব রাও; শ্রীযুক্ত আর. আর. বাখেল ও অন্যান্য অনেকের প্রতিনিধিত্বে দক্ষিণপন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে আর একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এখন বৃটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া থাকে এবং আমস্টারডামের ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। লিবারেল পার্টি ও এই দলের রাজনীতি একেবারে একজাতীয়। ১৯৩১ সালে, লেখকের সভাপতিত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে পুনরায় মতভেদ

ঘটিল, যাহার ফলে চরমপন্থী দল বাহির হইয়া গিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্টদিগের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রেরণায় এই দল কাজ করে বলা হইয়া থাকে, তবে উহার জন্মের পর হইতে কখনও খুব বেশী কার্যকলাপ এই দল দেখায় নাই। বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, যাহার সহিত লেখক যুক্ত, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য ভাবে বলা যায়, ইহা নিশ্চিতরূপে সমাজতন্ত্রবাদী কিন্তু থার্ড ইন্টারন্যাশনালের নীতি ও কার্যপ্রণালীর বিরোধী। অথচ ইহা জুরিখের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল অথবা আমস্টারডামে ট্রেড ইউ-নিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ—কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। যাহাই হউক, বৃটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যেরূপ আস্থা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেরূপ আস্থা নাই এবং ভারতীয় রাজ-নীতিতে লিবারেল ফেডারেশন অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিকতর মিল দেখা যায়। কানপুরের পণ্ডিত হরিহর-নাথ শাস্ত্রী এখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক কলিকাতার শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়—পূর্বে যিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ছিলেন—ভবিষ্যতে ভারতের শ্রমিক, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনেও কি ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, তাহা অনুমান করিতে কৌতূহল হয়। অতীতের কার্যকলাপ, মেলামেশা ও লেখার ভিত্তিতে যদিও এখনও অনেকে তাঁহাকে কমিউনিস্ট বলিয়া মনে করেন—স্বয়ং কমিউনিস্টরা তাঁহাকে প্রতি-বিপ্লবী বলিয়া থাকেন। অতীতের কার্যকলাপের জন্য তিনি এখন ভারতে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ইত্যবসরে বোম্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলিতে তাঁহার অনুগামীরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; তাঁহারা রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরোধী, যাহাকে অনেকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলিয়া অভিযোগ করেন। যেহেতু শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন, সেজন্য পূর্বে যাঁহাদের কমিউনিস্ট বলা হইত—সেই সব শ্রমিকনেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি দল শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, এবং অন্য আর একটি দল প্রতি-বিপ্লবী বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

১৯২০ সাল হইতে সমগ্র ভারতে কৃষকদিগের মধ্যে জাগরণ শুরু হইয়াছে, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উহার সৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়িয়া উঠে নাই। যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলন খুব শক্তিশালী এবং সেখানে উহা কিষাণ (Peasant) সঙ্ঘ নামে সংগঠিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের বামপন্থী কংগ্রেসীরা কৃষক আন্দোলনের

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাঁহাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে সংস্কার-বাদী। যে গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক, সেখানেও কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী—তবে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন: এবং কৃষকদিগের নেতা হইতেছেন মহাত্মার দক্ষিণ হস্ত সর্দার প্যাটেল। গুজরাটে কৃষক আন্দোলন আজ পর্যন্ত শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতে অগ্রসর হয় নাই, তবে আন্দোলনে শীঘ্রই একটি আমূল পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। পাঞ্জাবে ক্ষমতাশালী কির্‌তি (Workers) কিষাণ (Peasant) দলের উপর এবং দলের কোন কোন অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে লাভ করিলে ঐ দলটির আরও দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হইত। বাঙ্গলা দেশে কৃষক আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং সংগঠনগুলি কৃষক (Peasant) সমিতি (Societies) নামে পরিচিত কিন্তু যথেষ্ট সৎ ও যোগ্য নেতার অভাবে আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে নাই। এতদিন পর্যন্ত, বাঙ্গলা দেশে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম কর্মিগণ রাজ-নৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু শীঘ্রই ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন করিয়া যে দলগঠন হইতে চলিয়াছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে কৃষক আন্দোলনে কর্মীর সম্ভবতঃ অভাব হইবে না। মধ্যভারতেও কৃষক আন্দোলন মোটের উপর শক্তিশালী কিন্তু দক্ষিণ ভারতে—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে—ইহা অপেক্ষাকৃত পিছাইয়া আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশের কোনও কোনও অঞ্চলে, যাহাকে অন্ধ্র বলা হয়, কেবল সেখানেই আন্দোলন শক্তিশালী।

ভারতে ছাত্র, সেই সঙ্গে যুব সমাজের মধ্যেও স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছাত্র ও যুবকদিগের সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—তবে এই সকল কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য স্থায়ী কোনও সর্ব-ভারতীয় কমিটি নাই। সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভিত্তিতে এই দুইটি আন্দোলন পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গলায়ই ছাত্র আন্দোলন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ছাত্রদের শেষ সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে যুব আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলায় 'যুব সমিতি' বা 'তরুণ সঙ্ঘ' নাম জনপ্রিয়। 'নওজোয়ান ভারত সভা' নাম অধিকতর প্রচলিত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নরীম্যানের সভাপতিত্বে প্রথম যুব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৩১ সালের মার্চে করাচীতে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ও শেষ কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি কাজ করিয়া থাকে,

যদিও ঐ সকল সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী অধিকতর সংস্কারবাদী।

শেষে উল্লেখ করিলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, আজ ভারতীয় জনজীবনে নারী আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এই আন্দোলন দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। এই জাগরণ সেই সকল আশ্চর্য ঘটনাগুলির একটি যাহা বহুলাংশে মহাত্মার জন্য সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; তৎসত্ত্বেও সমগ্র দেশব্যাপী স্বতন্ত্র নারী সমিতি জন্মলাভ করিয়াছে। সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে, এই আন্দোলন প্রাদেশিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অনেক প্রদেশে—যেমন বাঙলায়—মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভারতে সকল কংগ্রেস কমিটিতে নারীগণ এখন মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক পরিষদ—ওয়ার্কিং কমিটিতে—অন্ততঃ একজন মহিলা প্রতিনিধি আছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বার্ষিক অধিবেশনের দুইটিতে—১৯১৭ সালে শ্রীযুক্তা বেসান্ত ও ১৯২৫ সালে মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু—এই দুইজন মহিলা সভানেতৃত্ব করিয়াছেন।

নারীদিগের উপরোক্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু সংগঠন আছে, সামাজিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজ করাই যেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই সকল সংগঠন পরিচালিত হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ সংগঠনের একটি হইতেছে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন. ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় যাহার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

মোটামুটিভাবে ভারতে আজ সর্বাপেক্ষা প্রধান সংগঠন হইতেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সমগ্র দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের ইহা প্রতিনিধিস্বরূপ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইহার সংগ্রাম—তবে জাতীয় জীবনের সর্বতো-মুখী বিকাশ ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর সব কিছুর সংস্কার সাধন করাও ইহার লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ছাড়া দেশের অন্যান্য সকল দল বা সংগঠন মোটের উপর কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সহ-যোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা আজ মহাত্মা গান্ধী—তবে একটা শক্তিশালী বামপন্থী দলও[১] কংগ্রেসের ভিতরে আছে, যাহারা সংস্কারবাদী। পুঁজিবাদ ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, এবং জাতিভেদের সামাজিক প্রশ্নের মত সকল বিষয়ে মহাত্মা এতদিন পর্যন্ত একটা মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ

[১] বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দলভুক্ত।

করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিকতর সংস্কারমূলক ও আপোষহীন নীতির জন্য বামপন্থী দল কাজ করিয়া চলিয়াছে, এবং ইহা অসম্ভব নয় যে, শীঘ্রই কংগ্রেস ইহার মতামত গ্রহণ করিবে।

১

ঝড়ের পূর্বাভাষ (১৯২০)

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে; ঐ বৎসরের গোড়ার দিকে সেখানে যে নৃশংস কান্ড ঘটিয়াছিল উহার ছায়া তখনও থমথম করিতেছিল। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নূতন শাসনতন্ত্রকে (যাহাকে ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বলা হইত) কার্যকর করা ও ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগু উহার প্রবর্তনে এরূপ একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুকূলে এক প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। অমৃতসর কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধী অনেকাংশে দায়ী ছিলেন; ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিয়া তিনি রাজকীয় ঘোষণাকে স্বাগত জানাইলেন, এবং ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখিলেন: 'ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে বৃটিশ জাতির সংকল্পের আন্তরিকতার নিদর্শন এই শাসন-সংস্কার আইন, যাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে এই ঘোষণাপত্র এবং এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়......অতএব আমাদের কর্তব্য সংস্কারগুলিকে ছিদ্রান্বেষণমূলক সমালোচনার বিষয়বস্তু না করিয়া বরং যাহাতে সেগুলি সফল হয় সেজন্য শান্তিপূর্ণভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া।'

কিন্তু পরবর্তী নয় মাসে নাটকীয় আকস্মিকতায় বহু ঘটনা ঘটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, যাহা ঘটিল তাহাকে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিজ ভাষায়ই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তাঁহার পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য যখন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে একজন বৃটিশ বিচারপতি শ্রীযুক্ত ব্রুমফিল্ড কর্তৃক তাঁহার বিচার হয় তখন শ্রীযুক্ত গান্ধী এক উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে সারা জীবন বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবার পর কেন তিনি শেষ পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন: 'প্রথম আঘাত আসে রাওলাট আইনরূপে,—জনগণকে সকল প্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই ঐ আইন প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে তীব্র

আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহবান আমি অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার পর আসিল পাঞ্জাবের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগে (অমৃতসরে) হত্যাকাণ্ডে যাহার শুরু এবং চরম পরিণতি হীনতাসূচক আদেশসমূহে, পাইকারী বেত্রাঘাত ও অন্যান্য অবর্ণনীয় অপমানে। ইহাও আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তুরস্কের অখণ্ডতা ও ইসলামের তীর্থস্থানগুলি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুসলমান-দিগের নিকট যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি, বন্ধুদিগের পূর্ব হইতে বিপদাশঙ্কা ও গুরুতর সতর্কবাণী সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারকে কার্যে রূপ দিবার জন্য আমি লড়িয়াছিলাম এই আশা করিয়া যে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় মুসলমানদিগকে প্রদত্ত তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, পাঞ্জাবের ক্ষত নিরাময় হইবে; এবং শাসন-সংস্কারগুলি অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষ-জনক হইলেও ভারতীয় জীবনে আশার এক নূতন যুগের সূচনা করিবে। কিন্তু ঐ সকল আশা চূর্ণ হইয়া গেল। খিলাফৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইল না। পাঞ্জাবের অপরাধকে গোপন করা হইল এবং অধিকাংশ অপরাধীর শাস্তি ত হইলই না বরং তাহারা কার্যে বহাল রহিল, এবং কেহ কেহ ভারতীয় রাজস্ব হইতে পেন্সন পাইতে থাকিল; উপরন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরস্কৃতও হইল। ইহাও আমি লক্ষ্য করিলাম যে, শাসন সংস্কারগুলি হৃদয় পরিবর্তনের নিদর্শন ত নহেই, বরং ভারতের সম্পদকে আরও শোষণ করিয়া লইবার এবং তাহাকে দীর্ঘকাল পরাধীন রাখার উপায় মাত্র।'

'ভারতে নবজাগরণ' শীর্ষক ভূমিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রাওলাট আইনরূপে[১] সকলের কাছে পরিচিত এই নূতন আইনটি ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে কার্যকর হইল, যুদ্ধকালীন জরুরী বিধিগুলি শেষ হইয়া গেলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা ভারত গভর্ণমেন্টকে স্থায়িভাবে অর্পণই ছিল যাহার উদ্দেশ্য। রাজকীয় আইন পরিষদে[২] যখন রাওলাট (কিংবা 'আইনবিরুদ্ধ') আইন প্রবর্তিত হয় তখন উহার বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী এক আন্দোলন সুরু করেন। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টায় রাজশক্তি কর্তৃক এমন সব অত্যাচার চালানো হইল যাহার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা উপলক্ষে সমবেত বহু নিরস্ত্র নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করা হইল। তাহার পর আসিল সামরিক আইনের ফলে এক বিভীষিকার রাজত্ব, যখন বহু ব্যক্তিকে

[১] স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'রাওলাট আইনই অসহযোগ আন্দোলনের কারণ।' (এ নেশন ইন মেকিং, লন্ডন ১৯২৭, পৃঃ ৩০০।)

[২] এখন ভারতীয় আইনসভা বলা হইয়া থাকে।

প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করা হইত; আবার কোনও কোনও রাস্তা দিয়া যাইবার সময় অন্যান্যদের বুকে হাঁটিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে বাধ্য করা হইত। এই সকল ঘটনার তদন্ত করিয়া একটা রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হইল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত একটি বেসরকারী কমিটি এবং অপরটি ভারত গভর্ণমেন্টের সরকারী কমিটি, যাহা হান্টার কমিটি রূপে খ্যাত। রাজশক্তির অধিকাংশ বর্বরোচিত অত্যাচারের অকাট্য প্রমাণ, যাহার মধ্যে অসহায় নারীদিগের চরম অসম্মানের কথাও ছিল, কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি প্রকাশ করিয়াছিল। হান্টার কমিটির রায় কংগ্রেস তদন্ত কমিটির মত অত দূর যায় নাই; তবুও উহা যে কোনও গভর্ণমেন্টের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর ছিল। এই দুইটি রিপোর্ট প্রকাশের পর জনসাধারণ স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিল যে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা নূতন যে যুগ সুরু হইতে চলিয়াছে তজ্জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট সাহস অবলম্বনপূর্বক দুষ্কৃতিকারীদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং যাহারা হত বা আহত কিংবা অন্য কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সকলকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ করিবেন।

যাহা হউক, ১৯২০ সালের মাঝামাঝি ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এরূপ কোনও ব্যবস্থাবলম্বনের[১] উদ্যোগ ভারত গভর্ণমেন্টের নাই। গভর্ণমেন্টের মনোভাব ও আচরণ জনচক্ষে এরূপ ঠেকিয়াছিল যে, যে সকল অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে সেগুলিকে তাঁহারা প্রায় অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে সারা দেশের, এমন কি যাঁহারা গভর্ণমেন্ট ও নূতন শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন সেই সব মহলের মনোভাবও পাল্টাইয়া গেল। তদানীন্তন বড়লাট ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের গভর্ণমেন্ট যদি ১৯২০ সালে পাঞ্জাবের অত্যাচারের নায়কদিগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে খাঁটি 'সহযোগী' শ্রীযুক্ত গান্ধী যে অসহযোগিতার পথে চলিতে বাধ্য হইতেন না কিংবা ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বাতিল হইত না, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে, ১৯১৭-১৮ সালে ভারত সচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগু তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে সহানুভূতিসূচক ভাবভংগী ও আয়াস-

[১] পাঞ্জাবের অত্যাচারে অংশ গ্রহণকারী কর্মচারীদের বাঁচাইবার জন্য রাজকীয় আইন পরিষদে একটা দায়মুক্তি আইন পাস হইল। তাহা ছাড়া, পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, স্যার মাইকেল ও' ডায়ারকে স্পর্শ করা হইল না এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইনের শাসনের জন্য দায়ী জেনারেল ডায়ারকে শুধু মাত্র ভবিষ্যতে ভারতে চাকুরি করার অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত এই সামান্য ব্যবস্থাটুকুও হাউস অব লর্ডস অনুমোদন করেন নাই এবং পাঞ্জাবের শোকাবহ ঘটনার নায়কদিগের জন্য ইংলণ্ডে জনসাধারণের নিকট হইতে যে চাঁদা উঠিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব।

সিন্ধ কৌশলের সাহায্যে যে সহযোগিতার তরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহার সমাধি রচিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগে।

এই গোপন তথ্যটি কে না জানেন যে, নূতন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে যুক্ত স্মারকলিপি তৈয়ারী করার উদ্দেশ্যে যখন শ্রীযুক্ত মন্টেগু ও লর্ড চেমস-ফোর্ড ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি নূতন শাসনতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করার অনুকূলে জনসমর্থন লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে ভারত ত্যাগের পূর্বে শ্রীযুক্ত মন্টেগু যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী দলকে স্বপক্ষে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বিবেচনার জন্য ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে, তখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নেতৃত্বে মধ্যপন্থী কংগ্রেসীরা উহাতে অনুপস্থিত থাকেন: এবং, তাহার পর শীঘ্রই তাঁহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া অল-ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন, নূতন শাসন-সংস্কারকে কার্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহাদের দৃঢ়সংকল্প। ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে বিশেষ কংগ্রেসে যদিও ঘোষণা করা হয় যে, মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয় —তথাপি, ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে, উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের যে খসড়া তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাকে কার্যে পরিণত করা স্থির হয় এবং শ্রীযুক্ত মন্টেগুকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করা হয়। এইরূপে, ১৯১৯ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী সত্ত্বেও, শ্রীযুক্ত মন্টেগু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যে কংগ্রেসকে বিরোধিতার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন। কেবল পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের মনোভাবই প্রবাদের সেই 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'র মত বোধ হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালে একজন বৃটিশ রাজনীতিবিদ স্বভাবতঃই জানিতে চাহিবেন যে, ১৯২০ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী নীতির প্রতি সমর্থন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তখন মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে টানিবার জন্য কেন চেষ্টা করা হয় নাই। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মন্টেগু নিষ্ক্রিয় ছিলেন না এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভার উপর প্রভাব খাটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসুবিধা ছিল অনেক। মহাযুদ্ধ চলিবার সময়, সন্ধির সর্তাবলী আলোচনার সময় তুরস্কের প্রতি বৃটেনের নীতি কি হইবে, এই বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহাদের অস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী এক শান্তিমূলক বিবৃতি দিলেন, যাহাতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলিলেন যে, গ্রেট বৃটেন প্রতিহিংসামূলক নীতি অনুসরণ করিবে না এবং

যে সমুদ্ধ দেশ এশিয়া মাইনর ও থ্রেসে তুরস্কের প্রাধান্যই বেশী সেগুলি হইতে তুর্কীদিগকে বঞ্চিত করার কোনও ইচ্ছাই তাহার নাই। যাহা হউক, যুদ্ধের শেষে যখন ইহা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, তুরস্ককে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই মিত্রশক্তির লক্ষ্য তখন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তুর্কীদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ভারতীয় মুসলমানদিগের এক প্রতিনিধি দলকে ইউরোপে পাঠানো হইল। এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আলি; তিনি ভারত সচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগুর সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি, ভারতীয় মুসলমানগণ অনুভব করিতে সুরু করিলেন যে, তুরস্ক খুব সম্ভবতঃ আর স্বাধীন রাষ্ট্র থাকিবে না—ইসলাম ধর্মের গুরু খলিফা, যিনি তুরস্কের সুলতানও ছিলেন, তাঁহাকে ইউরোপ ও এশিয়ার রাজ্যগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইবে এবং ইসলামের তীর্থস্থানগুলি অমুসলমানদিগের হাতে চলিয়া যাইবে। এই অনিবার্য বিপদোপলব্ধিতে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখার মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষ যত গভীরই হউক না কেন, বিজয়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। অতএব, করণীয় যাহা তাঁহারা ভাবিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইল নূতন শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে বাধাদান করা।

১৯২০ সালের প্রায় মাঝামাঝি, ভারতের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব অধিকতর শক্তিশালী ছিল। শ্রীযুক্ত মন্টেগুর পক্ষে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু যদিও তিনি মুসলমানদিগকে খুশী করিতে তাঁহার চেষ্টায় কোনও ত্রুটিই রাখেন নাই এবং তাঁহাদের অভিযোগ[১]গুলি তুলিয়া ধরিবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে হয় তবুও তাঁহাদের কোনও গোষ্ঠীকেই তিনি স্বপক্ষে টানিতে পারেন নাই। মহাযুদ্ধের পূর্বে ঐস্লামিক জগতের ধর্মগুরু 'খলিফা' তুরস্কের সুলতান হিসাবে যে লৌকিক ক্ষমতা ভোগ করিতেন উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি নামে এক সংগঠন স্থাপন করেন। এই খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আলি ভ্রাতৃগণ—কনিষ্ঠ অথচ অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং জোষ্ঠ মৌলানা সৌকত আলি। তাঁহারা

---

[১] ১৯২২ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে এই বলিয়া চাপ দেন যে, সেভার চুক্তি সংশোধনের জন্য ভারতের দাবী প্রকাশ করিতে হইবে। ঐ দাবীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছিল এই—এশিয়া মাইনর ও থ্রেস তুর্কীদিগকে প্রত্যর্পণ; তীর্থস্থানগুলির উপর সুলতানের সার্বভৌমত্ব এবং মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ। শ্রীযুক্ত মন্টেগু মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ দাবী প্রচার করিবার জন্য মন্ত্রিসভা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন—কিন্তু মন্ত্রিসভা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

উভয়েই ছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। মৌলানা মহম্মদ আলি সাংবাদিকতা করিতেন, এবং ভারত গভর্ণমেন্টের আবগারী বিভাগের একজন উচ্চ-বেতনের কর্মচারী ছিলেন মৌলানা সৌকত আলি। যুদ্ধের সময় তুর্কীদিগের পক্ষ হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অন্তরীণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অন্তরীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠে উহাই তাঁহাদিগকে জনগণের চক্ষে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; এবং খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হইলে নেতৃত্বের গৌরব যে তাঁহাদের উপরেই অর্পিত হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। উপরন্তু, গোঁড়া মুসলমানগণ যেরূপ চাহিতেন, তাঁহাদের সেইরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা মুসলমান জনসাধারণের মনে তীব্র সাড়া জাগাইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার সহায়ক হইয়াছিল।

পাঞ্জাবের অত্যাচার ও তাহার পরিণামে, একদা রাজভক্ত শ্রীযুক্ত গান্ধী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে যিনি সহযোগিতার কথা বলিয়া কংগ্রেসকে স্বমতে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই ১৯২০ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন। ১৯১৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানকার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপায়কে কাজে লাগাইয়াছিলেন এবং উহাতে যথেষ্ট ফলও পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলাট আইন পাস হইবার পূর্বে তিনি ঐ আইনের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ'[১] আন্দোলন নামে একই ধরনের একটা আন্দোলন সুরু করেন—কিন্তু হিংসার উদ্ভব ঘটায় ঐ আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যাহা হউক, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একটি অহিংস বিদ্রোহ সংগঠনে আর একবার ঐ একই উপায়কে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। কৃচ্ছ্রতাসাধনের জীবনের জন্য তিনি দেহ ও মনকে তৈয়ারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। উপরন্তু, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার সঙ্গে ভক্ত অনুরাগীর একটা দল আসিয়াছে এবং ভারতে ছয় বৎসর অবস্থানকালে তাঁহার আদর্শের বহু সমর্থকও তিনি

[১] 'সত্যাগ্রহ' বলিতে প্রকৃত অর্থে বুঝায় 'সত্যে আগ্রহ'। অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, আইন অমান্য, গণপ্রতিরোধ—নানাভাবে ইহাকে বুঝানো হইয়াছে। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে এক জনসভায় এশিয়াটিক ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা প্রথম গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধীর মতে, সর্বপ্রকার হিংসার প্রয়োগ হইতে সত্যাগ্রহ বিরত থাকে এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতি করিবার সুদূরতম চিন্তাও উহার মধ্যে নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহার 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ'-র ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ সালের পূর্বে ভারতে তাঁহার পাঁচবার সত্যাগ্রহ লইয়া পরীক্ষা চালাইবার সুযোগ হইয়াছিল।

লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বন্ধু চাহিয়াছেন যাহাতে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও অধিকার করিতে সমর্থ হন। প্রায় এই সময়েই আলি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গ খিলাফৎ আন্দোলন সুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তাঁহারাও বন্ধু খুঁজিতেছিলেন। দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে তুরস্কের প্রশ্নটি গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহারা যত খুশী হইয়াছিলেন, তত খুশী তাঁহারা আর কিছুতে হইতে পারিতেন না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত গান্ধী ও আলি ভ্রাতৃগণের মধ্যে দুইটি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া একটা মৈত্রী সম্পাদিত হইল; যথা—পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ-এর অভিযোগ। আলি ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের অনুগামিবৃন্দ—নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি নামে তাঁহাদের পৃথক একটা দল থাকিলেও—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া পাঞ্জাব ও খিলাফৎ-এর অন্যায়ের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করিবেন; ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ অন্যায় ঘটিতে না পারে তাহার জন্য ঐ স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। অপর পক্ষে, দেশের খিলাফৎ সংগঠনগুলির প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উহার পূর্ণ সমর্থন জানাইবে এবং খিলাফৎ বা তুর্কী অভিযোগ[১]গুলির প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করিবে।

নূতন শাসনতন্ত্র -১৯১৯-এর গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট—অনুসারে আইন সভাগুলির নির্বাচন ১৯২০ সালের নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে স্থির হয়, এই শাসনতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করা হইবে কিন্তু ইতিমধ্যে জনমতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অতএব ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের সুপরিচিত নেতা লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, শাসনতন্ত্রের যে সংস্কার করা হইয়াছে উহাকে বাধাদানের তাঁহার এই নূতন নীতি কংগ্রেসের প্রভাবশালী এক গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত হইবে না। সেজনাই তিনি মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে মৈত্রী সম্পাদন করিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, কংগ্রেস তাঁহার অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিলে দেশে তাঁহার স্থান কোথায় হইবে এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন: তখন খিলাফৎ সংগঠনগুলির সমর্থন লাভ

[১] খলিফার (তুরস্কের সুলতানও বটেন) উদ্দেশ্যকে সাহায্যার্থ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত উহা বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য ১৯১৯ সালের নভেম্বরে শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচালনায় দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে লইয়া এক খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একজন প্রভাবশালী মুসলমান, মৌলানা হসরৎ মোহানী বৃটিশ পণ্য বর্জনের কথা বলেন; এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রস্তাব করেন গভর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগিতার। যাহা হউক, ১৯২০ সালেই খিলাফৎ আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে সুরু হয়।

করিয়া তিনি তাঁহার অভিযান সুরু করিতে পারিবেন। যাহা হউক, ঘটনার গতি ঐরূপ হইল না। মুসলমান নেতাগণ ছাড়াও, যুক্ত প্রদেশের নেতা ও এলাহাবাদের অগ্রগণ্য এডভোকেট পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে শ্রীযুক্ত গান্ধী শক্তিশালী মিত্র হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিকল্পনাকে বাধাদানে অগ্রণী হইয়াছিলেন বাঙলার নেতা ও কলিকাতার একজন প্রধান এডভোকেট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্তা বেসান্ত; তাঁহারা উভয়েই কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি—অনেক প্রদেশেই প্রভাবশালী সমর্থক তাঁহাদের ছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন পূর্বে লোকমান্য তিলক মারা যান। সম্ভবত তিনিই ছিলেন শ্রীযুক্ত গান্ধীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং তাঁহার মৃত্যুকালে ইহা জোর করিয়া বলা সম্ভব ছিল না যে, কলিকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিলে তিনি কি মনোভাব অবলম্বন করিতেন। অমৃতসর কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহযোগিতার প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতার নীতির একটা মাঝামাঝি ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক মনে করিতেন যে, সংবেদনশীল সহযোগিতার মতই একটি যথার্থ মনোভাব হওয়া উচিত। অন্য কথায় বলা যায়, কংগ্রেসের উচিত নূতন শাসনতন্ত্রে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও উপকারী তাহা গ্রহণ করিয়া কার্যে রূপ দেওয়া এবং যাহা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর তাহা বর্জন করা। লোকমান্য তিলকের ঘনিষ্ঠতম অনুগামিগণ তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বলিয়া আসিয়াছেন যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই মত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জনজীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী নামধারী দক্ষিণপন্থীদিগের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন, যাহাদের চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদীও বলা হইত। তিনি এক বিরাট পাণ্ডিত্যসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার সাহস ও ত্যাগ ছিল অপরিসীম। সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে ছয় বৎসর কারাজীবন যাপন করাব ফলে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যদি তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে অসুবিধায় পড়িতে হইত। যাহা হউক, লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত গান্ধীর পক্ষে বিনা বাধায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। তিনি প্রগতিমূলক অহিংস অসহযোগের নীতি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যাহার সুরু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব পরিত্যাগ এবং ত্রিবিধ বর্জনের (যথা—আইন সভা, আদালত আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন) মাধ্যমে চরম পরিণতি কর-বন্ধের দ্বারা। বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়; ২,৭২৮টি ভোটের মধ্যে তাঁহার স্বপক্ষে পড়ে ১,৮৫৫টি ভোট।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত

বিজয়রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের যথাবিধি যে বার্ষিক অধিবেশন বসে উহাতে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবটি বিবেচনার্থ উপস্থাপিত করা হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত আর একবার শক্তি পরীক্ষার আশায় শ্রীযুক্ত দাশ ও তাঁহার অনুগামিবৃন্দ নাগপুরে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী অবস্থাকে এরূপ কৌশলে আয়ত্তে আনেন যে তাঁহার ও শ্রীযুক্ত দাশের মধ্যে একটা বুঝাপড়া সম্ভব হয়। শ্রীযুক্ত দাশ প্রধানত যে আইন সভা বর্জনের বিরোধী ছিলেন তাহা আর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল না, কারণ ইতিমধ্যেই নির্বাচন হইয়া গিয়াছে; সেজন্যই তাঁহাকে বুঝাপড়ায় রাজী করানো সম্ভব হইয়াছিল। যখন ইহা সম্পাদিত হইয়া গেল তখন কার্যতঃ সর্বসম্মতিক্রমেই অসহযোগের প্রস্তাবটি স্বীকৃত হইল; যদিও পণ্ডিত মালব্য, শ্রীযুক্তা বেসান্ত, শ্রীযুক্ত জিন্না ও শ্রীযুক্ত পাল এই বুঝাপড়ার ব্যাপারে একটি অনমনীয় মনোভাব আঁকড়াইয়া থাকিলেন।

প্রগতিমূলক অসহযোগিতার প্রস্তাবটি, যাহার মধ্যে আইন সভা, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনও ছিল, স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নাগপুর অধিবেশনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য বলিয়া যাহা নির্দেশিত হইয়া আসিতেছিল তাহা হইল 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসন'। যে সকল কংগ্রেসীরা বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদে বিশ্বাস করিতেন কিংবা সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে স্বীকার করিতেন না তাঁহারা সকলেই উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। বামপন্থীদিগকে কংগ্রেসের আওতায় ফিরাইয়া লওয়ার জন্য 'স্বরাজকে' (যাহা প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন) কংগ্রেসের লক্ষ্য ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীকে তাঁহার নিজের ধারণা অনুযায়ী—'স্বরাজকে' ব্যাখ্যা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত গান্ধী 'স্বরাজের' অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 'সম্ভব হইলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া—আর আবশ্যক হইলে, বাহিরে চলিয়া আসিয়া স্বায়ত্তশাসন।'

নাগপুর অধিবেশনের পূর্বে কংগ্রেসের সংগঠন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। বড় বড় শহরেই শুধু উহার শাখা ছিল এবং সারা বছর ধরিয়া প্রণালীসম্মত ব্যবস্থানুসারে কোনও কাজ হইত না। নাগপুরে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত হইল। একেবারে ক্ষুদ্রতম শাখা হইবে গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটি। এরূপ কয়েকটি কমিটি লইয়া গঠিত হইবে ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি। তাহার পর একের পর এক গঠিত হইবে—মহকুমা (তালুক বা তহশীলও বলা হয়), জেলা, প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি প্রায় ৩৫০ জন সদস্যের একটি সম্মেলন হইবে

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি ১৫ জন সদস্যের একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি নির্বাচন করিবে, উহা হইবে সমগ্র দেশের জন্য কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ। অধিকন্তু, প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হইল। যথা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে তেলেগু-ভাষী অন্ধ্র ও তামিল-ভাষী তামিলনাদ, এইরূপে ভাগ করা হইল। কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় ধরনের। নূতন গঠনতন্ত্র রচনা করা ছাড়াও, নাগপুর কংগ্রেস পরবর্তী বছরের জন্য কাজের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করিয়া দিল।

স্বরাজ লাভের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত উপায় সম্বন্ধে গঠনতন্ত্রে একটি পরিবর্তন সাধন করা হইল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস 'নিয়মতান্ত্রিক' উপায়ের মধ্যে আবন্ধ ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে উহা 'সকল শান্তিপূর্ণ ও বৈধ' উপায় গ্রহণ করিতে পারিবে। এই পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল এই কারণে যে, কংগ্রেস যাহাতে অসহযোগের পথ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, যাহা অবৈধ বলিয়া মনে করা হইতে পারে। পন্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্ত জিন্নার মত দক্ষিণ-পন্থিগণের এবং ১৯২০ সালে প্রথম যে তরুণ বামপন্থীদের প্রাধান্য কংগ্রেসে বিস্তৃত হয় তাঁহাদের নিকট, লক্ষ্য ও উপায় উভয়টি সম্বন্ধেই নাগপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত একটি সুবর্ণ সুযোগের মত বোধ হইয়াছিল। শেষোক্তগণ চাহিয়াছিলেন, সম্ভাব্য সকল উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য হউক। সে যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিপুল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার দ্বারাই বামপন্থীদিগকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইয়াছিল। নাগপুরে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং যাহা আজও বহাল আছে, উহা কার্যতঃ তাঁহার নিজের খসড়া ছিল। এক বৎসর পূর্বে, অমৃতসরে কংগ্রেস কর্তৃক ঐ সংগঠনের চালু গঠন-তন্ত্রকে সংশোধনের অধিকার তিনি প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ছিল হাতে সুতা কাটা ও তাঁত-শিল্পের পুনঃ প্রচলন, হিন্দুদিগের মধ্যে অস্পৃশ্যতা[১] দূরীকরণ এবং স্বর্গত লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতে এক কোটি টাকার একটা ভান্ডার গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। (কুটির-শিল্প হিসাবে বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য আগেকার দিনের চরকার ব্যবহার ফিরাইয়া আনিবার চিন্তা এক বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত গান্ধীর মাথায় আসিয়াছিল।) উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় কিংবা কল্যাণমূলক হইলেও, আর একটি প্রস্তাবকে অবশ্যই অতীব ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সিদ্ধান্তটি হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৃটেনের শাখা তুলিয়া দেওয়া এবং ইহার মুখপত্র 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ

[১] ইহা পরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

করা। এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার ফলে, ভারতের বাহিরে কংগ্রেসের একমাত্র যে প্রচারকেন্দ্র ছিল উহা বন্ধ হইয়া গেল।

কলিকাতা কংগ্রেসের মত, নাগপুর কংগ্রেসও ছিল শ্রীযুক্ত গান্ধীর পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য। তাঁহার গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীই সেখানে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ সহস্র লোক কংগ্রেসে যোগদান করে; এরূপ জনসমাগম আর কখনও হয় নাই। জনগণের উৎসাহ ছিল অসীম এবং বিশিষ্ট অতিথিদিগের মধ্যে ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের দুইজন সদস্য শ্রীযুক্ত বেন স্পুর ও কর্নেল ওয়েজউড। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে নাগপুর কংগ্রেস একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে চরমপন্থীদের পূর্ণ জয় না হইলেও মধ্যপন্থীদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে দেখা যাইবে, শেষোক্তগণের মতে কংগ্রেসকে পুনরায় ফিরাইয়া আনার পূর্বে তাঁহাদের বহু বছর ধরিয়া কাজ করিতে হইয়াছে।

বস্তুগত দিক হইতে বিচার করিলে, শ্রীযুক্ত গান্ধী কংগ্রেস ও দেশের সম্মুখে যে পরিকল্পনা রাখিয়াছিলেন, উহা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একেবারে নূতন কিছু ছিল না। ১৯০৫ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙ্গলাকে ভাগ করিলে উহার প্রতিবাদে ঐ প্রদেশের অধিবাসিগণ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালাইয়াছিল, ১৯২০ সালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম সুরু হয় তাহার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে মিল ছিল। ১৯০৫ সালে বাঙ্গলা বৃটিশ পণ্য ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিল্পের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল; এবং সর্বপ্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত জাতীয় স্কুল ও কলেজসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। উপরন্তু, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের মত নেতাগণ বৃটিশ আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এই যুক্তিতে যে, তাঁহারা উহার আইনগত অধিকারকে মানিয়া লইতে সম্মত নহেন। তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরমপন্থী দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই নীতিকে আয়র্ল্যান্ডের সিন ফিন দলের নীতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কয়েক দশক পূর্বে, দেশ আর একটি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছে; উহাকেও শ্রীযুক্ত গান্ধীর অসহযোগের পূর্বাভাষরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক প্রণালীতে নীল উৎপাদন করিতে শিখিবার পূর্বে, বাঙ্গলাদেশ প্রধানতঃ নীল সরবরাহ করিত। তখনকার দিনে এই নীল চাষের মালিক ছিল বৃটিশেরা, এবং এই বিদেশী মালিকগণ অত্যাচারী ছিল এবং প্রজাদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার ছিল বর্বরোচিত। যখন তাহাদের বর্বরতা অসহ্য হইয়া উঠিল তখন যশোহর ও নদীয়ায় প্রজাগণ বিদ্রোহ করিল। তাহারা কর দিতে অস্বীকার করিল, নীল চাষ বন্ধ করিয়া দিল এবং বৃটিশ

মালিকদিগের পক্ষে সেখানে বাস করা ও ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে শাসন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। (সুপরিচিত বাঙ্গালী লেখক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' পুস্তকে এই সকল ঘটনার একটি স্পষ্ট চিত্র দেখা যাইতে পারে।) এইরূপে গভর্নমেন্টকে কোথাও তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিতে দেখিলে নিজেরাই সচেষ্ট হইয়া অত্যাচার হইতে রেহাই পাইতে লোকে ইতিমধ্যে শিখিয়া ফেলিয়াছিল।

সকলেই ভাল করিয়া অবগত আছেন যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহার প্রথম জীবনে যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও লিও টলস্টয়ের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহার চিন্তাসমূহ যে একেবারে মৌলিক কিংবা তাঁহার কর্মসাধনা অভিনব তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার যথার্থ গুণ ছিল দ্বিবিধ। খৃষ্টের উপদেশ এবং টলস্টয় ও থোরোর ভাবধারা তিনি বাস্তব কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে, হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা সম্ভব। প্রথমতঃ, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য নহে, বরং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তিনি 'অসহ-যোগকে' কাজে লাগাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে কোনও বিদেশী গভর্নমেন্টের অসামরিক শাসনব্যবস্থাকে অচল করিয়া দিয়া নতি স্বীকার করানো সম্ভব, ইহা প্রায় প্রমাণ করিয়াছেন। অনুকূল বহু ঘটনার যোগাযোগ ১৯২০ সালে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় যে বিপ্লবের চেষ্টা হইয়াছিল উহা সফল হয় নাই এবং বিপ্লবী দলকে একেবারে ধ্বংস করা হয়। কাজেই ১৯২০ সালে অপর একটি বিপ্লব ঘটিবার আর কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তথাপি, দেশ কংগ্রেসের দিক হইতে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ একটা নীতি চাহিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন ঐরূপ একটি আন্দোলনই ছিল একমাত্র বিকল্প পন্থা। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতা কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধীর একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া গেলেন। তৃতীয়তঃ, দীর্ঘ ও সযত্ন সাধনার ফলে, শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তপস্বীর কঠোর শৃঙ্খলার ভিত্তিতে কৃচ্ছ্রতাসাধনের জীবনের জন্য তিনি নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার শিক্ষানবিশির সময়—১৯১৪ হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে তাঁহার চারি পার্শ্বে বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল অনুগামী লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, 'সত্যাগ্রহের' অস্ত্র প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন যদিও ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে, তবুও দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। উপরন্তু, ১৯১৯ সালের

পূর্বে ভারতে পাঁচবার সত্যাগ্রহকে খুবই সাফল্যের সহিত কাজে লাগাইবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহাকে ঘিরিয়া ঋষিতুল্য একটা জ্যোতির্মণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল; যে দেশে লোকে ধনকুবের বা শাসক অপেক্ষা সাধুকেই অধিক ভক্তি করিয়া থাকে সে দেশে ইহার মূল্য ছিল তাঁহার কাছে অপরিমেয়।

নাগপুরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সত্ত্বেও, শ্রীযুক্ত গান্ধী কার্যতঃ কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক হইয়া উঠেন। অধিকন্তু, জনগণ, তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহাত্মা (যাহার প্রকৃত অর্থ মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি বা সাধু) আখ্যায় অভিহিত করেন। তাঁহাকে দিবার মত উহাই ছিল ভারতবাসীর সর্বোচ্চ সম্মান।

সারা ১৯১৯ সাল ধরিয়া ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বজ্রবিদ্যুতের উন্মত্ত আক্রোশ চলিল—কিন্তু ঐ বছরের শেষের দিকে মেঘ কাটিয়া গেল; এবং মনে হইল অমৃতসর কংগ্রেস স্থৈর্য ও শান্তির একটা যুগের ঘোষণা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথচ অমৃতসরের প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করা হইল না। আরও একবার মেঘ জমিতে শুরু করিল এবং ১৯২০ সালের শেষের দিকে আকাশ অন্ধকার ও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল ঝড় ও ঘূর্ণিঝঞ্ঝা এবং এই ঘূর্ণিঝঞ্ঝার সওয়ার হইয়া ঝড়কে পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তিটি ভাগ্য কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি হইলেন মহাত্মা গান্ধী।

২

ঝড় শুরু (১৯২১)

কংগ্রেস হইতে মধ্যপন্থিগণ সরিয়া যাওয়ার ফলে ঐ সংগঠনের জ্ঞানগত আদর্শের কিছুটা পতন হয়। কিন্তু আপামর জনসাধারণ কংগ্রেসের পতাকা-তলে সমবেত হওয়ায় ইহার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয়। এতদ্ভিন্ন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মিরূপে এমন কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেসসেবীকে লাভ করেন, যাঁহারা দেশে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং এখন কংগ্রেসের কার্যে তাঁহাদের সময় পুরাপুরিভাবে দিবার জন্য তাঁহাদের পেশাগত কাজকর্ম ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার আইনজীবী শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ[১]—যিনি ইতিমধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজোচিত আয় ছাড়িয়া দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এলাহাবাদ হইতে আসিলেন তথাকার আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু; তিনিও তাঁহার পেশা-ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁহার পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—পেশার দিক হইতে তিনিও আইনজীবী ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং যে বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, ইহা ভাগ্য কর্তৃক নির্দিষ্টই ছিল। পাঞ্জাব হইতে ঐ প্রদেশের মুকুটহীন সম্রাট লালা লাজপৎ রায় মহাত্মার সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন—তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে ছিলেন একজন আইনজ্ঞ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে মহাত্মাকে সমর্থন জানাইলেন প্যাটেল ভ্রাতৃগণ, শ্রীযুক্ত বীঠলভাই ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই, পেশাগতভাবে তাঁহারা উভয়েই এড-ভোকেট ছিলেন; এবং মহারাষ্ট্রে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল) স্বর্গতঃ লোকমান্য তিলকের উত্তরাধিকারী পুণার শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকার। মধ্যপ্রদেশের যে সকল নেতা মহাত্মার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ মুঞ্জে ও আইনজীবী শ্রীযুক্ত অভয়ঙ্কর। বিহারের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ; তিনি কংগ্রেসের কাজ করিবার জন্য পাটনায় আইন ব্যবসায়ের মোটা আয় ও অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ বৃত্তি ত্যাগ করেন। মাদ্রাজ

---

[১] সেই সময়ে শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশের জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে, লোকে তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়াছিল—যাহাকে ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া বলা হয় 'ফ্রেন্ড অব দি কান্ট্রি'।

প্রেসিডেন্সীর তামিল-ভাষী অঞ্চল হইতে আসিলেন শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী; শ্রীযুক্ত এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি; এবং তেলেগু-ভাষী অঞ্চল হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশম—ইঁহাদের সকলেই আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ও ছিলেন—মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকৎ আলি, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিতদিগের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং দিল্লীর ডাঃ আন্সারী—ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যে নব-চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল, ইঁহাদের সকলেই ছিলেন তাহার প্রতিভূ। এইরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অভিযানের গোড়ার দিকে খুব ভাল একটি দল গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন।

কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া দিয়া যাঁহারা তাঁহাদের পেশা ত্যাগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আইন ব্যবসায়িগণের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রধান। সারা ভারতের আইনব্যবসায়ী সমাজে যাঁহারা ততটা প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন না তাঁহারা দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় আইনজীবিগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করায় কংগ্রেসের পদগুলি এমন বহু সংখ্যক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কর্মীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে, যাঁহারা পুরাপুরিভাবে ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আদালত বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আবেদনে বিশেষ কাজ হইয়াছিল। যখন আইনজীবিগণ বিপুল সংখ্যায় তাঁহাদের পেশা চিরকালের মত ছাড়িয়া দেন তখন অন্যদিকে, মোকদ্দমাকারিগণ যাহাতে বৃটিশ আদালতে না গিয়া সালিশীর দ্বারা তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া লন সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচণ্ড এক অভিযান চালানো হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সারা দেশ জুড়িয়া কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে বহু সালিশী-বোর্ডের সৃষ্টি হয় এবং ইহাদের চেষ্টায় মোকদ্দমা হইতে গভর্নমেন্টের রাজস্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। আদালত বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সংযম গড়িয়া তোলা ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এক অভিযান শুরু হয়। সারা ভারতে এই অভিযানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং বহু প্রদেশে আবগারী শুল্ক (অর্থাৎ, মদ ও অন্যান্য মদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়) পূর্বে যাহা ছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও প্রদেশে, যেমন বিহারে, রাজস্ব বৃদ্ধির আশায় মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য গভর্নমেন্ট এক অভিযান চালাইতে বাধ্য হন।

এই সংযম আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, এবং উহার ফলে গভর্নমেন্ট বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য অভিযান চলে। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণে ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতির ন্যায় কোনও কোনও সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করা হইত। অর্থাৎ, অন্য

সকল জাত তাহাদের সঙ্গে খাইবে না, তাহারা পরিবেশন করিলে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিবে না এবং, কোথাও কোথাও তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবে না। ভারতবাসীর সংহতির বিরুদ্ধে এই প্রথাটি কাজ করিয়াছে এবং নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা একেবারেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। সেজন্য ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, কংগ্রেস যখন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অভিযান সুরু করা স্থির করিল তখন জনসাধারণকে সকল প্রকার সামাজিক দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতেও ইহা চেষ্টা করিবে।

জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দিক হইতে আংশিকভাবে স্বস্তি দিবার জন্য কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও অধিকতর চরকা ও তাঁতশিল্পের পুনঃপ্রচলনের কথা বলিল। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের চিন্তা নূতন ছিল না—কারণ ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে বাঙ্গলায় বৃটিশ বস্ত্র বর্জনের রব প্রথমে উত্থিত হয়। তাঁতশিল্পের পুনঃপ্রচলনও নূতন কোনও প্রস্তাব ছিল না, কারণ বিদেশী ও ভারতীয় মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত তাঁতশিল্প নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু যে চরকার ব্যবহার কার্যতঃ লোপ পাইয়াছিল উহাকে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা ছিল অভিনব ও দুঃসাহসিক। অন্য সকলকে সূতা-কাটা শিখাইবার জন্য পুরুষ কিংবা নারী পাওয়া প্রথমে সহজ ছিল না। মহাত্মা নিজে ভাল সূতা কাটিতে পারিতেন; তিনি পুরুষ ও নারীর এক একটি দলকে তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করিলেন, যাহারা নিজেরা সূতা কাটিতে ও উহা শিখাইতে পারিবে। অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশে—সুদূরতম গ্রামগুলিতেও সূতা কাটিতে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য হাজার হাজার নরনারীকে পাঠানো হইল। চরকা সংগ্রহ বা ক্রয় করাও প্রথমে কঠিন ছিল। গ্রামের সূত্রধরগণ পুনরায় চরকা প্রস্তুত করিতে না শেখা পর্যন্ত শহরে তৈয়ারী করিয়া গ্রামে পাঠানো হইত। হাতে-কাটা সূতায় হস্তচালিত তাঁতেবোনা কাপড়কে বলা হইত 'খাদি' বা 'খদ্দর' এবং উহা মিলের কাপড় অপেক্ষা মোটা ছিল। এই কাপড়ের উৎপাদন যতই বাড়িতে লাগিল ততই ইহা আপনা হইতেই ভারতের সকল কংগ্রেসসেবীর পোষাক হইয়া উঠিল। মিলে তৈয়ারী মিহি কাপড় ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় মোটা 'খাদি' পরিধান করিয়া জনগণের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল।

উপরোক্ত কাজ চালাইবার জন্য অর্থ ও লোকবল দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মহাত্মা কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য এবং এক কোটি টাকার (১৩½ টাকায় মোটামুটি হিসাবে এক পাউন্ড) একটি ভাণ্ডারের জন্য জাতির নিকটে আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহা অত্যন্ত উৎসাহজনক হইলেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ ও সদস্য করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল এক দল কর্মীর। ছাত্র সম্প্রদায় হইতে এই কর্মীর দল পাওয়া

সম্ভব ছিল এবং সেজন্য ১৯২১ সাল সুরু হইল স্কুল ও কলেজ বর্জনের ব্যাপক এক অভিযানের মধ্য দিয়া। ছাত্রগণ বিপুল সংখ্যায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল এবং যে বাঙ্গলার যুবকদিগের চেতনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিরাট ত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল সেখানে উহা ছিল সর্বাধিক। এই সকল ছাত্র কর্মীরাই দেশের প্রতি প্রান্তে কংগ্রেসের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহারাই চাঁদা তুলিয়াছে, সদস্য বাড়াইয়াছে, সভা ও আন্দোলন করিয়াছে, সংযমের কথা বলিয়া বেড়াইয়াছে, সালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সুতাকাটা ও বস্ত্র বুনা শিখাইয়া কুটিরশিল্পের পুনঃপ্রচলনে উৎসাহ যোগাইয়াছে। তাহারা না থাকিলে মহাত্মা গান্ধীর এত প্রভাবও দেশকে বেশী দূর আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিত না।

১৯২১ সালে ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসার নীতির যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু ১৯২০-২১ সালে দেশের পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইয়া উঠিবে যে, কংগ্রেসকে উহার প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিতে হইলে এই ব্যাপারে গত্যন্তর ছিল না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও কংগ্রেস প্রথমে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করে নাই, পরে সারা দেশ জুড়িয়া এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান সুরু করা হয়। যে সকল ছাত্র অসহযোগিতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া সরকারী বা সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অথচ অধিকতর সুস্থ পরিবেশে যাহাদের পড়াশুনা চালাইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহাদের পক্ষে এই নব-স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়া পড়াশুনা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা (বোম্বাই প্রেসিডেন্সী), নাগপুর (মধ্য-প্রদেশ), বারাণসী (যুক্ত প্রদেশ), পাটনা (বিহার), কলিকাতা ও ঢাকায় (বাঙ্গলা) এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলির কোনও কোনওটিতে সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং অন্যগুলি ছিল কারিগরী বা ডাক্তারী শিক্ষার জন্য—তবে উহাদের সবগুলিতেই সুতা-কাটা বাধ্যতামূলক ছিল। অনেক স্থানে মেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি এখনও আছে এবং উহাদের কোনও কোনওটির অবস্থার বেশ উন্নতি হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, সারা ভারতে আপনা হইতেই আর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এগুলিকে বলা হইত 'আশ্রম'। প্রাচীনকালের আশ্রমের আদর্শে গঠিত এগুলি ছিল সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীদিগের আশ্রয়। নূতন যাহারা আসিত তাহাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়াও হইত এবং প্রায়শঃই ঐ একই বাড়ীতে কংগ্রেসের স্থানীয় অফিস থাকিত। সুতা-কাটা ও তাঁত বোনার কেন্দ্র হিসাবেও এই আশ্রমগুলি কখনও কখনও কাজ করিত। যাহারা সুতা কাটিত ও তাঁত

বুনিত তাহাদিগকে এই সকল কেন্দ্র হইতে কাঁচা মাল হিসাবে তুলা ও পাকানো সুতা সরবরাহ করিয়া যথাক্রমে পাকানো সুতা ও কাপড় পাওয়া যাইত। অনেক আশ্রমে কংগ্রেসকর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার ও লাইব্রেরীও থাকিত।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে গৃহীত প্রগতিমূলক অসহযোগের কর্মসূচীতে ত্রিবিধ বর্জন ছাড়াও গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ—এবং সরকারী সমস্ত চাকুরী হইতে পদত্যাগের বিষয়টিও ছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক তাঁহাদের উপাধি ত্যাগ করেন কিন্তু চাকুরী হইতে যাঁহারা পদত্যাগ করেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং আমি নিজে ছিলাম ইঁহাদের একজন। ১৯২০ সালে ইংলন্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমি উত্তীর্ণ হই, কিন্তু একই সঙ্গে দুইজন মনিবের—অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও স্বদেশের সেবা করা অসম্ভব দেখিয়া ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করিয়া, যে জাতীয় সংগ্রাম তখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, উহাতে যোগদান করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরিয়া আসি। ১৬ই জুলাই তারিখে আমি বোম্বাইয়ে পেঁাছাই এবং সেইদিন বিকালেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎপ্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল, যে আন্দোলনে আমি যোগ দিতে যাইতেছি উহার নেতার নিকট হইতে তাঁহার কর্মসূচী সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিপ্লবী নেতৃবর্গ যে সকল পদ্ধতি ও কৌশলকে কাজে লাগাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি গত কয়েক বৎসর কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলাম, এবং ঐ জ্ঞানের আলোকেই আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্যকে বুঝিতে চাহিয়াছিলাম।

সেইদিন বিকালের দৃশ্যটি আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। বোম্বাইয়ে মহাত্মা সচরাচর মণিভবনে বাস করিতেন; সেখানে পেঁাছিলে আমাকে ভারতীয় কার্পেটে মোড়া একটা ঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। প্রায় মধ্যস্থলে দরজার দিকে মুখ করিয়া মহাত্মা তাঁহার ঘনিষ্ঠতম অনুগামীদের কয়েক জন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া ছিলেন; সকলের পরনে গৃহে-তৈয়ারী খাদি। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমার বিদেশী পোষাকের জন্য নিজেকে কিছুটা বেমানান বোধ হইল, এবং ইহার জন্য ক্ষমা না চাহিয়া পারিলাম না। যে প্রাণ-খোলা হাসি মহাত্মার বৈশিষ্ট্য ছিল উহার দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি শীঘ্রই আমার অবস্থা সহজ করিয়া দিলেন এবং অবিলম্বে আলোচনা সুরু হইল। তাঁহার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি—পর পর ধাপগুলি—যাহা ক্রমে ক্রমে বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সাহায্য করিবে, ঐ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে আমি একের পর এক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, এবং মহাত্মা তাঁহার

অভ্যাসগত ধৈর্যের সহিত উত্তর দিলেন। তিনটি বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ কিরূপে অভিযানের শেষ ধাপ অর্থাৎ কর-বন্ধে পরিণত হইবে? দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র কর-বন্ধ কিংবা আইন অমান্যের দ্বারাই কিরূপে গভর্ণমেন্টকে আমাদের স্বাধীনতা দিয়া এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা সম্ভব? তৃতীয়তঃ, এক বৎসরের মধ্যেই 'স্বরাজের' (অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন) প্রতিশ্রুতি মহাত্মা কিরূপে দিতে পারেন—নাগপুর কংগ্রেস হইতেই যেরূপ তিনি দিয়া আসিতেছিলেন? প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁহার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার জন্য তাঁহার আবেদনে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ—অর্থাৎ, বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং হাতে-কাঁটা খাদির প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন। পরবর্তী কয়েক মাসে তাঁহার চেষ্টা নিবদ্ধ হইবে খাদি অভিযানে: এবং, তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ গঠনাত্মক কাজকর্মাদি সফল হইতে চলিয়াছে, ইহা গভর্নমেন্ট যে মুহূর্তে বুঝিবেন তৎক্ষণাৎ উহাকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিবেন। যখন গভর্ণমেন্ট এরূপ করিবেন তখন সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণের সময় উপস্থিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই জেলগুলি এরূপ ভর্তি হইয়া যাইবে যে সেগুলিতে আর স্থান থাকিবে না, এবং তখনই আসিবে আন্দোলনের শেষ পর্যায়—অর্থাৎ, কর-বন্ধ।

অন্য দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মার উত্তরে সন্দেহের নিরসন হইল না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আশা করেন কিনা যে এই বর্জন আন্দোলন ল্যাংকাশায়ারে এত বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করিবে যে ভারতের সহিত আপোষকে কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভাকে চাপ দেওয়া হইবে। কিন্তু মহাত্মা আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, তিনি মনে করেন না যে, ঐ উপায়ে গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হইবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কি চাহিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হয় তিনি যথাসময়ের পূর্বেই তাঁহার সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই নতুবা কি কৌশলের দ্বারা গভর্ণমেন্টের কর্তাদিগকে বাধ্য[১] করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁহার উত্তর ছিল নৈরাশ্যজনক এবং তৃতীয়টির উত্তর তদপেক্ষা ভাল কিছু ছিল না। যাহা ছিল তাঁহার নিকট একটি বিশ্বাসের প্রশ্ন—যথা, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা যাইবে—তাহা কোনও প্রকারেই

[১] আজ ঐ ঘটনাটির দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইলে আমার মনে হয় যে, মহাত্মা সম্ভবতঃ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 'হৃদয়ের পরিবর্তন' আশা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা ভারতের জাতীয় দাবীগুলি মানিয়া লইবেন।

আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না; এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও দীর্ঘ সময় কাজ করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। যাহা হউক, এক ঘণ্টার আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে যদিও আমি নিজকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, আমার দিক হইতে নিশ্চয়ই বুদ্ধির কোনও অভাব ঘটিয়াছে, তবু বারে বারেই যুক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মহাত্মা যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন উহার মধ্যে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে এবং যে আন্দোলনের দ্বারা ভারত তাহার অভীপ্সিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছিবে উহার একের পর এক ধাপগুলি সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই।

যেরূপ নিরুৎসাহ ও হতাশ হইয়াছিলাম তাহাতে আমার কি করণীয় ছিল? কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ হইতে ইতিমধ্যেই তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগ করিয়াছি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ইংলন্ডে থাকিতেই এরূপ কাহিনী আমরা শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আইন ব্যবসায়ে তাঁহার রাজোচিত স্থান ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জাতিকে দান করিয়া রাজনৈতিক কার্যে সর্বসময় নিয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের ফলে আমার মন যেরূপ দমিয়া গিয়াছিল, এই মহৎ লোকটির সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে উহা অংশতঃ দূরীভূত হইল এবং যে উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছিলাম ঠিক সেই উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়াই আমি বোম্বাই ত্যাগ করিলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোজা দেশবন্ধু দাশের গৃহে উপস্থিত হইলাম। আরও একবার হতাশ না হইয়া পারিলাম না। তিনি বাঙলার সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। যখন শুনিলাম তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন আবার গেলাম। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী গভীর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন—তাঁহার সেই সুঠাম চেহারার ছবিটি এখনও আমার মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তিনি এখন সেই শ্রীযুক্ত দাশ ছিলেন না, যাঁহার কাছে উপদেশ লইবার জন্য আমি একবার গিয়াছিলাম; তখন তিনি ছিলেন কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদিগের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম এবং আমি রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত একজন ছাত্র। তিনি এখন আর সেই শ্রীযুক্ত দাশ নহেন যিনি দিনে হাজার হাজার টাকা রোজগার করিতেছেন এবং ঘণ্টায় হাজার

হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। যদিও তাঁহার বাড়ীটি আর প্রাসাদোপম ছিল না, তিনি কিন্তু সেই শ্রীযুক্ত দাশই ছিলেন যিনি সর্বদা যুবকদিগের বন্ধুরূপে তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে ও দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন। আমাদের কথোপকথনের সময় আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, তিনি এমন একজন লোক যিনি জানেন তাঁহার লক্ষ্য কি—যিনি তাঁহার সর্বস্ব দান করিতে পারেন এবং আর সকলের নিকট তাহাদের দেয় সব কিছু দাবী করিতে পারেন—তিনি এমন একজন লোক যাঁহার নিকট যৌবন অবাঞ্ছিত নয় বরং একটি সম্পদ। আমাদের আলোচনা যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন আমার মন তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইল, নেতা খুঁজিয়া পাইয়াছি এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

কলিকাতায় থাকিয়া যাওয়ার পর দেশের, বিশেষতঃ বাঙলা দেশের পরিস্থিতির একটা পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলাম। সারা দেশে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। 'ত্রিবিধ বর্জন' মোটামুটি সফল হইয়াছিল। যদিও আইন সভাগুলি শূন্য ছিল না, তথাপি কোন কংগ্রেসসেবী সেখানে প্রবেশ করেন নাই। মোটের উপর আইন ব্যবসায়িগণের উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। এবং ছাত্রসমাজ সাফল্যের[১] সহিত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কংগ্রেসের সদস্য ও তহবিলের জন্য আবেদনে সুফল পাওয়া গিয়াছিল, এবং অবস্থার গতিতে খুবই উৎসাহিত হইয়া মহাত্মা বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও চরকা ও তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য জুলাই মাসে এক আন্দোলন সুরু করিলেন। ১৯২১ সালের ১লা আগস্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবার্ষিকীতে সারা দেশ জুড়িয়া বিদেশী বস্ত্রের বিরাট বহ্ন্যুৎসব চলিল। এই সকল বহ্ন্যুৎসবের একটা রূপকার্থও কংগ্রেস নেতাগণ দিলেন—যথা, দেশে যে সব মালিন্য, কলুষতা ও দুর্বলতা আছে, ঐ সব কিছুকে ভস্মীভূত করা। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বান্তরিক সমর্থন ও অসহযোগের অভিনব উপায় আন্দোলনে আরও অধিক শক্তি সঞ্চার করিল এবং 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজের' ধ্বনিতে এমন বহু লোক আগাইয়া আসিলেন, যাঁহারা দীর্ঘকাল নির্যাতনের সম্ভাবনায় ভয় পাইতেন।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল বাঙলায়- আসাম-বাঙলা রেল ধর্মঘট ও মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। রেল ধর্মঘট পূর্ববঙ্গ ও আসামে সমস্ত রেল ও স্টীমার চলাচল একেবারে অচল করিয়া দিয়াছিল। বাঙলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে এই ধর্মঘট পরিচালিত হয় এবং প্রথম দিকে ইহা এরূপ সফল হইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে

[১] জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মদ্য ও ঐ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধের জন্য প্রচারের ভার তুলিয়া লইয়াছিল।

দেশবাসীর সঙ্ঘবন্ধ শক্তির দ্বারাই যে শুধু তাহা সম্ভব, ঐ সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিলেন। উপযুক্ত সময়ে মিটমাট না করিয়া লওয়ায় অনেকদিন ধরিয়া এই ধর্মঘট চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যয়ের মধ্যে উহা থামিয়া যায়। এই ধর্মঘটের সূত্রেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রথম জনচক্ষে বিশিষ্ট হইয়া উঠেন। গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাটি ছিল মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। ১৯১৯ সালে বাঙ্গলার গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য স্যার এস. পি. সিংহের (পরে লর্ড সিংহ) চেষ্টায় একটি আইন পাস হইয়াছিল, যাহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা চালু করা—যদ্দ্বারা প্রদেশে কতগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ন-বোর্ড গঠিত হইবে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে এই ব্যবস্থার যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছিল—প্রথমতঃ, যে ক্ষমতা গ্রামবাসিগণকে দেওয়ার কথা তাহা জেলার কর্তাদিগের হাতেই ছিল (যথা, গ্রামের চৌকিদারগণকে নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা) এবং দ্বিতীয়তঃ, ইউনিয়ন-বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে অতিরিক্ত কর চাপিয়াছিল, যাহার বিনিময়ে কোনও সুবিধা পাওয়া যায় নাই। আইনে এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যে কোনও জেলায় ইহা চালু করিতে কিংবা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন। এডভোকেট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী তাঁহাদের জেলা হইতে এই আইন প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য এক আন্দোলন সুরু করিলেন, এবং তাঁহাদের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য নব-গঠিত ইউনিয়ন-বোর্ডগুলির ধার্য কর দিতে অস্বীকার করিলেন। সচরাচর যেরূপ করা হইয়া থাকে, ঐ জেলায় এই নূতন আইনকে জোর করিয়া চালাইবার জন্য দমনমূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত হইল। বলপূর্বক সম্পত্তি ক্রোককরণ, হয়রানি ও গ্রামবাসিগণের বিচার, সামরিক পুলিস ও সৈন্যগণ কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শন—সব কিছুই চেষ্টা করিয়া দেখা হইল কিন্তু কোনও ফল হইল না। সারা ১৯২১ সাল ধরিয়া অত্যাচারের তাণ্ডব চলিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে এই আইন প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইল। এই কর-বন্ধ আন্দোলনের সাফল্য মেদিনীপুরের জনসাধারণকে যথেষ্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে জনপ্রিয়তা আনিয়া দিল।

এখানে আমাদের কাহিনী হইতে সরিয়া গিয়া ১৯২১ সালে কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড মহাত্মা গান্ধীকে আমল দেন নাই। জানুয়ারীতে বর্তমান রাজার খুল্লতাত, কনটের ডিউক নূতন আইন সভাগুলির উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁহার এই ভ্রমণকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করে এবং ডিউক যেখানেই গিয়াছিলেন সেখানেই এই বর্জনের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই বিক্ষোভে ভারত গভর্নমেন্ট বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের উদাসীন

নিরপেক্ষ মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে সুরু করিল। এপ্রিলে লর্ড চেমসফোর্ডের পর বড়লাট হইলেন ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রতিভাশালী প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং। তাঁহার আগমনের অল্প কিছুদিন পরেই, মে মাসে তাঁহার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইল। এই সাক্ষাৎকারে লর্ড রেডিং মহাত্মাকে আশ্বাস দিলেন যে, হিংসার পথ গ্রহণ না করিলে তিনি কংগ্রেসের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, মহাত্মার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার এক বক্তৃতায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন এবং গভর্নমেন্ট তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মৌলানা যাহাতে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার হিংসা পরিহার করিয়া চলার আশ্বাস দেন, ইহা তিনি দেখিবেন এবং এই প্রতিশ্রুতি যথাবিধি পালিত হইয়াছিল। যদিও সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে অন্যায় বা অপমানকর কিছু ছিল না, তবু জনসাধারণের মনে হইয়াছিল যে, সুচতুর বড়লাট কৌশলে মহাত্মা ও মৌলানা —উভয়কেই বেকায়দায় ফেলিয়াছেন। যদিও এই সাক্ষাৎকারের পর, মৌলানা মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে যে মামলা আনিবার কথা হইয়াছিল তাহা স্থগিত রহিল, তবু আগস্ট মাসে করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হইলেন এবং দুই বৎসরের জন্য তাঁহাদের 'সশ্রম কারাদণ্ড' হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গভর্নমেন্টের চাকুরী—অসামরিক বা সৈন্যবাহিনীর যে কোনও চাকুরীই হউক না কেন,—ত্যাগ করিবার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছিল এবং ইহার অর্থ ছিল আইনভঙ্গ। আলি ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের সঙ্গীদিগের শাস্তি হইবার পর মহাত্মা গান্ধী ইহার মোকাবিলা করিতে আগাইয়া আসিলেন। ছেচল্লিশ জন কংগ্রেস নেতা ঐ একই প্রস্তাব স্বাক্ষর-সহ প্রকাশ করিলেন, এবং সারা ভারতব্যাপী হাজার হাজার সভায় ইহার পুনরাবৃত্তি হইল। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজনকেও গ্রেপ্তার করিলেন না এবং কংগ্রেসের এই অমান্যকরণের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি দিলেন না। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় আইনসভা —নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্থাপিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট—১৯২৯ সালের পূর্বেই সংবিধান পরীক্ষা ও সংশোধনের অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করিল। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কোনও জবাব আসিল না কিন্তু পরের বৎসর ভারতসচিব লর্ড পীল এই বিষয়ে ১৯২২ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখযুক্ত এক বার্তায় জানাইলেন যে, এত শীঘ্রই সংবিধান সংশোধনের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে মনে হইতে পারে, সারা ১৯২১ সাল ধরিয়াই বুঝি মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছন্দ গতিতে আগাইয়া গিয়াছেন এবং কোনও বাধার

সম্মুখীন হন নাই। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। জনমতের একটা বিরাট অংশ তাঁহার দিকে ছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গান্ধী-বিরোধী ছিলেন। প্রথমতঃ, ভারতীয় উদারপন্থিগণ সর্বত্র তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগুর চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ছিল উদারপন্থীদের এই সহযোগিতা এবং যতদিন তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন—অর্থাৎ, ১৯২২ সালের মার্চ পর্যন্ত—তাঁহারা উৎসাহের সহিত এই শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহার পদত্যাগের পর প্রতিক্রিয়া সুরু হইল এবং উদারপন্থী নেতৃবর্গ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সহযোগিতা চালাইয়া যাওয়া অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ১৯২২ সালের এপ্রিলে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিলেন এবং ১৯২৩ সালের মে মাসে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন ঐ প্রদেশের উদারপন্থী নেতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি। ক্রমে ক্রমে উদারপন্থিগণ সকলেই গভর্ন-মেন্টের বিরুদ্ধে চলিয়া গেলেন এবং ১৯২৭ সাল নাগাদ পরিবর্তনটা এতই বিরাট হইল যে, যখন সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হয় তখন কংগ্রেসী ও উদারপন্থিগণ উহাকে বর্জনের কথা যুক্তভাবে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন।

মনোভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় উদারপন্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত খুবই মিল ছিল, যাঁহারা কংগ্রেসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের নীতিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। অসহযোগের জোয়ারে যদিও তাঁহাদের প্রভাব সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তবু যেটুকু প্রভাব তখনও তাঁহাদের ছিল উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন। এই চেষ্টায় তাঁহারা ভারতের বিখ্যাত কবি ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত এক বিরাট ব্যক্তির সমর্থন লাভ করেন: জুলাইয়ের প্রায় মাঝামাঝি কবি ইউরোপ হইতে বোম্বাইয়ে পৌঁছেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ একই জাহাজে তাঁহার সঙ্গে আমি আসি। আমাদের যাত্রাপথে, তাঁহার সঙ্গে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত অসহযোগের নূতন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি কোনও প্রকারেই ঐ নীতির বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এই যে, আরও বেশী গঠনমূলক কাজ হউক, যাহাতে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এক রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা যায়। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত আয়ার্ল্যান্ডের সিন ফিন আন্দো-লনের গঠনমূলক দিকের মিল ছিল এবং আমার মতও ছিল একেবারে অনুরূপ। কিন্তু তিনি ভারতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া

ধরিলেন, যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন; এবং ঐ আন্দোলনের ত্রুটিসমূহ—এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না সে সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই কেবল তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণে উদ্যোগী হইলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাই অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য, এরূপ একটা ধারণা হওয়ায় কবি 'সংস্কৃতির ঐক্য' শিরোনামায় কলিকাতায় একটি তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের বিরোধিতা করিলেন। এই আক্রমণকে মুখ বুঁজিয়া কংগ্রেসী মহল মানিয়া লইতে পারিলেন না কিন্তু কবির সম যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল না, যিনি তাঁহার আক্রমণের জবাব দিতে পারেন। যাহা হউক, বাঙ্গলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে এক ভাষণে ইহার জবাব দিতে সাহসী হইলেন। তাঁহার ভাষণের মূল কথা ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে তবু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ একটি সংস্কৃতি রহিয়াছে, যাহা তাহার জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতকে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও উহার বিকাশসাধন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে গিয়া যদি বৃটিশ প্রভাবযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসকল বর্জন করিতে হয়, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কবির আক্রমণকে বরণ করিয়া লওয়া মহাত্মার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ এই কারণে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিকে শান্ত করিবার জন্য মহাত্মাকে কয়েকবার তাঁহার নিকটে যাইতে হইল। কিছুকাল কাটিবার পর কবি বাধাদান হইতে একেবারে নিরস্ত হইলেন এবং মহাত্মার পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে তাঁহার বিশ্বস্ততম সমর্থকদিগের একজন হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মার অসহযোগের নীতিতে যেমন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ হইতে বাধা আসে, অন্যদিকে আর একটি পক্ষ—যথা, বিপ্লবী দল তাঁহার অহিংসার মতের বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অধিকাংশই পরে ১৯১৯ সালে রাজ-বন্দীদের মুক্তি ঘোষণার ফলে খালাস পান। তাঁহাদের অনেকেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করার নীতি অনুমোদন করেন নাই, যাহা জনগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়া তাহাদের প্রতিরোধশক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আদর্শগত বিরোধ হেতু প্রাক্তন বিপ্লবীরা গোষ্ঠীগত-ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন এরূপ একটা সম্ভাবনা ছিল।

পক্ষে, তাঁহাদের এক শ্রেণী ইতিমধ্যেই বাঙলায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সিটিজেন্স প্রটেকশন লীগ নামে বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় ইঁহাদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। একজন ভারতীয় এডভোকেটের মাধ্যমে এই অর্থ বন্টন করা হইত, যিনি অর্থলাভের সূত্রটা প্রকাশ করেন নাই। প্রাক্তন বিপ্লবীদের বৈরিতা দূর করা, এবং সম্ভব হইলে কংগ্রেসের আন্দোলনে তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেজন্য তিনি সেপ্টেম্বরে মহাত্মা ও তাঁহাদের মধ্যে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে তিনিও উপস্থিত থাকেন। মহাত্মার সহিত প্রাক্তন বিপ্লবীদের খোলাখুলি আলোচনা হয় এবং তিনি ও দেশবন্ধু তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, অহিংস অসহযোগ জনগণকে দুর্বল কিংবা নীতিভ্রষ্ট না করিয়া বরং তাহাদের কার্যকর প্রতিরোধক্ষমতাকে জোরদার করিয়া তুলিবে। সম্মেলনের ফল হইল এই যে, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বরাজের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পূর্ণ সুযোগ দান এবং উহার কাজে বাধা সৃষ্টি হয় এমন কিছু না করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, অনেকে আবার অনুগত ও সক্রিয় সদস্য হিসাবে কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করিতেও সম্মত হইলেন।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে মহাত্মা ও প্রাক্তন বিপ্লবীদের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; সেই সময়ে তিনি এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অতিথি হিসাবে অবস্থান করিতেছিলেন। এই প্রথমবার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার আমার সুযোগ ঘটে। দেশবন্ধু ব্যতীত, সেই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলি। তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন না থাকিলে ১৯২১ সালে মহাত্মা কতখানি সাফল্য লাভ করিতেন বলা কঠিন। লালাজী ও দেশবন্ধুর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে কেবল তাঁহাদের অবর্তমানে পাঞ্জাব ও বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ১৯২১ সালে, যুবক নেহরু (পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু) এতটা সুপরিচিত বা অভিজ্ঞ হন নাই যে, তিনি তাঁহার পিতার স্থান দখল করিতে পারেন। প্রথম তিনজন নেতার যে প্রভাব তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশে ছিল তাহা ছাড়াও তাঁহাদের গুরুত্ব আরও এই কারণে ছিল যে, তাঁহারা তিন জনই ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নায়ক। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মার অনেক ভুলই এড়াইয়া চলিতে পারা যাইত যদি তাঁহারা তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। এই তিন বিরাট নেতার মৃত্যুর পর হইতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব পড়িয়াছে এমন সকলের উপর যাঁহারা উচ্চমানের

জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী নহেন। চরিত্র ও সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগের দিক হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের কয়েক জনকে লইয়াই আজ কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তবু তাঁহাদের অধিকাংশকেই বাছিয়া লওয়া হইয়াছে প্রধানতঃ মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের 'অন্ধ' আনুগত্যের কারণে এবং তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েক জনেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যোগ্যতা বা মহাত্মা ভ্রান্ত পথে চলিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলার ইচ্ছা আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এখনকার কংগ্রেসের নেতৃপরিষদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে একজন মাত্র ব্যক্তির ব্যাপার।

উপরোক্ত তিনজন নেতা ছাড়াও, ১৯২১ সালে জনগণের নিকট আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকৎ আলি) ভূমিকা ছিল অনন্য। ইহা সম্ভব হইয়াছিল কতকটা তাঁহাদের নিজেদের কার্যাবলী ও মহাযুদ্ধের সময় নির্যাতন ভোগ—কতকটা মুসলমানদিগের মধ্যে নব জাগরণের জন্য—তবে বেশীর ভাগই তাঁহাদের স্বপক্ষে মহাত্মার প্রচারের ফলে। তাঁহাদের সহিত মহাত্মা এরূপ নিবিড়ভাবে এক হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে মহাত্মার দক্ষিণ ও বাম হস্তরূপে মনে করা হইত। তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া মহাত্মা সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং ইহা স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, তখনকার দিনে যখনই 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এরূপ জনপ্রিয় ধ্বনি শুনা যাইত তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বনিও শুনা গিয়াছে—'আলি ভাই-ও-কি জয়'। যদিও কয়েক বছর পরে আলি ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, তবু তাঁহাদের সহিত মহাত্মার এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য তাঁহার কোনও দোষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমার মতে, অন্যান্য জাতীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে খিলাফৎ প্রশ্নকে যুক্ত করার মধ্যে প্রকৃত ভুলটি নিহিত ছিল না, বরং উহা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটি সংগঠন হিসাবে দেশব্যাপী খিলাফৎ কমিটিকে গঠন করিতে দেওয়ার মধ্যে। ইহার ফলে, যখন পরে নূতন তুরস্কের নেতারূপে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা সুলতানকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং খলিফার পদ একেবারে রদ করিয়া দিলেন, তখন খিলাফৎ প্রশ্নের আর কোনও উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রহিল না এবং খিলাফৎ সংগঠনের সদস্যদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও বৃটিশ-ঘেঁষা মুসলমানদের দলগুলি টানিয়া লইল। যদি পৃথকভাবে কোনও খিলাফৎ কমিটি গঠিত না হইত এবং সকল খিলাফৎপন্থী মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে বলা হইত তাহা হইলে যখন খিলাফৎ প্রশ্নের আর কোনও অর্থ থাকিল না তখন কংগ্রেস সম্ভবতঃ তাহাদিগকে দলভুক্ত করিয়া লইতে পারিত।

বৎসরের মাঝামাঝি সময় পার হইবার পর, রাজনৈতিক পরিস্থিতি

উত্তেজনাকর হইয়া উঠিতে লাগিল। না গভর্নমেন্ট না কংগ্রেস, কাহারও পক্ষেই সেই সময়ে বুঝা সম্ভব হয় নাই কখন ঝড় সুরু হইবে, তবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আসন্ন সংঘর্ষের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে সুরু করিয়াছিল। এই সকল ঘটনায় সর্বত্রই জনসাধারণ আক্রমণকারীর এবং গভর্নমেন্ট আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করিতেছিল। বাঙলায় মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন এবং করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনের পর সেপ্টেম্বরে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাদণ্ডের ফলে কংগ্রেস নেতাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আরও দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—পাঞ্জাবে 'আকালী' আন্দোলন ও দক্ষিণে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ। আকালীরা ছিলেন খৃস্টানদের মধ্যে পিউরিট্যানদের মত শিখদের মধ্যে একটি শ্রেণী। তাঁহারা প্রধানতঃ শিখ মন্দির বা গুরুদ্বার-গুলির পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশই ছিল খুব সম্পদশালী এবং একদল 'মোহান্ত' কর্তৃক পরিচালিত; কঠোর ও সংযমী জীবনযাপন করিয়া তাঁহাদের কেবল অছি হিসাবেই কার্য পরিচালনার কথা থাকিলেও সাধারণতঃ তাঁহারা জনগণের অর্থে একেবারে কলঙ্কময় জীবন কাটাইতেন। আকালীরা এই সকল মোহান্তকে অধিকারচ্যুত করিয়া মন্দিরগুলিকে জনপ্রিয় সমিতির পরিচালনাধীনে আনিতে চাহিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে যেরূপ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে, গভর্নমেন্ট কায়েমী স্বার্থ অর্থাৎ মোহান্তদিগের সমর্থনে আগাইয়া আসিলেন। এইরূপে মোহান্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনরূপে গড়িয়া উঠিল। মন্দিরগুলি দখল করার জন্য 'জাঠ' বা নর-নারীর এক একটি দলকে প্রেরণ করাই ছিল আকালীদের কৌশল এবং উহা কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল কিংবা নির্দয়ভাবে প্রহার ও বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করা হইল। এই আন্দোলন ১৯২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বৎসর ধরিয়া চলিল যখন গভর্নমেন্টের চৈতন্যোদয় হইল এবং আকালীগণ গোড়া হইতেই যাহা দাবী করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা পাঞ্জাব আইন পরিষদে আইন প্রবর্তন করিলেন। মালাবারের মোপলাগণ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী। স্থানীয় হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারা অভ্যুত্থান ঘটান; তবুও ইহার মধ্যে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও একটা আন্দোলন ছিল যে জন্য সরকার যথেষ্ট উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন। ইহার একটা তাৎপর্যও আছে কারণ এই ঘটনার সূত্রেই প্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরে।

বিদ্রোহের এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও, ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, 'এক বছরের মধ্যে' যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা দূরে থাক্,

দেশব্যাপী সংঘর্ষের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। সেজন্য যখন কংগ্রেসী মহল অস্থির ও হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গভর্নমেন্ট পরিত্রাণার্থ আগাইয়া আসিলেন। এরূপ ঘোষণা করা হইল যে, প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারত ভ্রমণ করিবেন এবং ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবেন। অবশ্য এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ক্ষোভ দূর করিয়া গভর্নমেন্টের অনুকূলে তাঁহাদের সমর্থন সংগ্রহ করা। যুবরাজের ভ্রমণকে বর্জন করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে নির্দেশ প্রচার করা হইল। বলা হইল যে, ব্যক্তিগতভাবে যুবরাজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর যদিও কিছু বলার নাই, তথাপি যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন তাহার শক্তিবৃদ্ধির জন্যই যখন তিনি আসিতেছেন তখন তাঁহার ভ্রমণকে বর্জন করা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। এই বর্জনের প্রথম ধাপ হিসাবে ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'হরতাল' বা বর্জনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হইল, ঐদিন সারা দেশব্যাপী কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে। ঐ দিনটিতে বোম্বাইয়ে হরতাল সফল হইল না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস—উভয় পক্ষের সমর্থকদিগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিল যাহা দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গায় পরিণত হইল। কিন্তু উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রধানতঃ খিলাফৎ সংগঠনগুলির ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য এই আন্দোলন যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার তুলনা নাই। কলিকাতায় সাফল্য এত বিরাট হইয়াছিল যে, পরদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা **স্টেটসম্যান** ও **ইংলিশম্যান** লিখিল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ শহর দখল করিয়া ফেলিয়াছে ও গভর্নমেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন; এবং তাহারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদিগের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানাইল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া তাঁহাদের আইনবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর দেশের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ইস্তাহার প্রচারিত হইল।

কলিকাতায় একটা লড়াইয়ের জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং সেজন্য আমরা সরকারী ইস্তাহার কায়মনে স্বাগত করিলাম। সাধারণ মত ছিল যে, অবিলম্বে সরকারী হুমকির জবাব দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নেতা দেশবন্ধু দাশ ছিলেন সতর্ক ব্যক্তি। তিনি প্রদেশের মধ্যে তাঁহার অনুগামীদের অবস্থা বুঝিয়া লইতে এবং মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করিতে সময় চাহিলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্যে অমান্য করার জন্য যদি কংগ্রেস আন্দোলন সুরু করে তাহা হইলে কি পরিমাণ জনসমর্থন লাভ করা যাইবে, এ বিষয়ে সংবাদের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে গোপন বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হইল। এক সপ্তাহের মধ্যেই জেলাগুলি হইতে

উৎসাহজনক সংবাদ আসিতে লাগিল। তাহার পর নভেম্বর মাসের শেষদিকে আমাদের কার্যধারা স্থির করিবার জন্য রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভা ডাকা হইল। বাঙলা দেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সমিতির সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি ঐ দলের সদস্য হইয়াছি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ স্থির হইল যে, আইন অমান্য সুরু করা হইবে এবং জরুরী অবস্থার জন্য কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ইহার সভাপতি দেশবন্ধু দাশের উপর ন্যস্ত হইল,—এবং তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে মনোনীত করিবার ক্ষমতাও লাভ করিলেন। এইরূপে তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বময় নেতা নিযুক্ত হন—যে পদ্ধতি পরে সারা দেশে অনুসৃত হইয়াছিল।

দলের অল্পবয়স্ক উগ্রপন্থী সদস্যগণ যে বিরাট আন্দোলন সুরু করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শ না মানিয়া নেতা ছোটখাটোভাবে উহা সুরু করা স্থির করিলেন। তিনি বলিলেন, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আন্দোলনকে গড়িয়া তুলিতে এবং সংগ্রামকে স্পষ্ট একটি মাত্র প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখিতে তিনি চাহেন। ঐ প্রশ্নটি ছিল—যদি পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবকের এক একটি দল, আমাদের প্রস্তাবিত দলের ইউনিফর্ম না পরিয়া বরং সাধারণ পোশাকে, শান্তিপূর্ণভাবে খদ্দরের কাপড় বিক্রী করিতে বাহির হন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন? যদি তাঁহারা ঐরূপ করেন তাহা হইলে গভর্নমেন্টের কার্যকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও স্বেচ্ছাচারমূলক বলিয়া জনসাধারণ মনে করিবেন এবং সকল শ্রেণী কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে আগাইয়া আসিবেন। এই প্রশ্নের উপর সংগ্রাম সুরু হইল এবং আন্দোলনের ভার দেওয়া হইল আমার উপর। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব রহিল না, বিশেষতঃ এই কারণে যে, ছাত্রগণ ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন প্রচার করিলাম যাঁহারা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে বাহির হইয়া উহার পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। যে সাড়া পাওয়া গেল তাহা নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণ স্পষ্টতঃই তখনও পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং তাঁহাদের জাগাইবার জন্য কিছু উদ্দীপনার দরকার ছিল। দলের নেতা প্রস্তাব করিলেন যে, সকলের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বাহির হইবেন। আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলাম বিশেষতঃ এই কারণে যে, একজনও পুরুষ থাকা পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোককে যাইতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু আমাদের নেতা তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। সেজন্য পর দিবস শ্রীমান দাশ, যিনি প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—

স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতারূপে বাহির হইয়া তখনই কারাবরণ[১] করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বদলাইয়া গেল এবং আরও স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে সুরু করিলেন—কিন্তু উহাও যথেষ্ট ছিল না। অতএব এবার পালা আসিল শ্রীযুক্তা দাশের। তাঁহার ননদ শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবী ও আর একজন সঙ্গিনী কুমারী সুনীতি দেবী সমভিব্যাহারে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব করার জন্য বাহির হইলেন। যখন শহরে এই সংবাদ ছড়াইয়া গেল যে, শ্রীযুক্তা দাশ ও অন্যান্য মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তখন ভীষণ উত্তেজনা দেখা গেল। দারুণ ক্ষোভে বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দরিদ্র স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য আসিতে সুরু করিল। কর্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া গিয়া শহরটিকে এক সেনাশিবিরে পরিণত করিলেন। কিন্তু সংগ্রামের প্রথমার্ধে আমাদেরই জয় হইল।

এই ক্ষোভ জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু এতদিন পর্যন্ত যে পুলিস কর্মচারীরা আনুগত্যের পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। জেলে নীত হইবার জন্য থানায় শ্রীযুক্তা দাশ যেই পুলিসের গাড়ীতে চড়িতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু পুলিস কনেষ্টবল তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা সেইদিনই তাহাদের চাকুরিতে ইস্তফা দিবে। গভর্নমেন্ট মহলে ভয় ধরিয়া গেল। তখনও কেহ জানিত না এই সংক্রমণ কতদূর পর্যন্ত ছড়াইবে। তৎক্ষণাৎ গভর্নমেন্ট আদেশ প্রচার করিলেন যে, পুলিস কনেষ্টবলদিগের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইবে। সেইদিনই সন্ধ্যায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক ভোজসভায় চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা ঘটিল। নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী রাজনীতিবিদ (যিনি পরে ভারতসচিবের পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন) শ্রীযুক্ত এস. এন. মল্লিক যখন শ্রীযুক্তা দাশের গ্রেপ্তারের কথা শুনিলেন তখন উহার প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তিনি গভর্নমেন্ট হাউস পরিত্যাগ করিলেন। উত্তেজনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, গভর্নমেন্টকে মধ্যরাত্রির পূর্বেই শ্রীযুক্তা দাশ ও তাঁহার সঙ্গিনীদের মুক্তির আদেশ দিতে হইয়াছিল, এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে ভুল করিয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরদিন হইতে হাজার হাজার ছাত্র ও কারখানার শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকরূপে নাম লিখাইতে সুরু করিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শহরের বড় দুইটি জেল রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁবু গাড়িয়া জেল তৈয়ারী করা হইল কিন্তু ঐগুলিও বেশীদিন অপূর্ণ থাকিল না। গভর্নমেন্ট তখন কঠোর ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেশবন্ধু দাশ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হইল, এবং ১৯২১ সালের

---

[১] অসহযোগের নিয়মানুসারে, কোনও কংগ্রেসসেবককে বৃটিশ আদালতে বিচারার্থ আনা হইলে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন না করিবার কথা। সেজন্য মামলা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিত এবং সাধারণতঃ এই সকল মামলার নিষ্পত্তি হইতে কয়েক মিনিটের বেশী লাগিত না।

১০ই ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যার মধ্যে আমরা সকলেই কারারুদ্ধ হইলাম।

কিন্তু এই সকল গ্রেপ্তার আরও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল এবং যত বেশী লোক গ্রেপ্তার হইতে লাগিল, জেলের পরিচালন-ব্যবস্থা ততই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দেওয়া হইল কিন্তু কেহই জেল ত্যাগ করিবেন না; তদুপরি, তাঁহাদের সনাক্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কখনও কখনও তাঁহাদিগকে, অন্য কোনও জেলে বদলি করা হইতেছে কিংবা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন দেখা করিতে চাহেন, এই অজুহাতে জেল-অফিসে লইয়া যাওয়া হইত এবং সেখানে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যখন এই কৌশল ধরা পড়িয়া গেল তখন জেলের কর্মচারী কেহ ডাকিতে আসিলে কোনও বন্দী তাঁহার সেল্ পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাতে বন্দীদের বলপূর্বক জেলের গেটে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। জেলের বাহিরে অন্য কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। গ্রেপ্তার বন্ধ করা হইল এবং আদেশ দেওয়া হইল যে, জনতা ও বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করিতে পুলিস যথেচ্ছ লাঠি ও বেটন চালনা করিবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিক্ষোভকারীদের পুলিসের গাড়িতে করিয়া শহর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে যানবাহনের সুবিধা নাই এমন কোনও স্থানে লইয়া গিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতে বলা হইত। শীতকালে নলের সাহায্যেও বিক্ষোভকারীদের যদৃচ্ছ ঠাণ্ডা জলে অবাধে স্নান করাইয়া দেওয়া হইত।

কিন্তু ইহা প্রত্যেকের নিকটই স্পষ্ট ছিল যে, এই সকল সাময়িক ব্যবস্থাদি ও কৌশলে কাজ হইবে না। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। কংগ্রেস যে কৌশল কাজে লাগাইয়াছিল উহার অভিনবত্বে গভর্নমেন্ট বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা অবশ্য,—পরে যেরূপ করিয়াছিলেন,—আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বেপরোয়া ও নির্মম শক্তির প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েল্স-এর ভারতে উপস্থিতির ফলে তাঁহারা অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েল্স-এর পৌঁছিবার কথা ছিল, এবং উহার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে বড়লাট লর্ড রেডিং সেখানে উপস্থিত হন। যেহেতু তিনি ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি সেই কারণে কলিকাতার প্রধান আদালতের সদস্যগণ পূর্বেই তাঁহাকে এক ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশবন্ধু দাশের গ্রেপ্তারের জন্য তাঁহারা ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেন। এইরূপে সর্বত্রই বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠে। প্রথমতঃ, আইন অমান্য আন্দোলন বাঙ্গলায় যদিও

সর্বাপেক্ষা জোরদার হয়, তবু সারা উত্তর ভারত জুড়িয়াই ইহা মোটামুটি শক্তিশালী ছিল এবং কোনও প্রদেশই বাদ যায় নাই। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলন, বাঙলায় মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ অভিযান ও দক্ষিণ ভারতে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ সংকটকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। ভারতের বাহিরে, আয়ার্ল্যান্ডে সিন ফিন আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট বৃটেনের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাহার কয়েক মাস পূর্বে মুস্তাফা কামাল পাশার সহিত আফগানিস্থান একটি চুক্তি করিয়াছে এবং ইহার পরে পারস্য ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও এক চুক্তি হইয়াছিল। ইজিপ্টে সৈয়দ জগলুল পাশার জাতীয়তা-বাদী ওয়াফদ দল শক্তিশালী ও সক্রিয় ছিল। এইরূপে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, সমগ্র মুশিলম জগৎ গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, এবং ভারতের মুসলমানদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। এরূপ পরিস্থিতিতে লর্ড রেডিং-এর গভর্নমেন্ট যে কংগ্রেসের সহিত একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কিছু ছিল না। প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, যিনি তাঁহার নিজস্ব কারণে ১৯২১ সালের আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছিলেন--শান্তির দূতরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বড়লাটের এক বার্তা লইয়া প্রেসিডেন্সী জেলে দেশবন্ধু দাশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি প্রস্তাব লইয়া ছিলেন যে, জনসাধারণ যাঁহাতে যুবরাজের ভ্রমণকে বর্জন না করেন তজ্জন্য অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইতে যদি কংগ্রেস সম্মত হয় তাহা হইলে গভর্নমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন উহা প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং উহার দ্বারা কারারুদ্ধ সকলকে ছাড়িয়া দিবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র স্থির করিবার জন্য গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি গোল টেবিল বৈঠকও তাঁহারা আহ্বান করিবেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলমান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত মালব্যের সহিত আমাদের নেতার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের সহযোগিগণ, যাঁহাদের সেপ্টেম্বরে করাচীতে দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্নসহ অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্ন সমাধান সাপেক্ষ ছিল। এই প্রশ্নে সরকারী জবাব ছিল এই যে, যেহেতু তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হন নাই, সেজন্য মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে তাঁহাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেসের চাপ দেওয়া উচিত নয়। তবে বড়লাট এই আশ্বাস দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের সত্যই মুক্তি দেওয়া হইবে। যখন দেশবন্ধু দাশ বিষয়টি আমাদের নিকট পেশ করিয়া

আমাদের মত চাহিলেন তখন যুবকগোষ্ঠী ঐ সকল শর্তে চুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলেন; ঐ দলে আমিও ছিলাম। তাহাতে তিনি আমাদের সহিত এক বিস্তৃত আলোচনা শুরু করিলেন এবং তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে এই যুক্তি তুলিয়া ধরিলেন যে, তৎক্ষণাৎ একটি আপোষ করা কর্তব্য। তিনি বলিলেন, ভালই হউক বা মন্দই হউক, মহাত্মা এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই এক বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এক পক্ষ কাল মাত্র বাকী আছে, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের মুখ রাখিতে ও স্বরাজ সম্বন্ধে মহাত্মার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে কিছু সাফল্য অর্জন করিতে হইবে। তাঁহার নিকট বড়লাটের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মত আসিয়াছে। যদি ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে একটি মীমাংসা হয় এবং সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পান তাহা হইলে জনগণের কল্পনায় ইহা কংগ্রেসের এক বিরাট সাফল্য হিসাবে গৃহীত হইবে। গোল টেবিল বৈঠক সফল হইতে পারে কিংবা না-ও হইতে পারে; কিন্তু যদি ইহা ব্যর্থ হয় এবং গভর্নমেন্ট জনগণের দাবীগুলি পূরণে অস্বীকৃতি জানান—তাহা হইলে কংগ্রেস যে কোনও সময়ে সংগ্রাম পুনরায় সুরু করিতে পারিবে এবং যখন করিবে তখন অধিকতর সম্মান ও জনগণের আস্থার অধিকারী হইবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি ছিল অখণ্ডনীয় এবং আমি নিঃসংশয় বোধ করিয়াছিলাম। মীমাংসার প্রস্তাবিত শর্তগুলি গ্রহণের সুপারিশ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট দেশবন্ধু দাশ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যুক্ত স্বাক্ষরসহ এক তার পাঠানো হইল। এই মর্মে জবাব আসিল যে, মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের সহযোগীদের মুক্তি এবং গোল টেবিল বৈঠকের তারিখ ও গঠন সম্বন্ধে একটি ঘোষণার উপরেও তিনি জোর দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, চুক্তির শর্ত লইয়া আর কোনও আলোচনা চালাইবার মত মানসিক অবস্থা বড়লাটের ছিল না এবং তিনি অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত চাহিয়াছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে দেশবন্ধুর যাহা করিবার ছিল তাহা হইল তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা তখন জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়া বিশেষভাবে অনুরোধ করা, যাহাতে মহাত্মাকে রাজী করাইবার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁহারা চেষ্টা করেন। এই সকল বন্ধু তাহাই করিলেন এবং আমেদাবাদের নিকটে মহাত্মা যেখানে সচরাচর অবস্থান করিতেন সেই সবরমতী ও কলিকাতার মধ্যে বহু তার বিনিময় হইল। শেষ পর্যন্ত মহাত্মার মতের পরিবর্তন হইল কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট অপেক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিলেন। ক্রোধে ও বিরক্তিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন দেশবন্ধু। তিনি বলিলেন, কাহারও জীবদ্দশায় যে সুযোগ একবারই আসে তাহা তাঁহারা হারাইয়াছেন।

রাজবন্দীদের, সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও মনোভাব ছিল এই যে, মহাত্মা ভয়ানক একটি ভুল করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি যাঁহাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল, মাত্র সংখ্যাল্প কিছু লোক কোনও মতামত জানাইতে অস্বীকার করিলেন। যাহা হউক, সুযোগ যখন হারাইয়াছেই তখন এই প্রতিকূল পরিস্থিতির যথাসাধ্য সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন দেশবন্ধু। তাঁহার অর্ধ-লিখিত ভাষণ, যাহাতে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধতির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছিল উহা কংগ্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসনে বসিলেন দিল্লীর বিশিষ্ট নেতা হাকিম আজমল খাঁ। আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল এবং প্রধান প্রস্তাবের দ্বারা সমগ্র দেশকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আইন অমান্যের নীতি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছিল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিতে, জরুরী আইনগুলি অমান্য করিতে এবং কারাবরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙলা কংগ্রেস কমিটি যেরূপ প্রদেশের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতারূপে দেশবন্ধুকে নিয়োগ করিয়াছিল, সেই নজির অনুসরণ করিয়া কংগ্রেস মহাত্মাকে সমগ্র দেশের একচ্ছত্র নেতাও করিয়া দিল।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে কৌতূহলপ্রদ একটি ঘটনা ঘটে। যুক্তপ্রদেশের একজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা, মৌলানা হসরৎ মোহানী এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে, প্রজাতন্ত্র (ভারত যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাঁহার বাগ্মিতা শ্রোতাদের এরূপ অভিভূত করিয়াছিল এবং শ্রোতাদের পক্ষ হইতে যে রকম সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে। কিন্তু মহাত্মা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিতে উঠিয়া বিরাট গাম্ভীর্যের সহিত উহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন—যাহার ফলে সভা কর্তৃক উহা বাতিল হইয়া যায়। যাহা হউক, কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে প্রস্তাবটি বার বার তুলিতে হইয়াছে, যে পর্যন্ত না ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে ইহা গৃহীত হয়: সেবার প্রস্তাবটির উত্থাপক আর কেহ নহেন, মহাত্মা স্বয়ং।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সাল শেষ হইল। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্বে বিস্ময়কর ধরনের কিছুই ঘটিল না। যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আসিল না। কয়েক মাস পূর্বে, বাঙলার প্রাক্তন বিপ্লবীদের সহিত আলোচনায় মহাত্মা বলিয়াছিলেন, সেই বৎসরটি শেষ হইবার পূর্বেই স্বরাজ লাভের ব্যাপারে তিনি এতই নিশ্চিত যে,

৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পরে স্বরাজ লাভ না করিয়া তিনি নিজে বাঁচিয়া আছেন এরূপ ধারণাও করিতে পারেন না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে দ্বৈতশাসন তিনি চাহিবা মাত্রই পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি চাহেন পুরাপুরি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং তাহা যদি পান তাহা হইলে তিনি তাঁহার আশ্রমের উপর বৃটেনের পতাকা উড়াইতে প্রস্তুত থাকিবেন। ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের যেই যবনিকা পতন ঘটিল, আমার মনশ্চক্ষে এই কথাগুলি স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

ঐ বৎসরটি শেষ হইবার পূর্বেই মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রধান প্রধান নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে, দেশবন্ধু ও বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলিবার সময় বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যসম্পন্ন নেতাদের কাহারও পক্ষেই মহাত্মাকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যদি তাঁহারা তখন তাহা করিতেন তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ ঘটনার গতি ভিন্ন হইত। অবশ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ঐ বারো মাসের মধ্যে দেশের দারুণ উন্নতি হইয়াছিল এবং ঐ কৃতিত্বের অনেকখানিই মহাত্মার প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সংকটকালে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গুণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে দেশবন্ধু যাহা প্রায়ই বলিতেন তাহা মনে পড়িতেছে। তাঁহার মতে, মহাত্মা আন্দোলন চমৎকারভাবে শুরু করেন, অভ্রান্ত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন; একটার পর একটা সাফল্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আন্দোলনের চরম পর্যায়ে উপনীত হন - কিন্তু তাহার পর তাঁহার দৃঢ়তা হারাইয়া দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখাইতে শুরু করেন।

এই অধ্যায়টি শেষ করিবার পূর্বে ঐ বৎসরের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি হিসাব গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হইবে। ১৯২১ সালটিতে দেশ নিঃসন্দেহে সুসংহত একটি দলীয় সংগঠন লাভ করিয়াছিল। উহার পূর্বে, কংগ্রেস ছিল একটি নিয়মতান্ত্রিক দল এবং প্রধানতঃ বাক্‌সর্বস্ব সংস্থা। মহাত্মা কেবল যে ইহাকে একটি নূতন গঠনতন্ত্র ও জাতীয় ভিত্তি দান করেন তাহাই নহে - যাহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, তিনি ইহাকে একটি বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করেন। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা - লাল,[১] সবুজ ও সাদা সারা দেশব্যাপী গৃহীত হয় এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। সর্বত্র একই ধ্বনি শুনা গিয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই নীতি ও আদর্শবাদের প্রচলন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার মর্যাদা লোপ পায় এবং কংগ্রেস হিন্দীকে (বা

---

[১] জাতীয় পতাকার লাল রঙটি এখন পরিবর্তন করিয়া জাফরণ করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী) সমগ্র দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, খদ্দর সকল কংগ্রেসীর দলীয় পোষাক হইয়া উঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক রাজনৈতিক দলের সকল বৈশিষ্ট্য ভারতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এরূপ বিরাট সাফল্যের কৃতিত্ব স্বভাবতঃই আন্দোলনের নেতা—মহাত্মা গান্ধীর। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক গুরুতর ভুল--তাঁহার নিজের ভাষায় 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' তাঁহার হইয়াছে। আজও যে তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা দ্বারা বুঝায় না যে, বিচার-বিভ্রান্তি হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন: বরং যে বিরাট বিরাট সাফল্য তিনি সত্য সত্যই অর্জন করিয়াছেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এতই বিরাট যে, তাঁহার দেশবাসী তাঁহার ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই প্রসঙ্গে, গোড়া হইতেই আন্দোলনে যে সমস্ত ত্রুটি বর্তমান ছিল এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলি আরও অধিকতররূপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এক ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁহারা মহাত্মাকে কতকটা প্রভাবিত করিতে পারিতেন বলিয়া বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা তত বেশী হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে কংগ্রেসের সমস্ত বিচারবুদ্ধি এক ব্যক্তির নিকট বাঁধা পড়িয়াছে এবং যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও প্রকাশ্যে সমালোচনা করিতে সাহসী হন তাঁহাদিগকে মহাত্মা ও তাঁহার শিষ্যগণ কংগ্রেসবিরোধী মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজের' প্রতিশ্রুতির মধ্যে কেবল যে অবিবেচনা ছিল তাহাই নহে, নির্বুদ্ধিতাও ছিল। ইহা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সকল লোকের নিকট কংগ্রেসকে অতীব মূঢ় প্রতিপন্ন করিয়াছিল। মহাত্মার শিষ্যগণ অবশ্য পরে এই বলিয়া বিষয়টির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেশ শর্তগুলি পালন করে নাই এবং সেজন্যই এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। মূল প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞতার অভাব ছিল, এই ব্যাখ্যাও তদ্রূপ অসন্তোষজনক--কারণ অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়া যে কোনও নেতা বলিতে পারেন যে, যদি আপনি কতকগুলি শর্ত পালন করেন তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি স্বাধীন হইতে পারেন। রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে গিয়া কোনও যোগ্য নেতার অসম্ভব শর্তাবলী চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাঁহার হিসাব করা উচিত, কোন্ কোন্ শর্ত পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফৎ প্রশ্নকে স্থান দেওয় দুর্ভাগ্যজনক হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই যেরূপ বলিয়াছি, যদি খিলাফৎ-পন্থী

মুসলমানগণ পৃথক একটি দল না গড়িয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাহা হইলে এরূপ অবাঞ্ছিত পরিণাম হইত না। ঐ ক্ষেত্রে তুর্কীদের নিজেদের কার্যের দ্বারাই যখন খিলাফৎ প্রশ্ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইল তখন খিলাফৎপন্থী মুসলমানগণ জাতীয়তাবাদিগণের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেন।

১৯২০ সালে যে ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছিল উহা প্রকৃতপক্ষে শুরু হইল ১৯২১ সালের নভেম্বরে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর ধরিয়া ইহার প্রচণ্ডতা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল এবং যখন নূতন বৎসর শুরু হইল তখন লক্ষণ দেখিয়া, কত দিন যে ইহা চলিবে বলা অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, ১৯২২ সাল একটি বিপরীত দৃশ্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যাহা এখনই আমরা দেখিব।

৩

ব্যর্থ পরিণাম (১৯২২)

এতদিন পরে আজ অনুমান করা সম্ভব নয়, ১৯২১ সালে ভারতবাসী কত গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ঐ বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই স্বরাজ লাভ হইবে। এমন কি অতি বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। স্মরণ আছে, ১৯২১ সালে এক জনসভায় সুযোগ্য এক বাঙ্গালী এডভোকেটকে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বলিয়াছিলেন: 'এই বৎসরে আমরা নিশ্চিতই স্বরাজ লাভ করিতে চলিয়াছি। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কিরূপে আমরা ইহা করিব আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, আমরা কৃতকার্য হইবই।' ১৯২১ সালে আর একবার, মহাত্মা কর্তৃক প্রচারিত কয়েকটি নির্দেশ সম্বন্ধে কলিকাতার একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদের সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকারে যে অর্থ আছে উহার সমস্তই ঐ বৎসরের মধ্যে ব্যয় করিতে হইবে এবং পরের বৎসরের জন্য কিছুই রাখা চলিবে না। স্বাভাবিক বিচারবোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা উচিত বলিয়া বোধ হয় নাই, কিন্তু মহাত্মাকে সমর্থন করিতে গিয়া এই বন্ধুটি বলিয়াছিলেন, 'আমরা বিবেচনাপূর্বক ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর দৃষ্টিপাত না করা স্থির করিয়াছি।' এই সমস্ত এখন পাগলামি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু, ইহা হইতে দেশে সেই বৎসরে জাতির যে আশা ও উদ্দীপনার ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়।

নূতন বৎসর ১৯২২ সাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উৎসাহকে জাগাইয়া তুলিতে মহাত্মা বিশেষ এক চেষ্টা করিলেন। সুতরাং, তাঁহার পরিকল্পনার শেষ পর্যায়—অর্থাৎ কর-বন্ধের দিকে অগ্রসর হওয়া স্থির হইল। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি বড়লাট লর্ড রেডিং-এর নিকট এই বলিয়া এক চরমপত্র পাঠাইলেন যে, সাত দিনের মধ্যে যদি গভর্নমেন্ট হৃদয়ের পরিবর্তন না দেখান তাহা হইলে তিনি গুজরাটে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ) বারদোলী মহকুমায় সাধারণভাবে কর-বন্ধ শুরু করিবেন। বলা হইয়াছিল যে, বারদোলী মহকুমায় এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে কাজ করিয়াছেন এবং ঐ জাতীয়

কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বারদোলীতে কর-বন্ধ আন্দোলনের সূচনা হইবে দেশব্যাপী ঐরূপ একটা আন্দোলন শুরু করার সংকেত। বাঙলায় যুগপৎ কর-বন্ধ আন্দোলন[১] শুরু করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও করা হইল, এবং যুক্তপ্রদেশ ও অন্ধ্রও (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাঞ্চল) ঐ প্রকার আন্দোলনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত ছিল। মহাত্মার চরমপত্র সমগ্র দেশে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রহর গণিতে লাগিলেন। সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটায় দেশবাসী স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। চৌরি-চৌরার ঘটনা এই পরিস্থিতির উদ্ভব করিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তপ্রদেশে চৌরি-চৌরা নামে একটি স্থানে গ্রামবাসিগণ উত্তেজনার ঝোঁকে থানায় আগুন ধরাইয়া দেয় এবং কয়েকজন পুলিসকে হত্যা করে। এই সংবাদ যখন মহাত্মার নিকট পেঁৗছিল, তিনি তখন অবস্থার এই পরিবর্তনে ভয় পাইয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বারদোলীতে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা ডাকিলেন। তাঁহার অনুরোধে সমিতি সারা ভারতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন (অর্থাৎ, কর-বন্ধসহ আইন ও গভর্নমেন্টের আদেশ অমান্যকরণ) সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা স্থির করিল এবং সকল কংগ্রেসসেবককে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আত্ম-নিবদ্ধ থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই 'গঠনমূলক কর্মসূচী'র মধ্যে ছিল প্রচলিত কোনও আইন কিংবা গভর্নমেন্টের জরুরী বিধান স্বেচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন না করিয়া সূতা-কাটা ও তাঁত-বোনা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের উন্নতিসাধন, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা দমন, 'জাতীয়' শিক্ষার প্রসার এবং সালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া মোকদ্দমার হ্রাসকরণ।

সেই সময়ে সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করা হইল কিন্তু কংগ্রেস শিবিরে রীতিমত একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য কেন যে মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনাকে কাজে লাগাইয়াছিলেন, ইহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। জনসাধারণের ক্ষোভ আরও অধিক হইয়াছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করা মহাত্মা প্রয়োজন বোধ করেন নাই এবং দেশের পরিস্থিতিও মোটামুটিভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যধিক অনুকূল ছিল। জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পেঁৗছিতে চলিয়াছে ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় হইতে কম কিছুই নয়। মহাত্মার প্রধান সেনাপতিগণও—দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও লালা লাজপৎ রায়, যাঁহারা সকলেই জেলে ছিলেন,—জনগণের মতই ক্ষুব্ধ

[১] গ্রামের পুলিস ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য সকল গ্রামবাসীকে সেই সময়ে যে চৌকিদারী কর দিতে হইত উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া।

হইয়াছিলেন। আমি তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম এবং মহাত্মা গান্ধী যেভাবে বার বার ভুল করিতেছিলেন তাহাতে ক্রোধে ও দুঃখে তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া যাইতে আমি দেখিয়াছিলাম। ডিসেম্বরের ভুল সবে মাত্র তিনি বিস্মৃত হইতে সুরু করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভীষণ আঘাতের মত আসিল বারদৌলীর পশ্চাদপসরণ। লালা লাজপৎ রায়ের মনোভাবও একই প্রকার ছিল এবং শুনা গিয়াছিল যে দারুণ বিরক্তিতে তিনি জেল হইতে মহাত্মাকে সত্তর পৃষ্ঠার এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

আধা-সরকারী মহলে মহাত্মার এই হঠাৎ রূপ-বদলের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, বারদৌলীতে তাঁহার কর-বন্ধ আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য গভর্নমেন্ট গোপনে ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং করের পরবর্তী কিস্তির একটি বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়া গিয়াছিল। গভর্নমেন্ট যে সকল পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে গোপন সংবাদ দিয়া মহাত্মার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সরকারী মহল তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি আন্দোলন সুরু করেন তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। মহাত্মা গান্ধী যখন এই সকল তথ্যের সম্মুখীন হইলেন তখন তিনি পরিস্থিতির নৈরাশ্যকর অবস্থা উপলব্ধি করিলেন এবং বারদৌলীতে আন্দোলন সফল না হইলে দেশে এই আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়া তিনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের অজুহাত হিসাবে চৌরি-চৌরার ঘটনাকে কাজে লাগানো স্থির করিলেন। যাহা হউক, মহাত্মাকে যাঁহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইবেন না।

সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে যখন তাঁহার অনুগামিগণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন তখন তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। সারা ১৯২১ সাল ধরিয়া তিনি মহাত্মাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর হইতে তিনি তাঁহার কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিবার একটি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। মহাত্মা তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা **ইয়ং ইন্ডিয়ায়** কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন: এ পর্যন্ত তিনি যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহার অনুপ্রাণিত রচনাবলীর মধ্যে চিরকাল স্থান পাইবে। গভর্নমেন্ট এগুলিকে রাজদ্রোহমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। অতএব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল। তবে যে প্রশ্নটি তাঁহাদের বিবেচনা করিতে হইয়াছিল তাহা হইল, যে জনতার বিগ্রহরূপ ছিলেন মহাত্মা তাহাদের উপর এরূপ কার্যের কি প্রতিক্রিয়া হইবে। শুনা গিয়াছিল, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা পুরাপুরি অহিংসা প্রচার করা

সত্ত্বেও, তাঁহার গ্রেপ্তারের পর ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা ও রক্তপাত ঘটিবে বলিয়া লর্ড রেডিং সত্য সত্যই ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। উপরন্তু, যে লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে অমৃতসরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে তাঁহার পর আসিয়া ১৯১৯ সালের সেই ভয়াবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাইবার কোনও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেজন্য তিনি ভীত ও উদ্বিগ্নভাবে মহাত্মাকে আঘাত হানিবার একটি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তখন মহাত্মা স্বয়ং এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন যাহাতে সারা দেশে নৈরাশ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং কংগ্রেসের মধ্যেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হইল। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে লর্ড রেডিং-এর পক্ষে তৎপর হইবার ইহাই ছিল উপযুক্ত মুহূর্ত—যদি ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগু তাঁহার পথে কেবল বাধা না হইয়া দাঁড়াইতেন। ভারত গভর্নমেন্টের সৌভাগ্য যে. মার্চের গোড়ার দিকে ইংলন্ডে মন্ত্রিসভার সহিত মতভেদ ঘটায় শ্রীযুক্ত মন্টেগু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফলে শেষ বাধা দূর হইল এবং ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী বন্দী হইলেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিচার ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার সভাপতির ভাষণে মামলার বিবরণ দিতে গিয়া পন্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে খৃষ্টের বিচারের সহিত উহার তুলনা করিয়াছিলেন। ওয়াই. এম. সি. এ-র সুবিখ্যাত নেতা স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত কে. টি. পালও[১] অনুরূপ একটি উপমা দেন। মামলা চলিবার সময় মহাত্মা নিজেকে একজন কৃষক ও তাঁতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া কিরূপে 'বিশ্বস্ত রাজভক্ত ও সহযোগী হইতে আমি একজন অনমনীয় রাজদ্রোহী ও অসহযোগীতে পরিণত হইয়াছি' তাহার বিবরণ দেন: এবং এই কথাগুলি বলিয়া তিনি তাঁহার বিবৃতি শেষ করেন : 'বিচারপতি ও উপদেষ্টাগণ, যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদিগকে যে আইন চালু রাখার ভার দেওয়া হইয়াছে উহা অকল্যাণকর এবং বাস্তবিকপক্ষে আমি নির্দোষ তাহা হইলে একমাত্র যে পথ আপনাদের নিকট খোলা আছে তাহা হইতেছে, চাকুরী হইতে পদত্যাগ করা এবং এইরূপে নিজদিগকে পাপ হইতে দূরে রাখা, অথবা যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যবস্থা ও আইন চালু রাখিতে আপনারা সাহায্য করিতেছেন সেগুলি এই দেশের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর এবং সেজন্যই আমার কার্যকলাপ জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর তবে আমাকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি দেওয়া।'

ইংরেজ বিচারপতি শ্রীযুক্ত ব্রুমফিল্ড তাঁহাকে ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

[১] কে. টি. পাল-কৃত—দি বৃটিশ কানেকশন উইথ ইন্ডিয়া—লন্ডন, ১৯২৭, পৃঃ ৫০।

শ্রীযুক্ত মন্টেগুর পদত্যাগ ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জের সর্বদলীয় মন্ত্রিসভায় রক্ষণশীলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার একটি ইঙ্গিত। টোরী সদস্যদিগের চাপে আগস্টে শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ তাঁহার সেই বিখ্যাত 'ইস্পাতের কাঠামো' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন যাহাতে সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ইস্পাতের কাঠামোরূপে বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, ভারতে অন্যান্য যে পরিবর্তনই হউক না কেন সিভিল সার্ভিস অবশ্যই বৃটিশের থাকিবে। এই বক্তৃতা ভারতে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল, কারণ লোকে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল যেদিন সিভিল সার্ভিসের ক্ষমতা ও বেতন হ্রাস করা হইবে এবং তদ্দ্বারা দেশবাসীকে তাহাদের দেশশাসনে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। প্রায় এই সময়েই, নূতন সহকারী ভারতসচিব লর্ড উইন্টারটন ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় নৃপতি ও শাসকদিগের সম্বন্ধে নূতন একটি নীতি ঘোষণা করা। পূর্বের বৎসর যখন প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারত ভ্রমণে আসেন তখন তিনি বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁহার অভ্যর্থনার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বৃটিশ ভারতে জনসাধারণ তাঁহার ভ্রমণকে বর্জন করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁহার এরূপ কোনও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয় নাই। সেই মুহূর্ত হইতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট নৃপতিদের প্রতি নূতন এক মনোভাব--অধিকতর মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের মনোভাব গ্রহণ করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। নৃপতিগণ তাঁহাদের স্বার্থে বৃটিশ ভারত হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে বৈরী আন্দোলন ও প্রচার চালানো হইয়া থাকে উহা দমন করার উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করিতে ভারত গভর্নমেন্টকে বুঝাইবার এই সুযোগ কাজে লাগাইয়াছিলেন। তদনুসারে, ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে আইন সভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য (রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা) আইন নামে একটি আইন প্রবর্তিত হইল। আইন সভা ঐ আইনটিকে একেবারে নাকচ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু বড়লাট ইহাকে জরুরী ও আবশ্যক বলিয়া 'সুপারিশ' করায় ইহা আইনে পরিণত হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নূতন সহকারী ভারত সচিব লর্ড উইন্টারটন বড়লাট এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলার গভর্নরদিগের সহিত তাঁহার আলোচনায় নৃপতিদিগের প্রতি এই নূতন মনোভাব প্রচার করেন, এবং তাঁহার ভ্রমণের পর ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণ উপযুক্ত কোনও সুযোগ পাইলেই নৃপতিদের প্রশংসা গাহিতে সুরু করিয়া দেন।

অক্টোবরে ইংলন্ডে সাধারণ নির্বাচন হইল। সর্বদলীয় গভর্নমেন্ট ভাঙ্গিয়া গেল এবং রক্ষণশীলগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত বোনার ল—এবং ভাইকাউন্ট পীল ও লর্ড উইন্টারটন হইলেন যথাক্রমে ভারতসচিব ও সহকারী ভারতসচিব। পরের মাসে ভারত গভর্নমেন্টের অর্থ-

বিষয়ক সদস্য করিয়া স্যার বেসিল ব্ল্যাকেটকে ভারতে পাঠানো হইল। ভারতে প্রতিক্রিয়ার স্রোত ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। যে ভারতীয় উদার-পন্থী নেতাগণ শ্রীযুক্ত মন্টেগুর প্রভাবে শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করিতে ও মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের অবস্থা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিতেছে। মার্চ মাসে মন্টেগুর পদত্যাগের পর ইতিমধ্যেই এপ্রিল মাসে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ হইতে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু পদত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি যখন অসহনীয় হইয়া উঠে তখন যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পদত্যাগ করেন। সারা ১৯২২ সালের মধ্যে গভর্নমেন্টের কেবলমাত্র ভদ্র কার্যাবলী ছিল বাঙলায় মেদিনীপুর জেলায় জনগণের ও পাঞ্জাবে আকালী শিখদিগের দাবীগুলি মানিয়া লওয়া। মেদিনী-পুরে নূতন যে পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে কর-বন্ধ আন্দোলন সুরু হইয়াছিল উহা প্রত্যাহৃত হয়, এবং পাঞ্জাবে একটি নূতন আইন পাস হওয়ার ফলে শিখ মন্দিরগুলি মোহান্তদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জনগণের কমিটিগুলির হস্তে অর্পণ করা হয়।

আমাদের কাহিনীতে আপাততঃ ছেদ টানিয়া ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দ কি করিতেছিলেন এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৯২১ সালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, লালা লাজপৎ রায় ও তাঁহার প্রধান প্রধান সহকর্মি-গণের অধিকাংশকেই পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির এক সভায় পুলিস ঘেরাও করে। কয়েক দিন পরে, দেশবন্ধু দাশ ও তাঁহার সহকর্মীদের অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করা হইল: বাঙলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। ইহার পরে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও যুক্ত-প্রদেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবক কারারুদ্ধ হইলেন। অসহযোগের নিয়মানুসারে, কোনও কংগ্রেসীই বৃটিশ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেন না। কাজেই, সর্বত্রই মামলা চালানো সহজ কাজ ছিল। অধিকাংশ বিচারই কয়েক মিনিটের বেশী স্থায়ী হইত না এবং একই ম্যাজিস্ট্রেট শত শত মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এক বিকালের মধ্যে। যাহা হউক, দেশবন্ধু দাশের ক্ষেত্রে দুই মাস ধরিয়া বিচার চলিয়াছিল এবং যেহেতু শ্রীযুক্ত শাসমল ও আমাকে ঐ একই মামলায় তাঁহার সঙ্গে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল সেজন্য মামলায় অকারণ বিলম্বের যন্ত্রণা আমাদেরও ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে খোলাখুলিভাবে এরূপ আলোচনা হইত যে, দেশবন্ধুর যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল তাহাতে আইনের কোন দোহাই না দেখাইয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে ম্যাজিস্ট্রেট চাহেন নাই। অতএব, তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মামলা সাজানোর জন্য মামলার সময়

সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিতে বার বার সময় দেওয়া হইয়াছিল। মামলা সাজানো হইয়াছিল কয়েকটি বিজ্ঞপ্তির উপর, যেগুলিতে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছিল; সকল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে অবৈধ বলিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে, ঐ সকল বিজ্ঞপ্তিতে, সেই সরকারী ঘোষণাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছিল। যাঁহারা বাঙলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা জানিতেন যে, বাস্তবিক পক্ষে, তিনি এই সকল বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন নাই। তথাপি, সরকারী হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য দেন যে, স্বাক্ষরগুলি যথার্থই দেশবন্ধুর এবং এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যবলে তিনি অভিযুক্ত ও ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার বিচারের শেষের দিকে আদালতে এক বিবৃতি দিয়া তিনি এই সকল বেআইনী কার্যকলাপ এবং তাঁহার গ্রেপ্তার সম্বন্ধীয় আর সকল অবৈধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গভর্নমেন্ট কখনও আইন ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। রায়দানের পূর্বে, মামলাকারীদের পক্ষ হইতে এই বলিয়া এক বার্তা পাঠানো হইয়াছিল যে, যদি তিনি আইন অমান্য বন্ধ রাখা সম্বন্ধে বারদোলী প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তি দিবেন, কিন্তু তিনি এরূপ কোনও প্রস্তাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন।

দণ্ডিত হইবার পর শীঘ্রই আমাদের কলিকাতায় আর একটা বন্দীশালা, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হইল, যেখানে বাঙলার সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইবার আমরা সুযোগ পাইলাম। সংখ্যায় অল্প মহাত্মার গোঁড়া ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আর সকলের মধ্যে বারদোলীর সিদ্ধান্তে একটা অসন্তোষের ভাব ছিল। যেহেতু মহাত্মা ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা এবং তাঁহার অনুরোধেই বারদোলী প্রস্তাব লওয়া হইয়াছিল, সেজন্য বিশেষ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। বারদোলীর পশ্চাদপসরণকে একটি অনিবার্য ঘটনারূপে মানিয়া লইয়া দেশবন্ধু কৌশল পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণের উৎসাহ আর একবার জাগাইয়া তুলিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিলেন। এইসূত্রে আইনসভার মধ্যে তিনি তাঁহার অসহযোগের পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিলেন। এই পরিকল্পনানুসারে, কংগ্রেসীরা নির্বাচনকে বর্জন না করিয়া প্রার্থিরূপে নির্বাচনে দাঁড়াইবেন এবং নির্বাচিত আসনগুলি দখল করার পর গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার জন্য অপরিবর্তনীয় দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন একটি নীতি চালাইয়া যাইবেন। ১৯২০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে আইনসভা বর্জনের যে কল্পনা করা হইয়াছিল উহা ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদিগণ

আইনসভা হইতে দূরে থাকায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল সভা দখল করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তি দেশে জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য না করিয়া গভর্নমেন্টের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাহায্যের মধ্য দিয়া গভর্নমেন্ট জগৎসভায় প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ——— দমননীতিতে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যাদিগের সমর্থন আছে। দেশবন্ধুর মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে শত্রুকে কোনও দিক দিয়া সুবিধা দিতে নাই। অতএব কংগ্রেসীদের উচিত আইনসভার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল জন-সংস্থাসমূহের (যথা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) নির্বাচিত আসনগুলি দখল করা। যেখানে সত্যই কোনও গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ আছে, সেখানে তাহা তাঁহারা করিতে পারেন; না পারিলে তাঁহারা অন্ততঃ ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বাধাদানের দ্বারা গভর্নমেন্টের সদস্য অনুচরদিগকে ক্ষতিকর কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। অধিকন্তু, নির্বাচনী অভিযান কংগ্রেসকে সারা দেশে একযোগে নিজের প্রচার চালাইবার সুযোগ ও সুবিধা দিবে। এই নূতন নীতি গ্রহণের অর্থ এই ছিল না যে, কংগ্রেসের অন্যান্য কার্যাদির কোনও একটিকে তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইবে; বরং আইনসভা ও জনসংস্থাসমূহে নির্বাচিত আসনগুলি দখল করিয়া কার্যসূচীর সম্প্রসারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দিনের পর দিন এই নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সক্রিয় আলোচনা চালানো হইল। শীঘ্রই ইহা প্রতীয়মান হইল যে, আলোচনায় বিরোধীপক্ষের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, ১৯১৯-এর গভর্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে আইনসভার মধ্যে কার্যকরী বিরোধিতার কোনও সুযোগ নাই। ইংরাজদিগের এবং গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য সদস্যের উপস্থিতির ফলে কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কি প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যাদিগের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব না হইলেও কঠিন ছিল। অধিকন্তু, পূর্বোক্তটির ক্ষেত্রে বড়লাট এবং পরোক্তটির ক্ষেত্রে গভর্নরদিগের না-মঞ্জুর ও সুপারিশ করার ক্ষমতা ছিল, যদ্দ্বারা তাঁহারা আইনসভাগুলির সিদ্ধান্ত সর্বদাই বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ইহার জবাব ছিল এই যে, নির্বাচিত সদস্যগণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হন, তাঁহারা গভর্নমেন্টকে অনবরত বাধাদানের দ্বারা আইনসভাগুলির বাহিরের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে অন্ততঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া নির্বাচিত সদস্যগণের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং যদি বড়লাট কিংবা গভর্নর কোনও আইনসভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করিয়া দেন তাহা হইলে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে—উভয়ত্রই জনমতের বিচারে গভর্নমেন্ট নিন্দিত হইবেন। সর্বশেষে, প্রচলিত শাসনতন্ত্র

অনুযায়ী, মন্ত্রীদের কিংবা তাঁহাদের দপ্তরগুলির বিরুদ্ধে একটি ভোটকেও কোনও প্রদেশের গভর্নর অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, এবং প্রাদেশিক আইনসভা মন্ত্রীদের বেতনের বিরুদ্ধে যদি ভোট দেন তাহা হইলে তাঁহারা আপনা হইতেই গদীচ্যুত হইবেন এবং দ্বৈতশাসন সংক্রান্ত সংবিধানের প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই আলোচনা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবার সময় আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে দুইটি দল দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের 'স্বরাজ' ও 'পরিবর্তন-বিরোধী' দলগুলির প্রাণশক্তিরূপে তাঁহারা নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে বাঙ্গলায় কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন তথা 'প্রাদেশিক সম্মেলন' চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হইল। গত বৎসরের আন্দোলনে দেশবন্ধুর পত্নীর সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তিনি তাঁহার সভানেত্রীর ভাষণে বলেন যে, কংগ্রেসকে কৌশল পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করিতে হইতে পারে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইনসভার ভিতর অসহযোগের নীতিকে বিবেচনাযোগ্য বলিয়া প্রস্তাব করেন। কে তাঁহার এই ভাষণে প্রেরণা যোগাইয়াছেন ইহা অনুমান করা কঠিন ছিল না এবং ইহাকে তাঁহার স্বামীর অনুপ্রাণিত মত সংগ্রহের একটি কৌশলপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে ধরিয়া লইয়া অচিরেই সারা দেশে বিতর্কের ঝড় সুরু হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মহাত্মা তাঁহার গ্রেপ্তারের পূর্বে যে পরিকল্পনা নির্দেশ করিয়াছেন উহা হইতে কোনও বিচ্যুতির প্রশ্ন তাঁহার গোঁড়া ভক্তেরা বিবেচনা করিবেন না এবং কংগ্রেস কর্তৃক এই নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বে তীব্র লড়াই হইবে। এই সম্ভবনা আমাদিগকে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং আমাদের উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিল। জেলের মধ্যে দেশবন্ধু প্রায়ই তাঁহার সমর্থকদিগের সহিত আলোচনা করিতেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মধারার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতেন। যে সকল ব্যবস্থা তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল ইংরাজী ও মাতৃভাষায় দৈনিক পত্র বাহির করা—এবং এই জল্পনা-কল্পনা হইতেই তাঁহার **ফরোয়ার্ড** পত্রিকার জন্ম হয়, যেটি ১৯২৩ সালে সুরু করা হয় এবং অনতিকাল মধ্যেই ভারতে প্রধান প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির অন্যতম হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করে।

১৯২২ সাল ব্যাপিয়া ভারতে বহু জেলে রাজবন্দী ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ঘটে। ব্যাপারটা চরমে উঠে বাঙ্গলার দুইটি জেলে—বরিশাল ও ফরিদপুরে। এই সকল জেলে রাজবন্দীরা কর্তৃপক্ষের নিকট ভদ্র ব্যবহার দাবী করেন এবং ভারতীয় জেলগুলিতে বন্দীদের প্রতি সাধারণতঃ যে অপমানকর ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জানান।

কর্তৃপক্ষগণ ছিলেন একগুঁয়ে এবং তাঁহারা বেত্রচালনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও রাজবন্দীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে অসমর্থ হন। ইত্যবসরে, বেত্রচালনার সংবাদে জনগণের ক্ষোভ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। এমন কি, অতি অনুগত বঙ্গীয় আইন পরিষদও তৎপরতা দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং গভর্নমেন্টের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। জেলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আব্দার রহিম রাজবন্দীদের প্রতি বেত্রচালনা অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার যুক্তিতে গভর্নমেন্টকে সম্মত করাইতে ব্যর্থ হন। প্রতিবাদস্বরূপ, তিনি কারাদপ্তরের পদ ত্যাগ করেন যাহা বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার হিউ স্টিফেনসন গ্রহণ করেন।

মার্চে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তাঁহারা, 'আইন অমান্য তদন্ত কমিটি' নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশ ঘুরিয়া আইন অমান্য পুনরায় সুরু করার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এই কমিটির সদস্যাদিগের মধ্যে সাধারণ মনোভাব ছিল যে, খুব শীঘ্র আইন অমান্য সুরু করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে প্রশ্ন স্থির করা কঠিন ছিল তাহা হইল ইতিমধ্যে কংগ্রেস কি করিবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ চালাইয়াই কি কংগ্রেস সন্তুষ্ট থাকিবে, না দেশবন্ধু কর্তৃক প্রস্তাবিত নূতন পরিকল্পনা ইহা গ্রহণ করিবে? কমিটি দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া কয়েক মাস পরে একটি রিপোর্ট দাখিল করিল। সিদ্ধান্তের দিক হইতে কমিটির সদস্যগণ সমান দুই দলে ভাগ হইয়া গেলেন। আইনসভায় প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধু পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ (দিল্লী), পণ্ডিত মতিলাল নেহরু (এলাহাবাদ) ও শ্রীযুক্ত বীঠলভাই জে. প্যাটেল (বোম্বাই); এবং ডাঃ এম. এ. আন্সারী[১] (দিল্লী), শ্রীযুক্ত কে. আর. আয়েঙ্গার (মাদ্রাজ) ও শ্রীযুক্ত সি. রাজাগোপালাচারী (মাদ্রাজ) ইহার বিরুদ্ধে। দেশবন্ধু দাশের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের অল্প কিছুদিন পূর্বে রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ায় তিনি জোর পাইয়াছিলেন।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি উত্তর বাঙ্গলার জেলাগুলিতে অকস্মাৎ বন্যা হইল। যদিও বর্তমান ভারতে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে, ব্যাপকতার দিক হইতে ১৯২২ সালের বন্যা ছিল অভূতপূর্ব। বাঙ্গলার চারটি বড় জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; শস্য নষ্ট হয়, বাড়িঘর ভাসিয়া যায় এবং বহু গবাদি পশু মারা পড়ে। বন্যার ফলে কিছু প্রাণহানিও ঘটে। সমগ্র গ্রামাঞ্চল বিশাল এক জলাশয়ে পরিণত হয়। সারা প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলি সঙ্গে

---

[১] এই পরিপ্রেক্ষিতে, ডাঃ আন্সারী যে ১৯৩৪ সালে আইন পরিষদে ঢুকিবার প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদিগের একজন হইবেন, ইহা বিস্ময়কর।

সঙ্গে সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেয় এবং ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্যে প্রথম যে দলটি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পৌঁছায় ঐ দলে আমি ছিলাম। বিখ্যাত রসায়নবিদ ও ত্রাণ সমিতির সভাপতি স্যার পি. সি. রায়ের প্রয়াস এবং জনসাধারণের বদান্যতার ফলে বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও পশুখাদ্যের (গবাদি পশুর জন্য) বিরাট অবদান ছাড়াও ৪০০,০০০ টাকারও অধিক একটি তহবিল গড়িয়া তোলা হয়। এই উপলক্ষে বাঙলা গভর্নমেন্ট ২০,০০০ টাকা দান করেন এবং গভর্নমেন্টের এই কার্পণ্যকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য বর্ধমানের মহারাজা বলেন যে, গভর্নমেন্ট কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। গভর্নমেন্টের কোনও সাহায্য না পাইয়াও, জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণকার্য এরূপ সফল হইয়াছিল যে, উহাতে কংগ্রেসের সম্মান অনেক বাড়িয়া যায়; ঐ সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানতঃ ছিল কংগ্রেসের সদস্যগণের। বস্তুতঃ, আমাদের সৌভাগ্য, বাঙলার গভর্নর লর্ড লিটন যখন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাজের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই অবধি, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ত্রাণকার্য সংগঠনে কংগ্রেস সর্বদাই একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

আগস্ট ও ডিসেম্বরের মধ্যে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হইল দেশবন্ধু দাশের সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা। তিনি তাঁহার সভাপতির ভাষণে এই মর্মে হৃদয়গ্রাহী একটি ঘোষণা করেন যে, যে স্বরাজ লাভের জন্য তিনি প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন উহা কোন এক শ্রেণীর জন্য নহে—পরন্তু জনতার জন্য, যাহারা জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ। এই সভার পূর্বে ও পরে, তিনি সর্বদাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গভীর আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং কিছুকাল জামসেদপুরে টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানীর শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। অন্য ঘটনাটি ছিল কলিকাতায় ইয়ং মেন্‌স কনফারেন্সের সভা, যাহা এই প্রদেশে যুব আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। এই সম্মেলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুবসমাজের নিজস্ব একটি আন্দোলন ও সংগঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিল।

নভেম্বরের শেষ দিকে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা হয়; তথায় দেশবন্ধু ও মহাত্মার সমর্থকদিগের মধ্যে একটি শক্তি পরীক্ষা হইল। ইহা ছিল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের ভূমিকাস্বরূপ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তেজনাকর আবহাওয়ার মধ্যে গয়াতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন বসিল। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, শ্রীযুক্ত দাশের পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সময়ে কেহ বলিতে পারেন নাই, ভোট কিরূপ হইবে। যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট ছিল যে, শ্রীযুক্ত দাশ সকল প্রদেশ হইতেই, বিশেষতঃ বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র

(বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অংশ) হইতে প্রভাবশালী সমর্থক পাইবেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে তুমুল বিতর্কের পর বিষয়টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভোটের জন্য উপস্থাপিত হইল। মাদ্রাজের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার,—যিনি মাদ্রাজের আইন ব্যবসায়ীদের নেতা ছিলেন এবং মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন, তিনি এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিলেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কিন্তু আইনসভার ভিতরে কাজে অংশগ্রহণ করিবেন না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মূল ভোটগ্রহণ চলিল এবং মহাত্মার সমর্থকগণ বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। তাঁহাদের উল্লাস প্রবল আকার ধারণ করিল এবং ঐ দিনের জয়গৌরব লাভ করিলেন মাদ্রাজের নেতা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, যিনি গান্ধীবাদের প্রতিভূ হিসাবে কংগ্রেসের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দাশ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়িলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি, কিন্তু তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মধারা স্থির করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমর্থকদিগের একটি সভা ডাকিলেন। স্থির হইল, কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে তাঁহার দল গঠন করিবেন। পরদিন যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আগামী বৎসরের, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের জন্য কর্মসূচী স্থির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হইল তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দল গঠন সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘোষণা একটি অপ্রত্যাশিত আঘাতরূপে আসিল এবং মহাত্মার সমর্থকদিগের হর্ষোৎফুল্ল মুখে ছায়াপাত করিল। অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন দেশবন্ধুর পক্ষে এবং তাঁহাদের বাদ দিলে যে কংগ্রেসের শক্তি ও গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রথম ঘোষণার সমর্থনে শ্রীযুক্ত দাশ অধিবেশনের অন্তিম ভাষণে তাঁহার সভাপতির পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন; কারণ, তাঁহার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য দেশকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে গৃহীত প্রস্তাব-গুলির বিরুদ্ধে কাজ করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সমর্থকগণ তাঁহাদের জয়ে সন্তুষ্ট হইয়া গয়া ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু যে ফাটল ঘটিয়া গিয়াছে তজ্জন্য আনন্দিত হইতে পারিলেন না। স্বরাজ্যপন্থীরা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়ার দৃঢ়-সংকল্প লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৪

স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ (১৯২৩)

স্বরাজ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের জন্য কঠিন এক কর্মসূচী লইয়া গয়া হইতে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন। সাধারণভাবে ইহা স্থির হইয়াছিল যে,—বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে দেশবন্ধু দাশ—উত্তর ভারতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল প্রচার চালাইবেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি মোটের উপর স্বরাজ্যপন্থীদের বিরোধী ছিল। সেজন্য স্বরাজ্যপন্থীদের প্রচারের মাধ্যম হিসাবে প্রধানতঃ বক্তৃতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় আমরা আমাদের প্রচারের সুবিধার জন্য **বাঙলার কথা** নামে চার পৃষ্ঠার একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং নেতার আদেশে আমাকে রাতারাতি সম্পাদক হইতে হইয়াছিল। মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, যিনি পরে **হিন্দুর** সম্পাদক হইয়াছিলেন, খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তামিল দৈনিকপত্র **স্বদেশমিত্রম্** স্বরাজ্যপন্থীদের নীতির ব্যাখ্যাকার হইয়া উঠিল এবং আমাদের প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি ঐ একই নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকও বাহির করিলেন। পুণাতে অত্যন্ত প্রভাবশালী মারাঠী পত্রিকা **কেশরী** আমাদের আদর্শের প্রচারক হইয়া দাঁড়াইল। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর **কেশরীর** সম্পাদক হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কেলকার এবং যেহেতু তিনি স্বরাজ্য দলের একান্ত সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার **কেশরী** পত্রিকার সমস্ত সম্বল দলের কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু যখন বাঙলায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অবস্থা যথেষ্ট দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা ঐ সময় 'পরিবর্তন-বিরোধী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের চালু পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর যে কোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। আমরা যখন প্রথম আমাদের সমর্থকদের অবস্থা বিচার করিলাম তখন দেখিলাম যে, সংখ্যায় আমরা কম। কংগ্রেস সরকারীভাবে যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিয়াছিলাম বলিয়া প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। তথাপি, আমরা ছিলাম শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একদল কর্মী এবং অপরিসীম উৎসাহ লইয়া আমাদের কাজে

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমরা যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম সেগুলির মধ্যে একটি ছিল সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলির ঘন ঘন সভা ডাকিয়া গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন দাবী করা। প্রথম প্রথম এরূপ সভায় আমাদের দল পরাজিত হইত কিন্তু ক্রমশঃই আমরা আগাইয়া চলিলাম এবং আমাদের দল কোন একটি স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হইলে ঐ সংবাদ অন্যান্য স্থানে আমাদের সহকর্মিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

সারা ভারতে প্রাথমিক প্রচার চালাইবার পর মার্চ মাসে এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর গৃহে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র ও আন্দোলনের পরিকল্পনা রচিত হয়। গঠনতন্ত্র লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন স্বরাজ্য দলের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। দলের লক্ষ্য কি হইবে—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা? এই প্রশ্নে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র স্পষ্ট ছিল না। তাহাতে কেবল বলা হইয়াছিল যে, স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য কিন্তু স্বরাজ বলিতে কি বুঝায় উহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। যেহেতু স্বরাজ্য দল ছিল অধিকতর বাস্তববাদী সেজন্য স্বরাজের প্রকৃত অর্থ ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হয় নাই, কারণ স্বরাজ্য-পন্থীদের মধ্যে দুইটি দল হইয়া গিয়াছিল। অতএব আপোষ হিসাবে গঠনতন্ত্রে ইহা ঘোষণা করা স্থির হইল যে, দলের 'আশু' লক্ষ্য হইতেছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। এইরূপে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বের সাময়িক একটি মীমাংসা হইল।

স্বরাজ্যপন্থীদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর শ্রীযুক্ত দাশ দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই কাজ অতীব কষ্টসাধ্য ছিল। সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী গান্ধীবাদের ঘাঁটিগুলির অন্যতম ছিল এবং শ্রীযুক্ত দাশ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ ঘাঁটিকেই প্রথম অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন। দক্ষিণ ভারতে গরমের প্রচণ্ড দাহ সত্ত্বেও তাঁহার এই ভ্রমণ খুবই সফল হইয়াছিল। সেখানে তাঁহার এই সাফল্যের পরোক্ষ ফল দেশের অন্যান্য অংশে দেখা গেল। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বাঙলায় প্রচারকার্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন, যাহার ফল খুব ভাল হইল। প্রায় এই সময়েই দল স্থির করিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঘন ঘন সভা দাবী করা। পর পর প্রত্যেকটি সভায় দেখা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের ভোট বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি এরূপ অগ্রগতি হইয়াছিল যে, 'পরিবর্তন-বিরোধীদের' লইয়া সম্পূর্ণতঃ যে কার্য-নির্বাহক সমিতি (কংগ্রেসের কর্মপরিষদ) গঠিত হইয়াছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উহার আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রহিল না এবং সেজন্য

উহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। তবে যেমন 'পরিবর্তন-বিরোধিগণ' পদাধিকারের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন না, তেমনি ছিল না স্বরাজ্য দল। সুতরাং একটি তৃতীয় দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল; উপযুক্ত কোনও নামের অভাবে উহাকে 'মধ্যবর্তী দল' বলা যাইতে পারে। স্বরাজ্যপন্থীদের পরিকল্পনা এই দল গ্রহণ করিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা কট্টর গান্ধীবাদীও ছিলেন না। কংগ্রেসের দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে কোন এক প্রকার মিটমাটের কথা তাঁহারা তুলিলেন। ঐ একই সময়ে বাঙলায়ও 'পরিবর্তন-বিরোধি'গণ পরাজিত হইলেন এবং বাঙলা কংগ্রেস কমিটিতে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রভাবাধীন মধ্যবর্তী দল কার্যভার গ্রহণ করিল। এই ব্যবস্থায় বাঙলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। কিন্তু প্রাক্তন সম্পাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কর্মভার ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। অতএব, দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটি যুগপৎ কাজ করিতে লাগিল, প্রত্যেক কমিটিই নিজেকে প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা বলিয়া দাবী করিল। কার্যনির্বাহক সমিতি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া দিবার পূর্বে কয়েক মাস কাটিয়া গেল; তাহার পর মৌলানা আক্রাম খাঁ যে কমিটির সভাপতি ছিলেন উহার অনুকূলে রায় দেওয়া হইল।

অধিকাংশ প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙলায়, যদিও দুইটি দলের লক্ষ্য ছিল এক, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতালাভ, তবু তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ায় বিবদমান দলগুলির মধ্যে কিরূপে কোনও প্রকারের একটি আপোষ ঘটানো যায় এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কংগ্রেসসেবিগণ গভীরভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব আসিল। এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর সমর্থকদিগের স্বার্থবিরোধী ছিল, কারণ স্বরাজ্যপন্থিগণ নিঃসন্দেহে দিল্লী কংগ্রেসে পুনরায় তাঁহাদের পরিকল্পনা উত্থাপন করিবেন এবং গয়ার তুলনায় তাঁহাদের জয়ের সম্ভাবনা অধিক হইবে। বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদিগের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁহার সভাপতির ভাষণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি সমর্থন করেন।

দিল্লী কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন পূর্বে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ ও অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত নেতা ডাঃ কিচলু জেল হইতে ছাড়া পান। তাঁহাদের উপস্থিতিকে 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল স্বাগত জানান, যাঁহাদের নীতি ও কর্মসূচী তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন। তথাপি, স্বরাজ্যপন্থীদের এতই অগ্রগতি হইয়াছিল যে:

তাঁহাদিগকে কোনও বাধা দেওয়াই আর সম্ভব ছিল না। বিরাট এক প্রতিনিধি দলের নেতারূপে দেশবন্ধু দাশ কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অবস্থার গতি ঘুরাইয়া দিতে বাঙ্গলার ভোটগুলি সাহায্য করিয়াছিল। যে মুহূর্তে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের জয়ের দিন আসিয়া গিয়াছে, তখনই 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল আপোষ করিতে সম্মত হইল। উপরন্তু, মৌলানা মহম্মদ আলি এরূপ দাবী করিলেন যে, তিনি মহাত্মার নিকট হইতে কয়েকটি গোপনবার্তা (যেগুলিকে তিনি 'বেতারবার্তা' বলিয়াছিলেন) পাইয়াছেন: এবং তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে একটি মিটমাট করিয়া দিতে বলিয়াছেন। অতএব, বেশী বাদ-বিতণ্ডা না করিয়া ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই মর্মে একটি আপোষ-প্রস্তাব পাস হইয়া গেল যে, আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া আইনসভার মধ্যে অনমনীয় দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্নভাবে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা চালাইয়া যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সদস্যদিগকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে, তবে সাংগঠনিক দিক হইতে কংগ্রেসের এই ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব থাকিবে না।

স্বরাজ্যপন্থীরা অতি আনন্দে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। নয় মাস প্রতিকূলতার মধ্যে কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ও যথেষ্ট অখ্যাতির সম্মুখীন হইয়াও তাঁহাদের জয় হইল। কিন্তু তাঁহাদের কালক্ষেপ করিলে চলিবে না। আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য মাত্র দুই মাস সময় তাঁহাদের ছিল। উপরন্তু, এক তীব্র সংগ্রাম তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

যাহা হউক, সাহসিকতায় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। স্বরাজ্যপন্থীদের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইল। পূর্বাভাষ আশাপ্রদ না হইলেও তাঁহারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের ফল চমৎকার হইয়াছিল এবং স্বরাজ্যপন্থিগণ বাধা দানের কৌশলের দ্বারা যে স্থানীয় আইন পরিষদের কাজ অচল করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন ইহা স্পষ্ট ছিল। বাঙ্গলার নির্বাচনী ফলাফলও উৎসাহজনক হইয়াছিল এবং ভারতীয় আইন সভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শক্তিশালী একটি দল নির্বাচিত হয়। পারস্পারিক বুঝাপড়ায় এরূপ ব্যবস্থা যে, আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বরাজ্যদলের নেতৃত্ব করিবেন, এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদে লনেতা হইবেন দেশবন্ধু; সেখানে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশান্বিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত আসনগুলি দখল করায় স্বরাজ্যপন্থীদের সাফল্যের পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহাদের অনুরূপ সাফল্য ঘটে। ১৯২৩ সালে যুক্তপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির

(মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পরিচালনায় স্বরাজ্য দল ঐ প্রদেশে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে; এবং তাহার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির মধ্যে অনেকগুলিই স্বরাজ্যপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যপন্থীদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। দিল্লীতে জয়লাভের পর কালবিলম্ব না করিয়া দেশবন্ধু অক্টোবর মাসে কলিকাতায় তাঁহার দৈনিক পত্রিকা **ফরোয়ার্ড** বাহির করেন। পত্রিকাটির সংগঠকদিগের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হওয়ায় পত্রিকা সংগঠনের ভার আমার উপর আসিয়া পড়ে। পত্রিকাটি চালাইতে গিয়া আমাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও দ্রুত সাফল্য হইয়াছিল এবং পত্রিকাটির অগ্রগতি দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। অল্পদিনেই দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ফরোয়ার্ড একটি প্রধান স্থান অধিকার করিল। ইহার প্রবন্ধগুলি ছিল জোরদার, বিবিধ ও হালের খবর ইহাতে পরিবেশিত হইত এবং গোপন সরকারী সংবাদ আবিষ্কার করিয়া ফাঁস করিয়া দেওয়ার কৌশলে পত্রিকাটির বিশেষ এক দক্ষতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৩ সাল ব্যাপিয়া আন্দোলন ছিল মোটের উপর নিয়মতান্ত্রিক; নাগপুরে আইন অমান্য (কিংবা সত্যাগ্রহ) আন্দোলন ইহার ব্যতিক্রম। নাগপুরের কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও রাস্তা দিয়া জাতীয় যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ পতাকা নিষিদ্ধ এলাকায় বহু শোভাযাত্রা প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া এই আন্দোলন চলিল এবং বিপুল সংখ্যক লোক কারারুদ্ধ হইল। শীঘ্রই এই প্রশ্নটি সর্বভারতীয় এক প্রশ্ন হইয়া উঠিল, কারণ সংশ্লিষ্ট আদেশটিকে জাতীয় পতাকার প্রতি অপমান বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং ঐ আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণের জন্য দেশের সকল প্রান্ত হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত, গভর্নমেন্ট হাউসে সুবুদ্ধির উদয় হইল এবং একটি আপোষে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল, যদ্দ্বারা এ-বিষয়ে জনগণের দাবী বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ হইল। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আন্দোলন—নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ অভিযানরূপে যাহা সাধারণতঃ পরিচিত—গোঁড়া গান্ধীবাদীদের দ্বারা তাহা পরিচালিত হইয়াছিল; তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, গান্ধীর পথ অচল হইয়া যায় নাই এবং দেশকে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে উহা তখনও উপযুক্ত পথ।

১৯২৩ সালে যে সময়ে স্বরাজ্যপন্থিগণ গোঁড়া গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৎসরেই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আর একটি বিদ্রোহের জন্ম হয়, যাহা পরবর্তীকালে অধিকতর গুরুত্ব

লাভ করে। গান্ধীর আদর্শবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের[১] নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। তাঁহাদের নিজেদের একটি ক্লাব ছিল এবং সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য তাঁহারা সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র যাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহারা তখন লাভ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল। তাঁহারা শীঘ্রই বোম্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং অল্প কয়েক বৎসরেই ভারতে তাঁহারা কমিউনিস্টদের প্রথম দল হইয়া উঠিলেন। বোম্বাইয়ের অনুসরণে কিছুকাল পরে বাঙ্গলায় 'শ্রমিক ও কৃষক দল' নামে অনুরূপ একটি দল গড়িয়া উঠিল—কিন্তু বোম্বাইয়ের দলের মত গুরুত্ব অর্জন করা বা অগ্রগতি করা ইহার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় করা শক্ত নহে। বাঙ্গলাদেশ, কলিকাতা যাহার একাধারে প্রাণকেন্দ্র ও চিন্তার উৎস, বহুকাল অবধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটি। সেখানে প্রভাবশালী ও স্বদেশপ্রেমিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরন্তু, বোম্বাইয়ের মত বাঙ্গলায় দেশীয় প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণী নাই। সুতরাং, বোম্বাইয়ে যেরূপ তীব্র আকারে শ্রেণী-বৈষম্য প্রকট হইয়াছে, বাঙ্গলায় সেরূপ কখনও হয় নাই। বাঙ্গলায় সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কিংবা প্রভাবশালী বোম্বাইয়ে তেমন নয় এবং বাঙ্গলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সেখানে জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বোম্বাইয়ে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ যে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদের দিকে যাইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অপর পক্ষে, বাঙ্গলায় গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাম্যবাদ অপেক্ষা বৈপ্লবিক দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল। 'বাঙ্গলার পরিস্থিতি' সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়টি বিচার করিব।

পূর্ব পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২২ সালের মার্চ মাসে যখন শ্রীযুক্ত মন্টেগু মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন তখন ইংলন্ড ও ভারত—উভয়ত্রই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রাধান্য বিস্তারলাভ করে। শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জের সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচন হয়, যাহাতে রক্ষণশীলগণ ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বরে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারত গভর্নমেন্টের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে যে সকল কাজ করেন সেগুলির মধ্যে একটি হইল

[১] ১৯২৫ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় এবং ১৯৩৩ সালে পুনরায় মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় প্রায় চার বৎসর বিচার চলিবার পর শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রথম বাজেটে লবণ-কর দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া। এখন ভারতে লবণ-কর স্বাভাবিকভাবেই জনগণের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—অংশতঃ এই কারণে যে, প্রকৃতি যে ভূমি অথবা জল তাহাদের দিয়াছে তাহা হইতে লবণ তৈয়ারী করিতে আইনের অজুহাতে তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া হয়, এবং আরও এই কারণে যে দরিদ্রের প্রতি এই লবণ-কর চরম আঘাত হানিয়াছে। সুতরাং, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক এই লবণ-কর দ্বিগুণ করা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর আর কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না। ভারতীয় আইনসভা সংগে সংগেই অর্থমন্ত্রীর এই ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু বড়লাট লর্ড রেডিং তাঁহার সুপারিশের ক্ষমতাবলে তেমনি তৎপরতার সহিত ইহাকে জারী করেন। জুন মাসে গভর্নমেন্ট লী কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া আরও একটি অন্যায় করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব-ভারতীয় চাকুরীতে যে সকল ইংরাজদিগকে প্রধানতঃ সুযোগ দেওয়া হইত তাহাদের মর্যাদা, অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা। সেই সময়ে প্রত্যেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই কমিশন নিয়োগের একমাত্র ফল হইবে ভারতে ইংরাজদিগের বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধি করা।[১] এইরূপে গভর্নমেন্ট একদিকে যখন ইংরাজদিগকে খুশী করিতে ব্যয় আরও বাড়াইবার জন্য তৎপর হইলেন—অন্যপক্ষে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাসে তাঁহাদের অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল, যদিও ইঞ্চকেপ কমিটি[১]এ-বিষয়ে[২] কয়েকটি ভাল সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা ছাড়াও, ভারত গভর্নমেন্ট সেই সময়ে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহার কঠোর সমালোচনা হইয়াছিল এবং যাহা দেশের কোনও কোনও অংশে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা হইল নভার মহারাজকে তাঁহার গদী (কিংবা Throne) হইতে অপসারণ করা। যদিও গভর্নমেন্ট তাঁহাদের কার্যকে সংগত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মহারাজার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আনিয়াছিলেন—তথাপি দেশে জনগণের মনোভাব ছিল এই যে, ভারতে মহারাজগণ সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা এই মহারাজা ভালও নহেন, আবার মন্দও নহেন এবং তাঁহাকে গদীচ্যুত করা হইয়াছে সম্পূর্ণতঃ এই কারণে যে, তিনি তাঁহার জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন। যেহেতু মহারাজা একজন শিখ ছিলেন এবং আকালী আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি পোষণ করিতেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল,

[১] লী কমিশন রিপোর্ট পেশ করিবার পর ভারত গভর্ণমেন্ট যখন বেহিসাবীর মত ইহার সুপারিশগুলি কার্যকর করেন তখন এই আশঙ্কা পুরাপুরি সংগত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

[২] অর্থনীতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিত্বে একটা ছাঁটাই কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন।

সেজন্য তাঁহার গদীচ্যুতিতে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।

সরকারী মহলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিলেন এবং স্বরাজ্যপন্থিগণ আমলাতন্ত্রের ঘাঁটির উপর বিরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন,—জাতীয়তাবাদীদিগকে বাদ দিয়াও—ভারতীয় আইনসভা শান্ত কিংবা নিষ্ক্রিয় ছিল না। ঐ বৎসরে শাসনতন্ত্রের দ্রুত উন্নতি-'বিধানের দাবী জানাইয়া দুই বার প্রস্তাব পাস হয়। অধিকন্তু, আইনসভার কার্যকালের শেষের দিকে একটি পারম্পর্য আইন পাস হয়, যাহা ডাঃ (বর্তমানে স্যার) হরি সিং গৌর উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সকল রাজ্য ও উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের সমানাধিকার দেওয়া হইত না এবং যে সকল দেশে ভারতীয়দের উপর বিধি-নিষেধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহাদের ভারতস্থ অধিবাসীদের উপর একই রূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা,—ভারতীয়দের যেরূপ সেই সকল দেশে ভোগ করিতে হইত। আফ্রিকায় বৃটিশের উপনিবেশ কেনিয়ার ভারতীয়দের প্রতি যে পরিমাণ অবিচার করা হইত তাহারই ফল হইয়াছিল এই আইন। কেনিয়ায়, যেখানে ভারতীয় অধিবাসিগণ শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা ৩:১ হারে অধিক ছিলেন, সেখানে শ্বেতাঙ্গেরা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বলপূর্বক দখল করিয়া ভারতীয়দের একেবারে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কেনিয়া আইনসভায় তাঁহারা একুশ বৎসরের ঊর্ধ্বে সকল শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে ভোটাধিকার দান করিয়া একটি আইন পাস করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় বাসিন্দাদিগকে ভোটাধিকার দিতে চাহেন নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দিয়া তাঁহাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন কারণ ইহার দ্বারা তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন। কেনিয়ার ভারতীয়গণ সাহায্যের জন্য ভারতের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে ইংলন্ডে হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী[১] এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ইন্ডিয়া অফিস ও ঔপনিবেশিক দপ্তরের মধ্যে মোটামুটি সন্তোষজনক এক বুঝাপড়া হইয়াছিল—যাহাকে উড-উইন্টারটন[২] চুক্তি বলা হয়;

[১] শ্রীযুক্ত গোখেলের মৃত্যুর পর সারভেন্টস্ অব ইন্ডিয়া সোসাইটির নেতা হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ভি. এস. শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত মন্টেগু যখন ভারতসচিব ছিলেন তখন তাঁহাকে প্রিভি-কাউন্সিলের একজন সভ্য করা হইয়াছিল।

[২] মাননীয় এডওয়ার্ড উড, যিনি লর্ড আরুইন এবং এখন লর্ড হ্যালিফাক্সরূপে আরও সুপরিচিত, তিনি তখন ঔপনিবেশিক দপ্তরের সহকারী সচিব ছিলেন; এবং লর্ড উইন্টারটন ছিলেন সহকারী ভারতসচিব।

কিন্তু টোরী মন্ত্রিসভা ইহাকে কার্যকরী করেন নাই। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে সেজন্য নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ হরি সিং গৌর কর্তৃক আইনসভায় পারম্পর্য আইনটি উত্থাপিত হয়।

১৯২৩ সালে যে সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছিল এবং যেগুলি পরবর্তী কয়েক বৎসরে অধিকতর কুৎসিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ না করিলে ১৯২৩ সালের ভারতের উপরোক্ত চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না। ১৯২৩ সালে অধিকাংশ অশান্তির ঘটনাস্থল ছিল পাঞ্জাব। ঐ বৎসরের গোড়ার দিকে মুলতানে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গা হইল এবং ইহার পরেই ঐরূপ আর একটি দাঙ্গা ঘটিল ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলের নিকট—অমৃতসরে। প্রায় এই সময়ে, শ্রীযুক্ত (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফজলি হোসেন পাঞ্জাবে মন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার চরম পক্ষপাতিত্ব শিখ ও হিন্দুদিগের মধ্যে যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরের শেষের দিকে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে—'তাঞ্জিম' ও 'তবলিঘ' নামে—ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিল, যাহার লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী ও পৌরুষসম্পন্ন এক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানদিগকে সংগঠিত করা। কিছুকাল এই আন্দোলনের বহু অনুরাগী জুটিয়াছিল কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই একটি বিরূপতার সৃষ্টি হইল এবং ইহার পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত সংগঠন গড়িয়া উঠিল। মুসলমানদিগের মধ্যে যখন উপরোক্ত আন্দোলন চলিতেছিল, হিন্দুরা তখন একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। হিন্দু মহাসভা নামে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন আগস্ট মাসে ইহার বার্ষিক সভায় বর্ণ হিন্দুরা যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন সেই সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অনুন্নত শ্রেণীদের দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। মুসলমানদিগের 'তাঞ্জিম' ও 'তবলিঘ' আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যে শুরু হইল একটি 'সংগঠন' আন্দোলন। উপরন্তু, অতীতে যে সকল হিন্দু কোনও না কোনও কারণে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য 'শুদ্ধি' (বা পিউরিফিকেশন) আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। শুদ্ধি অনুষ্ঠানের দ্বারা অ-হিন্দুর পক্ষে হিন্দু হওয়া সম্ভব করা হইয়াছিল। এই আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন হিন্দু মহাসভার অতি সম্মানিত নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ[১], যাঁহার প্রভাবে মুসলমান ও খৃষ্টান সহ হাজার হাজার অ-হিন্দুকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। প্রায় এই সময়ে স্বামীজী, যে মালকানা রাজপুতগণ প্রথমে হিন্দু ছিলেন কিন্তু

[১] একজন মুসলমান ধর্মোন্মাদ পরে সম্ভবতঃ শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতি তাহার ক্রোধ-বশতঃ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিয়াছিল।

পরে ঐশ্লামিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুনরায় ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং এই প্রয়াস মুসলমান নেতাদিগের মধ্যে অনেকের বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতে যখন এই সাম্প্রদায়িক ঝড় পাকাইয়া উঠিতেছিল, আলি ভ্রাতৃদ্বয় তখনও তাঁহাদের জাতীয়তাবাদী মত ত্যাগ করেন নাই। কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আলি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোকনদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গয়ার মত সেখানে উত্তপ্ত কোনও বাদ-বিতণ্ডা হয় নাই এবং অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটি প্রশ্ন লইয়া অশান্তি হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে যাহা প্রচণ্ড হইয়া উঠে নাই। বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দেশবন্ধু দাশ হিন্দু-মুসলমান চুক্তির একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তিনি কংগ্রেসকে দিয়া ইহা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, কোকনদ কংগ্রেস ইহা করিল না এবং চুক্তিটি এই তথাকথিত কারণে অগ্রাহ্য হইল যে, ইহা মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া জাতীয়তাবাদের নীতিকে লঙ্ঘন করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লালা লাজপৎ রায় ও ডাঃ এম. এ. আন্সারী অন্য একটি যে চুক্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা কোকনদ কংগ্রেস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছিল। এই সকল চুক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছিল যে, কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে উদারচেতা ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িক ভাঙনের সম্ভাব্যতা ও ঐ ভাঙন বিস্তৃত হইবার পূর্বে কোনও প্রকারের একটা আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত অথবা মূলগত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই, যাহার ফলে মত-পার্থক্য আরও তীব্র ও গুরুতর হইয়া উঠিল এবং ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল, উহা মন্দীভূত হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে একটা সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সম্মুখীন হইতে হইল।

জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শুরু মন্দ হইলেও সমাপ্তি শুভ হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে বিভেদ ও হতাশা দেখা গিয়াছিল; ডিসেম্বরে আসিল আশা ও আত্মপ্রত্যয়। স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির লক্ষণ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক উত্তেজনা পুনরায় দেখা দিতে শুরু করিয়াছিল। ইংলণ্ডেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাময়িক বিপর্যয় ঘটিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে শ্রীযুক্ত বোনার ল-র স্থলে প্রধানমন্ত্রী হইলেন শ্রীযুক্ত বল্ডুইন এবং ঐ বৎসরেরই নভেম্বর মাসে তিনি সীমাবদ্ধ বনাম অবাধ বাণিজ্যের প্রশ্নে দেশের নিকট সমর্থনের আবেদন জানাইলেন। ফলস্বরূপ,

রক্ষণশীলদের হাত হইতে ক্ষমতা চলিয়া গেল এবং ১৯২৪ সালের সূচনায় ইংরাজদের ইতিহাসে প্রথমবার শ্রমিক গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নিকট প্রাচ্য সম্বন্ধে পূর্বের মন্ত্রিসভার নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৯২২ সাল শেষ হইবার পূর্বে মুস্তাফা কামাল পাশা গ্রীকদিগকে আনাতোলিয়া হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের পূর্বেই তাঁহার পক্ষে কনস্টান্টিনোপল হইতে মিত্রশক্তির সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইল; এবং ১৯২৪ সালের মার্চের মধ্যে খলিফার পদ একেবারে লোপ করিয়া দিয়া তিনি এক নূতন ও শক্তিশালী তুরস্ক সৃষ্টি করার মত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

৫

ক্ষমতার শিখরে দেশবন্ধু দাশ (১৯২৪-২৫)

সব দিক দিয়া আশাপ্রদ পরিবেশের মধ্যে ১৯২৪ সাল শুরু হইল, কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের বিশ্রামের সময় ছিল না। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা পৌর সংস্থার নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ-প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে কলিকাতা পৌর আইন সংশোধিত হইয়াছিল। উহা দ্বারা পৌরসভাকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল এবং ভোটাধিকার যথেষ্ট বাড়াইয়া নির্বাচন-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হইয়াছিল। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, ভোটে জিতিতে পারিলে স্বরাজ্য দলের পক্ষে পৌর-শাসন দখল করা সম্ভব ছিল। সুতরাং, ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে যে সকল আসনে নির্বাচন হইবে ঐগুলি দখল করার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক অভিযান শুরু হইল। স্বরাজ্যপন্থী নেতাগণ যে সকল সভায় বক্তৃতা করেন সেগুলিতে যোগদানকারী সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহের আধিক্য হইতে নির্বাচনের খুবই অনুকূল পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন। এই ফল বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল কারণ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা হিন্দু ভোটদাতাগণ হিন্দু ও মুসলমান ভোটদাতাগণ কেবল মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিতে পারিতেন। নব-নির্বাচিত পৌর সদস্যগণের প্রথম সভায় দেশবন্ধু দাশ মেয়র এবং এক মুসলমান ভদ্রলোক, শ্রীযুক্ত শহীদ সুরাবর্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই কর্পোরেশন আমাকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ পৌর-শাসনের[১] সর্ব-প্রধানরূপে নিযুক্ত করে। সাতাশ বৎসর বয়সে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার নিয়োগ স্বরাজ্যপন্থী মহলে যদিও সাধারণভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল, তথাপি দলের মধ্যে কোনও কোনও মহলে কিছু ঈর্ষার উদ্রেক না করিয়া পারে নাই।

[১] কলিকাতা পৌরসভার নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল —পরিচালন-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ছিলেন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আর, সমগ্রভাবে কর্পোরেশনের প্রধান মেয়র। পুরাতন গঠনতন্ত্রে এই উভয় দায়িত্বই একসঙ্গে 'চেয়ার-ম্যানকে' সম্পাদন করিতে হইত।

গভর্নমেন্ট ইহাতে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং সংবিধানের নির্দেশানুসারে তাঁহাদিগকে যে অনুমোদন দিতে হইত তাঁহারা অনেক দ্বিধার পর তাহা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম মেয়ররূপে দেশবন্ধুর নির্বাচন আমাদের কলিকাতা পৌরসভা-জয়ের প্রতীকস্বরূপ হইয়া উঠিল এবং জনগণের উচ্ছ্বাসে তাহার অভিব্যক্তি হইল। নূতন আমলে, নাগরিকদের কল্যাণ বিধানের জন্য যে সকল নূতন নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছিল সেগুলি সত্বর চালু করা হইল। নবনির্বাচিত স্বরাজ্যপন্থী কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানগণ, মেয়রও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, সকলেই গৃহে প্রস্তুত খদ্দর পরিয়া আসিতেন। পৌরসভার কর্মচারীদের সরকারী পোশাক হইয়া উঠিল খদ্দর। ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তান-দিগের নামে বহু রাস্তা ও পার্কের নামকরণ করা হইল। সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা বিভাগ খুলিয়া উহার ভার এমন একজনের উপর ন্যস্ত হইল, যিনি কেম্ব্রিজের[১] বিশিষ্ট ভারতীয় গ্রাজুয়েট ছিলেন। সারা শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার চালাইবার জন্য পৌরসভার অর্থ সহায়তায় শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমাজসেবীভাবাপন্ন নাগরিকদের লইয়া স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দরিদ্রগণ যাহাতে বিনা অর্থব্যয়ে চিকিৎসা করাইতে পারেন সেজন্য পৌরসভা বিভিন্ন এলাকায় বহু চিকিৎসালয় খুলিল। জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে স্বদেশী পণ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইত। নূতন কাহাকেও নিয়োগ করিতে হইলে, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী প্রথমে বিবেচনা করা হইত। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিল দরিদ্রসন্তানদিগের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ-কেন্দ্র। সর্বশেষে হইলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেলের মত জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এই শহরে আসিলে তাঁহাদের নাগরিক সম্বর্ধনা দিবার ব্যবস্থাও পৌরসভা করিয়াছিল এবং পূর্বে বড়লাট, গভর্নর ও সরকারী কর্মচারীদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানাইবার যে প্রথা ছিল উহা চিরকালের মত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

নাগরিকদের কল্যাণ বিধানের জন্য উপরোক্ত যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহা নূতন এক পৌরচেতনা[২] জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। লোকে

[১]ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যিনি এখন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল রহিয়াছেন। বর্তমানে পৌর-বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৪০,০০০ ছেলেমেয়ে পড়িতেছে।

[২]নূতন এই চেতনার অভিব্যক্তিরূপে পৌরসভা **কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট** নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সুরু করে।

এই প্রথম পৌরসভাকে তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান এবং উহার অফিসার ও কর্মচারীদিগকে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী না ভাবিয়া জনসেবকরূপে মনে করিতে সুরু করিল। কিন্তু শহরের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ইংরাজগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে এবং তাঁহারা পৌরসভায় আর আধিপত্য খাটাইতে পারিবেন না। সেই সময়ে প্রায় সকল বিভাগেরই কর্তা ছিলেন ইংরাজ; কিন্তু দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁহাদের সঙ্গে কাজকর্ম চালাইতে আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই। তাঁহাদের অধিকাংশই এই নূতন স্বরাজ্য-পন্থী শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন এবং কাহারও কাহারও মধ্যে ইহাকে প্রশংসা করিবার উৎসাহও দেখা গিয়াছে। যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই পরিচালনদক্ষতার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং পূর্বাপেক্ষা তৎপরতার সহিত নাগরিকদের অভিযোগগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইত, তৎসত্ত্বেও কর্পোরেশনে সরকারী দলের মত গভর্নমেন্টও তাঁহাদের বিরোধিতার নীতি চালাইয়া গিয়াছেন; যাহার ফল হইয়াছিল, সব সময়ে সঙ্ঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। নিয়োগের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার করার যে নীতি স্বরাজ্য-পন্থীদের ছিল তাঁহারা উহার বিরোধী ছিলেন। শহরের জল নিষ্কাশন সমস্যা সম্বন্ধেও স্বরাজ্যপন্থীদের সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল। নূতন পয়ঃপ্রণালী-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তৈয়ারী পরিকল্পনা অবৈজ্ঞানিক ও কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া স্বরাজ্যপন্থিগণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা পৌরসভার পয়ঃপ্রণালী বিষয়ক ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত ও. জে. উইলকিনসন ও জনস্বাস্থ্যের ডিরেক্টর ডাঃ সি. এ. বেন্টলির সমর্থন পাইয়া-ছিলেন; এবং গভর্নমেন্টের পক্ষে ছিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত জে. আর. কোটস্। পৌরসভা ও গভর্নমেন্টের মধ্যে পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং এই পয়ঃপ্রণালীর প্রশ্নে[১] পৌরসভার নিকট গভর্নমেন্টের হার স্বীকার করিতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপ গভর্নমেন্টকে তত বেশী অসুবিধায় ফেলিত না যদি না একই সময়ে বহু দিক হইতে গভর্নমেন্টের উপর চাপ আসিত। ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দল ছিল মোটামুটি শক্তিশালী, এবং দলের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। ১২ই জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই সংবাদে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দেশবাসীর মধ্যে খুবই তীব্র দাবী ছড়াইয়া

[১] পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে এখন যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে উহা ভারতীয় চীফ ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ বি. এন. দে তৈয়ারী করিয়াছিলেন; তিনি এখনও ঐ পদে বহাল আছেন।

পড়ে। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, যেদিন উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিল সেই দিন প্রত্যুষে মহাত্মাকে গোপনে মুক্তি দেওয়া হইল। দুই একদিন পর ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আইনসভায় এই দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব আনিলেন যে, পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক আহূত হউক এবং এই নূতন শাসনতন্ত্র নব-নির্বাচিত ভারতীয় আইন পরিষদে উপস্থাপিত করিবার জন্য ও সংবিধানে রূপ দিবার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হউক। এই প্রস্তাবের উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে স্যার ম্যালকম হেইলি শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনার একটি তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। যদি তদন্তের পর দেখা যায় যে, আইনের সীমার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট ঐ মর্মে সুপারিশ করায় গভর্নমেন্ট কোনও আপত্তি করিবেন না। কিন্তু পক্ষান্তরে, আরও শাসনতান্ত্রিক উন্নতি ঘটাইতে গিয়া যদি ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এর সংশোধন করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থায় গভর্নমেন্টের পক্ষে কোনও ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই উত্তর ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং প্রত্যুত্তরে, মঞ্জুরীর জন্য উত্থাপিত দাবীগুলির কয়েকটিকে আইনসভা নাকচ করিয়া দেয় এবং সমগ্র অর্থ বিলটাকেই বিবেচনা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। সেজন্য বড়লাটের উপর ন্যস্ত সুপারিশের বিশেষ ক্ষমতাবলে অর্থ বিলকে চালু রাখিতে হইয়াছিল।

গোল টেবিল বৈঠকের দাবী লইয়া বিতর্কের পরেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়—১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে বা উহার কার্যপদ্ধতিতে কোনও ত্রুটি বর্তমান থাকিলে তাহার অনুসন্ধান করা; হয় আইনের বিধানানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অথবা প্রশাসনিক কোনও অসম্পূর্ণতার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন, আইনের এরূপ সংশোধন করিয়া আইনের গঠন, নীতি ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য নাই এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকারের সম্ভাব্যতা ও বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে তদন্ত করা। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেকজান্ডার মুডিম্যান এবং সদস্যাদিগের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু (এলাহাবাদ), স্যার শিবস্বামী আয়ার (মাদ্রাজ), শ্রীযুক্ত এম. এ. জিন্না (বোম্বাই) ও ডাঃ পরাঞ্জপে (পুণা), ইঁহারা সকলেই উদারপন্থী (মডারেট) রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সংখ্যাল্প সদস্যাদিগের পৃথক একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। সমগ্র কমিটির মতে, শাসনতন্ত্রে এবং ইহার প্রয়োগের পদ্ধতিতে গুরুতর ত্রুটি আছে। সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সরকারী কর্মচারী; তাঁহাদের অধিকাংশই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের

জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, যাহা শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে সাহায্য করিবে। সংখ্যাল্প সদস্যগণ বলিয়াছিলেন যে, শাসনতন্ত্রের এরূপ সামান্যই লাভ হইবে এবং ইহার সন্তোষজনক প্রয়োগ তখনই কেবল সম্ভব যখন প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ও কেন্দ্রে অন্ততঃ আংশিকভাবে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে ইহাকে সংশোধন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষণীয় যে, আইনসভায় স্বরাজ্য দল মুডিম্যান কমিটির সহিত কোনও প্রকারেই সহযোগিতা করেন নাই এবং স্বরাজ্যপন্থীদের দৃষ্টিতে ঐ কমিটির রিপোর্ট ছিল একেবারেই নৈরাশ্যজনক।

আইনসভায় দলের সদস্যগণ যখন প্রধান প্রধান বিষয়গুলি লইয়া লড়াই করিতেছিলেন তখন স্বরাজ্যদল সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাধাদানের কৌশল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধাদানের কিংবা অচলাবস্থা সৃষ্টির কোনও সুযোগই ছিল না কারণ বড়লাট সহজেই তাঁহার 'নামঞ্জুর' ও 'সুপারিশে'র বিশেষ ক্ষমতাবলে সভাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের বিভাগগুলি যে সকল মন্ত্রীরা পরিচালনা করিতেন তাঁহাদের উপর বড়লাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল এবং তাঁহারা না ছিলেন আইনসভার নির্বাচিত সদস্য, না তাঁহাদের ভোটের দ্বারা ঐ সভা অপসারণ করিতে পারিত। অপরপক্ষে, প্রদেশগুলিতে তথাকথিত 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলি যে 'মন্ত্রীরা' পরিচালনা করিতেন তাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন এবং ঐ সভার ভোটের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হইত; এবং অন্যান্য যে বিভাগগুলিকে বলা হইত 'সংরক্ষিত' বিভাগ, সেগুলি যে সকল সদস্য চালাইতেন তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার[১] ভোটাভুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সেজন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে স্বরাজ্য-পন্থীদের কৌশল ছিল মন্ত্রীদের ও তাঁহাদের 'হস্তান্তরিত' দপ্তরগুলি আক্রমণ করা। যাহাতে মন্ত্রীদিগকে আদৌ নিযুক্ত করা না যায় সেজন্য হয় তাঁহাদের বেতন একেবারেই নামঞ্জুর করা হইত—নতুবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বার বার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনা হইত, যাহাতে কোনও মন্ত্রিসভা বেশী দিন টিঁকিতে না পারে। সেই সঙ্গে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির বাজেট বাতিল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইত, যাহা সুপারিশের দ্বারা চালু করা সম্ভব ছিল না। এরূপ কৌশল অবলম্বনের ফলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিয়া পরিচালনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রাক্-সংস্কারের দিনগুলির মত শাসনকার্য চালাইয়া যাইতে প্রদেশের গভর্নর বাধ্য হইতেন। যে মধ্যপ্রদেশ আইন পরিষদে স্বরাজ্যপন্থীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল

[১] দ্বিবিধ ব্যবস্থার জন্যই এই শাসনকে বলা হইত 'দ্বৈতশাসন'।

সেখানে সম্পূর্ণ বাজেট বাতিল করিয়া দিতে কোন অসুবিধা হয় নাই, এবং ফলে কোনও মন্ত্রিসভাও গঠিত হইতে পারে নাই। বাঙলায় পরিস্থিতি ছিল অংশত মধ্যপ্রদেশের অনুরূপ। মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করা হয় নাই এবং মঞ্জুরীর জন্য বারংবার চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছিল। সুতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা ভিন্ন উপায় রহিল না। এইরূপে, মধ্যপ্রদেশে ও বাঙলায় শাসনতন্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছিল। ঐ দুইটি প্রদেশে দ্বৈতশাসনকে যখন বাতিল করিয়া দেওয়া হয় তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহা স্বরাজ্যপন্থীদের বিরাট একটি সাফল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং এই সাফল্য সারা দেশে আনন্দের স্রোত আনিয়া দিয়াছিল। ১৯২০ সালে, নির্বাচন বর্জন করিয়া কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্রকে অচল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু এই প্রয়াস সফল হয় নাই, কারণ একটি আসনও অপূর্ণ ছিল না এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভরিয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে, ১৯২৪ সালে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির ভিতরে লড়াই চালাইয়া স্বরাজ্যপন্থিগণ অন্ততঃ কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্রকে পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কখনও কখনও উদারপন্থী দলের লোকেদের এবং 'পরিবর্তন-বিরোধী' কংগ্রেসীদের পক্ষেও স্বরাজ্যপন্থীদের এই নিয়মতান্ত্রিক বাধাদানের নীতির কার্যকারিতা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, গভর্নর ও তাঁহার পদস্থ কর্মচারিগণ মন্ত্রীদের বিভাগগুলির ভার গ্রহণ করিলে যে কাজ হইবে তদপেক্ষা আরও ভাল কাজ মন্ত্রিগণ করিতে পারেন যদি তাঁহাদিগকে কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহার বিরুদ্ধে স্বরাজ্যপন্থীদের যুক্তি হইতেছে এই যে, তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা (১৯২০-১৯২৩) দেখাইয়া দিয়াছে, ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, কল্যাণমূলক কাজ করার কোনও সুযোগ মন্ত্রীর নাই। জননিরাপত্তা, বিচার, কারাদপ্তর, অর্থ ইত্যাদির মত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সমস্তই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের হাতে এবং বাজেট-বরাদ্দ প্রথমে এই সকল বিভাগের জন্যই করা হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা মন্ত্রীদের দেওয়া হয় এবং বরাদ্দের পরিমাণ এতই নগণ্য যে, ইহা কেবল তাঁহাদের ন্যূনতম ঠাট বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট; মোটামুটি ভালভাবে জাতি গঠনের কাজ চালানো ইহার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। উপরন্তু, মন্ত্রীদের অধীনে তাঁহাদের সেক্রেটারীগণ সহ যে সকল প্রধান প্রধান কর্মচারী কাজ করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রিগণ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহারা বেতন ও ভাতাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহারা কর্ণপাত করেন না। এমতাবস্থায়, শাসনতন্ত্রের অবাধ প্রয়োগের দ্বারা কোনও প্রকারেই

দেশের উপকার হইতে পারে না—পক্ষান্তরে, সার্থক বাধাদানের ফলে কেবল যে গভর্নমেন্টের উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা গড়িয়া তুলিয়া চাপ সৃষ্টি করা যায় তাহাই নহে, বরং ইহার দ্বারা সামগ্রিকভাবে দেশে প্রতিরোধশক্তিও গড়িয়া তোলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যখন স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র প্রথম রচিত হয় তখন মুখবন্ধে ইহা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের নীতির লক্ষ্য আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যাহা না হইলে জনগণের দাবী স্বীকার করিতে গভর্নমেন্টকে বাধ্য করা কখনই সম্ভব নয়।

স্বরাজ্যপন্থিগণ যখন তাঁহাদের প্রথম বিজয়োল্লাসে মগ্ন তখন শ্রমিক সরকারের ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ার হাউস অব লর্ডসে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য এক বক্তৃতায় ভারতে স্বরাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল—প্রথমতঃ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করিয়া হাউস অব লর্ডসে গৃহীত প্রস্তাব; দ্বিতীয়তঃ, ১৯২২ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চ প্রশংসা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জের 'ইস্পাত-কাঠামো' শীর্ষক বক্তৃতা; তৃতীয়তঃ, ১৯২৩ সালে জনগণের তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া ও ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক বিরুদ্ধে ভোটদান সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেন্টের লবণ কর দ্বিগুণ করা; এবং চতুর্থতঃ, আফ্রিকায় রাজকীয় শাসনাধীন উপনিবেশ কেনিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচার। ভারতবাসীর যে অস্থিরতা হইতে স্বরাজ্যদলের জন্ম উহার কারণগুলি সম্বন্ধে এই তীক্ষ্ম ও সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখাইয়া দিয়াছে যে, অন্ততঃ একবার লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস ভারতের জনগণের ভাবধারা ও মতকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহা উপলব্ধি করিবার পরেও যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার কার্যকলাপে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া দেশবন্ধু এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সুরু করেন—তাহা হইল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কলিকাতা হইতে অনতিদূরে তারকেশ্বরে 'বাবা তারকনাথ' বা 'শিবের' একটি প্রাচীন মন্দির আছে। অন্যান্য তীর্থমন্দিরগুলির মত এই মন্দিরেরও প্রচুর সম্পত্তি ছিল, যাহা ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দু প্রথানুযায়ী, মন্দির ও ইহার সংলগ্ন সম্পত্তির ভার ছিল একজন তত্ত্বাবধায়কের উপর; তাঁহাকে বলা হইত মোহান্ত। যদিও আশা করা হইত যে, মোহান্তগণ পবিত্র ও সংযমী জীবন যাপন করিবেন কিন্তু তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রদত্ত সম্পত্তির দেখাশুনা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ

ছিল। যেহেতু তারকেশ্বর বাঙ্গলায় সর্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অন্যতম এবং প্রতি বৎসর ঐ প্রদেশের সকল প্রান্ত হইতে লোক আসিত, সেজন্য মোহান্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলনের সাফল্যের পর, তারকেশ্বরে অনুরূপ একটি আন্দোলন সুরু করার জন্য বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটিকে চাপ দেওয়া হইল। মোহান্ত তাঁহার জীবনযাত্রার সংশোধন করিবেন এরূপ দাবী করিয়া তাঁহাকে একাধিক নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এই সকল চেষ্টায় কোনও ফল না হওয়ায় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিপূর্ণভাবে মন্দির ও ইহার সংলগ্ন সম্পত্তি দখল করিয়া জনগণের একটি কমিটির পরিচালনাধীনে আনিবার জন্য দেশবন্ধু আন্দোলন সুরু করেন। মোহান্ত গভর্নমেন্টের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মন্দির ও মোহান্তের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র—ঘটনাস্থলে পুলিসের আবির্ভাব ঘটিল। তারকেশ্বরে যথারীতি সত্যাগ্রহের দৃশ্যাবলী পুনরায় দেখা গেল—একদিক হইতে শান্তি-পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবকগণ আগাইয়া আসিতেছেন এবং অপর দিকে পুলিস তাঁহাদের নির্মমভাবে আক্রমণ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গ্রেপ্তার করিতেছে। গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রশ্নটি রাজনৈতিক রূপ লইল। আরও একবার জনগণের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য দেশবন্ধু তাঁহার পুত্রকে স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতারূপে জেলে পাঠাইলেন। অল্প কিছুকালের মধ্যেই আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং প্রদেশের[১] প্রত্যেকটি প্রান্ত হইতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল।

১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন তথা বাঙ্গলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে দেশবন্ধু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি চুক্তি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেস কর্তৃক ইহা এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য হয় যে, ইহার দ্বারা মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। "দি বেঙ্গল প্যাক্ট"-রূপে খ্যাত এই চুক্তি সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। বিষয়টি লইয়া তুমুল বিতর্ক চলিয়াছিল এবং দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত কোন

[১] কয়েক মাস ধরিয়া এই সত্যাগ্রহ অভিযান চলিয়াছিল। শেষপর্যন্ত মোহান্ত দেশবন্ধু দাশের সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন এবং একটি চুক্তি হয় যদ্দ্বারা মন্দির ও সম্পত্তির অধিকাংশ জনগণের কমিটির উপর ন্যস্ত করা স্থির হয়। আদালতে এই চুক্তি পেশ করিতে হইয়াছিল কিন্তু এ অবস্থায় ব্রাহ্মণসভা নামে এক তৃতীয় পক্ষ আপত্তি তুলিল। সমস্ত ব্যাপারটি যখন বিবেচনাধীন ছিল তখন দেশবন্ধু মারা গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার মৃত্যুর পর এই চুক্তিকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং সত্যাগ্রহ অভিযানের দ্বারা যে লাভ করা গিয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল।

কোন প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু যোগদান করিয়া তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তথাপি, আমাদের নেতার আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ফলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় এবং বিপুল ভোটাধিক্যে বাঙ্গলার চুক্তি গৃহীত হয়। ইহার পর, আর একটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় যাহা পরে সরকারী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ইহা ছিল গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব। কয়েক মাস পূর্বে, গোপীনাথ সাহা নামে এক তরুণ ছাত্র কলিকাতার পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করেন। ভুল করিয়া অপর একজন ইংরাজ শ্রীযুক্ত ডে-কে তিনি গুলি করিয়া হত্যা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার চলিবার সময় সাহা এক বিবৃতি দেন যাহা সেই সময়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পুলিস কমিশনারকে হত্যা করার ইচ্ছাই তাঁহার ছিল এবং অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। জীবন দিয়া মূল্য পরিশোধ করিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁহার প্রতিটি রক্তবিন্দু হইতে প্রতিটি ভারতবাসীর গৃহে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইবে। হাইকোর্ট সাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং যথাসময়ে তাঁহার ফাঁসি হইয়া যায়। কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর, বাঙ্গলায় কয়েকটি সভায় তাঁহার সাহস ও ত্যাগশক্তির প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব পাস হয়; অবশ্য তাঁহার কার্যের নিন্দা করা হয়। সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাস করে এবং ইহা গভর্নমেন্টের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বাঙ্গলায় যখন এই সকল উত্তেজনার ঘটনা ঘটিতেছিল তখন অন্যত্রও বহু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি, ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পাইলেন। বিশ্রাম ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বোম্বাইয়ের নিকটে সমুদ্রোপকূলবর্তী একটা স্থানে গিয়া তিনি বাস করিতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে পুনরায় জাতীয় প্রশ্নাদি লইয়া চিন্তা করা এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক কাজকর্ম সুরু করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে কি মনোভাব গ্রহণ করিবেন এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়া গেল। অবশ্য নীতিগতভাবে তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের 'আইন পরিষদে প্রবেশের' নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন; তথাপি, তিনি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দেশে স্বরাজ্যপন্থিগণ এতই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহাদের পরাজিত করা যাইবে না এবং সেজন্যই, যাহা অনিবার্য তাহার নিকট তিনি নতি স্বীকার করিয়াছিলেন। অথবা, দেশে পরিস্থিতির পরিবর্তন নীতি-পরিবর্তনই নির্দেশ করিতেছে ইহা তিনি হয়ত অনুভব করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, স্বরাজ্যপন্থী নেতা দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর

সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত একটি বুঝাপড়ায় আসিলেন। গান্ধী-দাশ চুক্তিরূপে খ্যাত এই আপোষের মর্ম ছিল এই যে, মহাত্মা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খাদি আন্দোলনে নিয়োগ করিবেন, এবং স্বরাজ্যপন্থীদের উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার থাকিবে। মহাত্মাকে তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য অল-ইণ্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশন নামে স্বশাসিত একটি সংস্থা গঠনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল; কংগ্রেস কিংবা স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে উহাতে কোনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এই সংস্থার নিজস্ব তহবিল ও কর্ম-পরিষদ থাকিবে।

অপর পক্ষে, কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন দল হিসাবে স্বরাজ্য দল কাজ চালাইয়া যাইবে এবং ইহার নিজস্ব কর্মপরিষদ[১] থাকিবে। মধ্যে মধ্যে মহাত্মার সৌহার্দ্যমূলক বিবৃতি প্রচারের ফলে তাঁহার ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে সম্পর্ক শীঘ্রই মৈত্রীতে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেন, 'আমার রাজনৈতিক ভাবধারার সহিত স্বরাজ্য-পন্থীদের সামঞ্জস্য আছে।' আর একবার তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া-ছিলেন বলিয়া শুনা যায় : 'শিশু যেমন তাহার মা-কে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে তদ্রূপ আমিও স্বরাজ্য দলকে আঁকড়াইয়া থাকিব।'

স্বরাজ্য দলের সহিত মহাত্মার বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া কংগ্রেস শিবিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, আর একটি গূঢ় সমস্যার প্রতি তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ১৯২৩ সাল হইতেই ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা গিয়াছিল এবং ইহা উপলব্ধি করিবার মত যথেষ্ট দূরদৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর ছিল যে, এই বিপদকে যদি অঙ্কুরেই বিনাশ না করা যায় তাহা হইলে শীঘ্রই ইহা জাতীয় বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সমর্থনে স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলন যখন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে তখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু না হইতে পারে—কিন্তু যে মুহূর্তে আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসিবে তখনই এই বিপদ যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। অতএব তাঁহার অনুরোধে, ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে একটি ঐক্য সম্মেলন আহূত হইল। অনেকে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, এমন কি ভারতে অ্যাঙ্গলিকান গীর্জার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও বৃটিশ প্রতিনিধিগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মেলন চলিবার সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ঘটাইয়া যে পাপ করিয়াছেন, তজ্জন্য মহাত্মা স্বেচ্ছামূলক প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন সপ্তাহ অনশনে প্রবৃত্ত হন। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ভারতে বিভিন্ন

[১] ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে বেলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই চুক্তি অনুমোদন করা হয়।

সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাইবার জন্য একটি সূত্র আবিষ্কার করা গিয়াছিল এবং কখনও কোনও স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিলে তাহাতে মধ্যস্থতা করিবার জন্য পনের জন সদস্যের একটি সামঞ্জস্য-বিধায়ক বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। ঐক্য সম্মেলনের সাফল্য সত্ত্বেও, বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও ফল পাওয়া গেল না। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফার পদ একেবারে রদ করিয়া দিবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে সমর্থন লাভের আগ্রহবশতঃ যে সকল মুসলমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখিতে তাঁহাদের আর কোনও উৎসাহ রহিল না। ভারতের অধিকাংশ স্থানে খিলাফৎ কমিটিগুলির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং ঐ সকল সংগঠনের তখনও পর্যন্ত যাঁহারা সদস্য ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভুঁই-ফোঁড় প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলিতে ভিড়িয়া গেলেন। প্রায় এই সময়েই নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের পুনর্জন্ম হয়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতে এই দল ছিল মুসলমানদিগের প্রধান সংগঠন। ঐ বৎসর হইতেই প্রকৃতপক্ষে ইহার স্থান দখল করে নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি, যাহা ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে সক্রিয় সদস্যদের অধিকাংশকেই টানিয়া লইতে সক্ষম হয়। তুর্কীদের নিজেদের দ্বারাই খলিফার পদ লুপ্ত হওয়ায় ভারতে খিলাফৎ কমিটিগুলির মূলে কুঠারাঘাত হইল এবং নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের পুনরভ্যুত্থানে উহা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগ যখন পুনরায় মিলিত হইল তখন ১৯২০ সালের পর এই প্রথম খিলাফৎপন্থীদের পরাজয় ঘটিল। পরে আমরা দেখিব, এই নব-জাগ্রত নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগ ১৯২০ সালের পূর্বের অপেক্ষা অধিকতর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৪ সালের প্রায় মাঝামাঝি, পরিস্থিতি পুনরায় সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য ১৯২১-২২ সাল হইতে এই সঙ্কট ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সর্ব দিক দিয়া গভর্নমেন্টের উপর ভীষণ চাপ আসিতেছিল। কেবল বাঙ্গলায় নয়, বরং সারা দেশ জুড়িয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি (মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসিতেছিল, এবং তদনুপাতে সরকারী ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল। সমস্ত ব্যবস্থাপক সভাতেই তীব্র লড়াই চালানো হইতেছিল এবং মধ্যপ্রদেশ ও বাঙ্গলা—এই দুইটি প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্র অচল করিয়া তোলা হইয়াছিল। বাঙ্গলায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ মন্দির পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কারআন্দোলনরূপে শুরু হইলেও শীঘ্রই ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে গড়িয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিল। এতদ্ব্যতীত, গভর্নমেন্টের

মতে, গোপনে জোর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলিতেছিল এবং বিশেষ করিয়া বিপ্লবী গোপীনাথ সাহাকে প্রশংসা করিয়া জনসাধারণ যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হন; যদিও ঐ প্রশংসার ধরন ছিল সীমাবদ্ধ ও শর্তযুক্ত। আগস্ট মাসে স্বরাজ্য দলের প্রভাব যখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে তখন কলিকাতায় দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নেতৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই জমায়েৎ বিরাট হইয়াছিল এবং বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট ইহাকে আঘাত হানার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিলেন। গত এক বৎসর তাঁহারা একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া ছিলেন না এবং ঘটনাপ্রবাহ গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই, যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মী বাঙ্গলার স্বরাজ্য দলে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককে '১৮১৮-র ৩নং ধারা' নামে পুরানো একটি আইনানুযায়ী সহসা গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট যে কারণ দেখাইয়াছিলেন তাহা হইল এই যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং সেজন্যই দ্রুত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সকল গ্রেপ্তার যদিও সেই সময়ে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল, পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি হয় নাই এবং ক্রমশঃ উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসে। এক বৎসর পরে গভর্নমেন্ট পুনরায় ঐ কৌশল কাজে লাগানো স্থির করিলেন। স্বরাজ্য দলকে দমন করিবার জন্য এতদ্ভিন্ন কোনও উপায় তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও অনুরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্র ব্যতীত, আইন বাঁচাইয়া দলের কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সরকার ঐসকল কার্যকলাপের ফলে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন; কিন্তু, স্বরাজ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে দমন করিবার সমস্ত চেষ্টা কেবল যে ব্যর্থ হইয়াছিল তাহাই নহে, জনগণের মধ্যে উহা বিপুলতর উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেজন্য গভর্নমেন্ট একেবারে মরীয়া হইয়া সংগঠনের মূলে কুঠারাঘাত করা স্থির করিলেন, এবং যেহেতু উহা আদালতে বিচারের দ্বারা সম্ভব ছিল না, সে হেতু তাঁহারা স্বরাজ্য দলের সংগঠকদিগের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে অতি প্রত্যুষে তাঁহারা কলিকাতা ও বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে বহু কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। এই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল অংশত ১৮১৮-র ৩নং বিধানানুযায়ী, এবং অংশত একটি জরুরী আইন (বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সরূপে খ্যাত) বলে, যাহা ২৪শে

অক্টোবর তারিখের মধ্য রাত্রিতে বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮১৮-র ৩নং বিধানের দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট যেরূপ গ্রেপ্তার ও আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জরুরী আইনে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টও অনুরূপ ক্ষমতা লাভ করিলেন; এবং ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত বাঙ্গলায় গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের আদেশ দেওয়ার সুবিধার্থেই এই জরুরী আইন প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইজন বিশিষ্ট স্বরাজ্যপন্থী সদস্য, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র[১] এবং ছিলাম আমি। পরোয়ানাগুলির মধ্যে কতকগুলি ১৮১৮ সালের ৩নং আইনের ধারানুসারে গঠিত হইয়াছিল,—যেমন আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রে; পক্ষান্তরে, অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে নব-ঘোষিত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে ঐগুলি জারী করা হয়। বিগত জুলাই মাসে যেদিন গভর্নমেন্ট মন্ত্রীদিগকে পদাধিকারে বহাল রাখিয়া দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করার চেষ্টায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন তাহার পরদিনই ৩নং আইনের ধারানুসারে গঠিত পরোয়ানাগুলি স্বাক্ষর করা হয়। অথচ, কেন প্রায় তিন মাস এই পরোয়ানাগুলি কার্যকর করা হয় নাই এ সম্বন্ধে কোনও কারণ দেখানো হয় নাই। সাধারণভাবে অনুমান করা হইয়াছিল যে, পাইকারী গ্রেপ্তারের এবং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের অনুমোদন লাভের জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উপরন্তু, সমগ্র বিষয়টিই তদানীন্তন শ্রমিক সরকারের ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ারের নিকট পেশ করিতে হইয়াছিল, এবং সেজন্যই এই বিলম্ব ছিল অপরিহার্য। সেই সময়ে এই সকল গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা হইয়াছিল যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সকল (বিশেষতঃ কলিকাতা পৌরসভা), আইন পরিষদ ও তারেকশ্বরে স্বরাজ্যপন্থীদের চাপ গভর্নমেন্টকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা কেবল বাঙ্গলায় আঘাত হানিয়াছিলেন এই কারণে যে, ঐ প্রদেশে গভর্নমেন্ট-বিরোধী শক্তি সর্বাধিক ছিল।

২৫শে অক্টোবর এরূপ অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে বহু লোককে গ্রেপ্তার করায় দেশে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সরকারী মহল এই ছুতা দেখাইলেন যে, একটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গুরুতর কিছু ঘটিবার পূর্বেই এই সকল গ্রেপ্তার করিতে হইয়াছে। কিন্তু, যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহারা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, দেশবাসীকে ইহা

[১] সেই হইতে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে আইন-সভায় যোগদান করেন এবং ১৯২৮ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যে বিরোধী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হইয়া উঠেন।

বুঝানো কঠিন হইল। এই সকল গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং আমার গ্রেপ্তারের এক মাস পরে গভর্নমেন্ট আমার মুক্তির কথা গুরুত্বের সহিত ভাবিতে শুরু করিলেন। কিন্তু যে পুলিসদিগের অনুরোধে এই সকল গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের মর্যাদার প্রশ্ন অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া এই প্রস্তাব বাতিল করিতে হইল। আমার গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন হইয়াছিল কারণ জনসাধারণ মনে করিয়াছিলেন যে, গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হইতেছে নূতন পৌরসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শাসনকে আঘাত হানা। প্রত্যেকেই—এমন কি চরম রাজভক্তগণও জানিতেন—যে, আমি আমার পৌরসভার কাজে দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলাম এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কাজেই, সরকারী ও আধা-সরকারী মহলকে এই সকল 'গ্রেপ্তারে'র দেশবাসীর বিশ্বাসযোগ্য কোন অজুহাত তৈয়ারী করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল—কলিকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা **দি স্টেটসম্যান** ও **দি ইংলিশম্যান** (অধুনা লুপ্ত) এই মর্মে বিবৃতি দিল যে, বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নায়ক আমি। তৎক্ষণাৎ আমার আইনজ্ঞ-গণ ঐ দুইটি পত্রিকার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা রুজু করিলেন। মাসের পর মাস মামলা চলিল এবং ইতিমধ্যে গভর্নমেন্টের সমর্থনে পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে অসার নয় তাহার প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে মামলায় গভর্নমেন্টের সাহায্য লাভের চেষ্টা হইল। গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে রাজী হন নাই বলিয়া লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিসের সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা হইয়াছিল। তখন ইংলন্ডে মন্ত্রিসভায় একটি পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং জিনোভিয়েফের পত্র যে ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার ফলে রক্ষণশীল দলের অনুকূলে অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। নির্বাচনে শ্রমিক দলের পরাজয়ের পর শ্রমিক সরকারের ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ারের স্থানে আসিলেন রক্ষণশীল দলের লর্ড বার্কেনহেড। যদিও ইন্ডিয়া অফিস অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা দুইটির বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তাঁহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে আমার অংশ গ্রহণকে প্রমাণ করিবার মত লিখিত কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কলিকাতায় স্বরাজ্য-পন্থীদের পত্রিকা **ফরওয়ার্ড** এই বিষয়ে লন্ডন হইতে কলিকাতায় লেখা একটি চিঠি জোগাড় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন. উহাতে ইন্ডিয়া অফিসের একজন প্রতিনিধি এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় যে, আমার বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই আমাকে গ্রেপ্তার

করা হইয়াছে, কিন্তু লিখিত কোনও প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে নাই। এই চিঠি প্রকাশের ফলে গভর্নমেন্ট আরও অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন।

এই সকল নির্যাতন দেশবন্ধু দাশকে যেরূপ ভিভূত করিয়াছিল, ভারতে আর কাহাকেও তাহা করে নাই। কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে প্রদত্ত এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন, যাহা তখন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যাহা করিয়াছেন তাহার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গভর্নমেন্টকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট এই আহ্বান গ্রহণ করেন নাই তবে অন্যভাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন। ভারত সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা শুরু করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজনৈতিক দিক হইতে মহাত্মা গান্ধী পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। যে রাজনৈতিক আন্দোলন স্বরাজ্যপন্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেকে খাদি আন্দোলনে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার স্মৃতি সরকারী কর্তাদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি যদি সাগ্রহে ও আন্তরিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে দেশবন্ধুর সহিত একটি বুঝাপড়ায় আসা সম্ভব। মানুষ হিসাবে তাঁহার সম্বন্ধে লর্ড লিটনের ব্যক্তিগতভাবে খুব উচ্চ ধারণা ছিল; এবং সেই সময়ে বাঙলার গভর্নর আন্দোলনের চাপ যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন সেরূপ আর কোনও সরকারী কর্মচারী করেন নাই। তখনকার দিনে, কংগ্রেসের সহিত মীমাংসার অর্থ ছিল দেশবন্ধু দাশের সহিত মীমাংসা। অতএব, দেশবন্ধু ও বাঙলার গভর্নর লর্ড লিটনের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া গোপন আলোচনা চলিল।

১৯২৪ সালের অক্টোবরে এই সকল গ্রেপ্তারের ফলে দেশবাসীর মধ্যে যে সাড়া পড়িয়াছিল, দেশবন্ধু তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে কাজে লাগাইবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি তহবিল গড়ার জন্য আবেদন জানাইলেন, জাতীয় পুনর্গঠনে যাহা কাজে লাগানো হইবে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না এবং অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, এই আবেদনে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নেতা বেশী বুঝিতেন। পূর্বাভাস অনুকূল না হইলেও তিনি খুব ভাল সাড়া পাইয়াছিলেন এবং উহার দ্বারা তাঁহার উপর জনগণের আস্থা পুনর্বার প্রমাণিত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাঁওয়ে। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে এই কংগ্রেস হয়, এবং এই কংগ্রেসেই দেশবন্ধু শেষবারের মত যোগদান করেন। মহাত্মা ও স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা সভার কার্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল।

পরের বৎসরের জন্য প্রধান যে কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইল গৃহে গৃহে সুতা-কাটা ও তাঁত-বোনার সম্প্রসারণ এবং কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁহার সদস্য-চাঁদা হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতা কাটার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বেলগাঁও কংগ্রেস সম্বন্ধে কেবল আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল কংগ্রেস কর্তৃক তাঁহার কমনওয়েলথ অব ইন্ডিয়া বিল অনুমোদন করাইয়া লইবার জন্য শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্তের চেষ্টা। এই বিলের খসড়া তিনিই তৈয়ারী করিয়াছিলেন,—যাহাতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা বলা হইয়াছিল,—এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল একটি বেসরকারী প্রস্তাব হিসাবে ইহাকে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস করাইয়া লওয়া। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাধের সংবিধানে যদি কংগ্রেসের অনুমোদনের ছাপ থাকে তাহা হইলে তাঁহার দাবী যথেষ্ট জোরদার হইবে, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কেহই তাঁহার জালে আকৃষ্ট হইলেন না। সুতরাং, তাঁহাকে নিরাশ হইয়া বেলগাঁও কংগ্রেস হইতে ফিরিতে হইল।

১৯২৫ সাল সুরু হওয়ার সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপরিবর্তিত ছিল। দেশবন্ধু দাশই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে বাঙলায় পুনরায় একটি শক্তিপরীক্ষা হইল গভর্নমেন্ট ও স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে বাঙলার গভর্নরকে সরাসরি গ্রেপ্তার ও বিনা-বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দিয়া গভর্নর-জেনারেল যে জরুরী আইন প্রচার করিয়াছিলেন উহা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯২৫ সালের এপ্রিলে। তাহার পর, বাঙলা গভর্নমেন্টের যদি ঐ সকল ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগকে ঐ মর্মে আইন প্রবর্তন করিতে হইবে। অতএব, যথারীতি একটি বিল আনা হইল এবং ইহাকে আইনে পরিণত করিবার জন্য গভর্নমেন্ট সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্যপন্থিগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু ছিলেন বলিয়া গভর্নমেন্টের আশা হইয়াছিল যে, আইন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। দেশবন্ধু তখন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগিতেছিলেন বলিয়া পাটনায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং গভর্নমেন্টকে একেবারে হারাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে তিনি পরিষদ-কক্ষে পৌঁছাইলেন এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীদের চেয়ারে করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। পুনরায় ঐদিন তিনি জয়মাল্য লাভ করিলেন। বিলটি অগ্রাহ্য হইল, কিন্তু শাসনতন্ত্রে গভর্নরকে প্রদত্ত অসাধারণ ক্ষমতাবলে তিনি ইহাকে আইন হিসাবে সুপারিশ করিতে সমর্থ হন।

এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যেই ফরিদপুরে বাঙলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন আহূত হয় এবং দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হেতু দেশবন্ধু দাশকে

সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। চিকিৎসকদের সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেখানে গিয়া আলোচনায় সভাপতিত্ব করার সঙ্কল্প করেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য কেন তিনি এত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন লোকে তখন বুঝিতে পারেন নাই। যাহা কিছুই তিনি বলিতেন, এমন কি পত্রিকার বিবৃতিও, তাঁহার প্রতি সমভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। যাহাই হউক, তিনি সেখানে যাইতে চাহিবার আসল কারণ ছিল এই যে, গভর্নমেন্টের সুবিধার্থে তাঁহাকে তাঁহার দাবীর একটি প্রকাশ্য ইঙ্গিত দিবার প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু, তিনি গভর্নমেন্টকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতে গভর্নমেন্ট বুঝিবেন যে, কোনও মীমাংসার লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে দেশবন্ধুর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন, কারণ বাঙলা ছিল তখন সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্র এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা চরমপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে ছিলেন। কাজেই, বাঙলায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইত, অন্যত্র কংগ্রেসীদের দ্বারা তাহা গৃহীত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। দেশবন্ধু দাশ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বাঙলার শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বরং নরম বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বনাম স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রথমটির পক্ষপাতী বলিয়া জানাইয়াছিলেন। উপরন্তু, তিনি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। সামগ্রিকভাবে বক্তৃতাটি গভর্নমেন্টের নিকট একটা আবেদন বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর চরমপন্থী তাঁহারা উহাকে মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আপোষমূলক মনোভাবপুষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যুব সম্প্রদায় ইহাকে স্বাগত জানাইলেন না এবং বিষয়টি যখন ভোটে দেওয়া হইল তখন তাঁহার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। তথাপি, সেই সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব এতই বিপুল এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে আন্তরিকতা এত স্পষ্ট ছিল যে, তাঁহার জয় হইল। যে কর্তৃপক্ষের সহিত দেশবন্ধু আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের নিকট ফরিদপুর সম্মেলনের আলোচনা মোটের উপর সন্তোষজনক মনে হইয়াছিল।

ইহার অনতিকাল পরে লর্ড রেডিং ভারত হইতে লন্ডনে গেলেন, কারণ রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা ও ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এরূপ গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশবন্ধু দাশ ও গভর্নমেন্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, যদিও বিস্তারিতভাবে কেহই কিছু জানিতেন না। বলা হইয়াছিল যে, লর্ড রেডিং-এর সহিত পরামর্শ করিবার পর লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘোষণা প্রচার

করিবেন। ভারতে প্রত্যেকেই গভীরতম আগ্রহ ও ঔৎসুক্য লইয়া তাঁহার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

অতঃপর বিনামেঘে বজ্রপাত হইল। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধু দাশ যখন বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন তখন তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সামান্য ভুগিবার পর হঠাৎই তিনি দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ শোকে নিমজ্জিত হইল। তিনি তাঁহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পেঁীছিয়াছিলেন এবং স্বদেশের বিরাট উপকার তিনি সাধন করিবেন, এরূপ আশা করা হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিতে দেশে যখন সভা ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি করা হইতেছিল তখন লন্ডনে বৃটিশ মন্ত্রিসভা তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের প্রধান শত্রু আর নাই; সুতরাং, কিছুদিনের জন্য এখন সব চুপচাপ থাকিবে। সেজন্য তাঁহারা তাড়াহুড়া করিয়া কিছু স্থির না করিয়া বরং ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছিল যে, ১৯২৫ সালের ৭ই জুলাই তারিখে লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিবেন। অতএব, মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে সযত্ন-রচিত ঘোষণাটি একেবারে চাপিয়া যাইতে হইল এবং ইহার পরিবর্তে পূর্বঘোষিত তারিখে লর্ড বার্কেন-হেড একটি মামুলি ভাষণ দিলেন। মামুলি কথা বলা ছাড়া তিনি ভারতের ব্যাধির জন্য শিল্পোন্নতি ও আর্থিক দৃঢ়তা আনিবার লর্ড রেডিং-এর সর্ব-রোগহর ঔষধকেই কেবল মাত্র অনুমোদন করিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু ছিল ভারতের পক্ষে বিরাটতম জাতীয় বিপর্যয়। যদিও তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মাত্র পাঁচ বৎসরের ছিল, তাঁহার সাফল্য ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা। বৈষ্ণবভক্তের অকুণ্ঠ ত্যাগ লইয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বরাজ্যের জন্য লড়াইয়ে তিনি কেবল নিজেকেই উৎসর্গ করেন নাই, তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে, পার্থিব সম্পত্তি যাহা কিছু তাঁহার অবশিষ্ট ছিল তিনি জাতিকে দান করিয়া যান। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করিতেন। তাঁহারা তাঁহার শক্তিকে ভয় করিতেন কিন্তু শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহার চরিত্রকে। তাঁহার কথার মূল্য কতখানি —ইহা তাঁহাদের অজানা ছিল না। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, যদিও তিনি একজন কঠোর সংগ্রামী ছিলেন, তাঁহার সংগ্রামের মধ্যে কোনও লুকোচুরি ছিল না; উপরন্তু, তিনি এমন একজন লোক ছিলেন যাঁহার সহিত মীমাংসার জন্য তাঁহারা দর কষাকষি করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, গভীর ও অভ্রান্ত ছিল তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি; এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ সচেতনতা ছিল,

যাহা মহাত্মার ছিল না। অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি ভাল জানিতেন যে, শত্রুর নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার মত অনুকূল সুযোগ বার বার আসে না এবং, যখন তাহা আসে, তখন বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যখন সঙ্কট স্থায়ী হয় তখন দর কষাকষি করিতে হয়। তিনি ইহাও জানিতেন যে, জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পেঁছে তখন মীমাংসায় উদ্যোগী হইলে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয় এবং ফলে কিছু অখ্যাতিও হইতে পারে। কিন্তু নির্ভীকতা ছিল তাঁহার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার যথার্থ ভূমিকা অর্থাৎ বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন রাজনীতিবিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং সেজন্যই অখ্যাতি বরণ করিয়া লইতে তিনি কখনও ভয় পান নাই।

দেশবন্ধুর সহিত তুলনায় মহাত্মার ভূমিকা অস্পষ্ট। অনেক ব্যাপারে তিনি একেবারে আদর্শবাদী ও কল্পনাবিলাসী। অন্যান্য বিষয়ে তিনি সুচতুর রাজনীতিবিদ। কখনও কখনও উন্মাদের মত দুর্দম; আবার কখনও কখনও শিশুর মত আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। রাজনৈতিক দর কষাকষির জন্য যে সহজাত বুদ্ধি কিংবা বিচারের আবশ্যক তাহা তাঁহার নাই। এই দর কষাকষির প্রকৃত সুযোগ যখন আসে, যেমন আসিয়াছিল ১৯২১ সালে, তখন সামান্য ব্যাপার তুলিয়া ধরার একটি ঝোঁক তাঁহার দেখা যায় এবং তদ্দ্বারা মীমাংসার সকল সম্ভাবনাকে তিনি বানচাল করিয়া দেন। যখনই তিনি দর কষাকষি চালান, ১৯৩১ সালে যেরূপ দেখা যাইবে, তখনই যতটা তিনি লাভ করেন তাহা হইতে অধিক তিনি দিয়া বসেন। মোটের উপর, কূটনীতিতে সুচতুর একজন বৃটিশ রাজনীতিবিদের সহিত তাঁহার কোনও তুলনা হয় না।

দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর পরলোকগত এই মহান নেতার সম্মানে একটা স্মৃতিভাণ্ডার গড়িয়া তোলার চেষ্টায় এবং তাঁহার অবর্তমানে কংগ্রেসের প্রশাসন-যন্ত্রের পুনর্গঠনে সাহায্যের জন্য মহাত্মা কয়েক মাস বাঙলায় কাটান। কিন্তু, তাঁহার জনসেবামূলক কাজকর্মের প্রকৃতি মোটের উপর রাজনৈতিক ছিল না এবং সেজন্য দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব আইনসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর উপর আসিয়া পড়িল। লর্ড রেডিং তখনও ইংলণ্ডেই ছিলেন এবং বাঙলার গভর্নর লর্ড লিটন ভারতের গভর্নর-জেনারেলরূপে কাজ করিতেছিলেন; সেই সময়ে পণ্ডিতজী, গভর্নমেন্টের সহিত দেশবন্ধু যে আলোচনা চালাইতেছিলেন, তাহার সূত্র ধরিয়া উহা পুনরারম্ভের চেষ্টা করেন। কিন্তু লন্ডনে গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই কিছুকালের জন্য আলোচনা বন্ধ রাখিয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর এই চেষ্টায় কোনও ফলই হইল না।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ১৯২৫ সালের জুন মাসটি একটি সন্ধিকাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে দেশবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্বের

অন্তর্ধান ছিল ভারতের পক্ষে এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য। যে স্বরাজ্য দল তাঁহার নিকট খুব বেশী ঋণী ছিল, উহা তাঁহার মৃত্যুর পর অচল হইয়া গেল এবং দলের মধ্যে ক্রমশঃই বিরোধ দেখা দিল। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে তাঁহার মৃত্যুকালে দল ছিল গর্ব করিবার মত একটি প্রতিষ্ঠান। বৃটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় মুখপত্র কলিকাতার **ক্যাপিটাল পত্রিকা** তাঁহার মৃত্যুর পর লিখিতে গিয়া স্বরাজ্য দলকে আয়ার্ল্যান্ডের সিন ফিন দলের সহিত তুলনা করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, পত্রিকার চল্লিশ বৎসরের আয়ুষ্কালের মধ্যে ইহার মত আর কিছু দেখা যায় নাই। পত্রিকাটির মতে, দলের শৃঙ্খলার ধরন ছিল জার্মানদিগের মত। স্বরাজ্য দল দুর্বল হওয়ায় ভারত ও ইংলন্ডে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জোরদার হইয়া উঠিল এবং, ভারতে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের বন্যা ছুটিল—যাহাকে তখনও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠতর শক্তির দ্বারা দমন করিয়া রাখা হইয়াছিল। আজ ১৯২৫ সালের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে ইহা আমরা অনুভব না করিয়া পারি না যে, দেশবন্ধু যদি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যরূপ হইত। জাতীয় ইতিহাসে কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে, কোনও বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব কিংবা মৃত্যুর দ্বারা প্রায়শঃই ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের এরূপ প্রভাব দেখা গিয়াছে।

অবসাদ[১] (১৯২৫-২৭)

১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর যেরূপ প্রভাব ছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজ্য দলের উত্থান একটি অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি দলের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যদিগের গভীরতম শ্রদ্ধা ছিল, তবু দলটি ছিল স্পষ্টতঃই গান্ধী-বিরোধী এবং রাজনীতি হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে মহাত্মাকে বাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার এই অবসর-গ্রহণ কার্যতঃ ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতা কংগ্রেস পর্যন্ত চলিয়াছিল। স্বরাজ্য দলের সাফল্যের গূঢ় কারণটি কি ছিল? ইহা বুঝিতে হইলে গান্ধীবাদের বাস্তব রূপ এবং ১৯২০-২২ সালে জনগণের মনে মহাত্মার ব্যক্তিত্বের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল এ সম্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

ইউরোপের মত হিন্দু সমাজে কখনও কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও সমস্ত লোকই অবতার[১], পুরোহিত ও 'গুরুদিগের'[২] দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত। ভারতে সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে 'ঋষি' কিংবা 'মহাত্মা' অথবা 'সাধু' বলা হইয়া থাকে। নানা কারণে, ভারতের অবিসংবাদী রাজনৈতিক নেতা হওয়ার পূর্বে গান্ধীজীকে সাধারণ লোক একজন মহাত্মা বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না তখনও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন: তিনি ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে তাঁহাকে 'শ্রীযুক্ত গান্ধী' বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং হাজার হাজার লোক চীৎকার করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া এই দাবী জানাইতে থাকেন যে, তাঁহাকে 'মহাত্মা গান্ধী' বলিতে

[১] অনেক হিন্দুর মতে, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই নরদেহ ধারণকারীদের অবতার বলা হইয়া থাকে। অন্যান্য হিন্দুর মতে, এই সকল অবতার দেবরূপে নহে, বরং মানবাত্মা লইয়া আবির্ভূত হন যাহা উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে—অর্থাৎ, যখন তাঁহারা পরমব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত নয়জন অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন—এবং বর্তমান কলিযুগের শেষে দশম অবতারের আবির্ভাব ঘটিবে।

[২] 'গুরু' হইতেছেন ধর্মাচার্য। ভারতেই কেবল প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ধর্মাচার্য হইতে পারেন।

হইবে। গান্ধীজীর কঠোর সংযম, সরল জীবন, নিরামিষ আহার, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা—সব কিছু মিলাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া এক ঋষিতুল্য মহিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অর্ধ-নগ্ন পোষাক এবং ভাষণদান কালে বসিবার ভঙ্গীটি খৃষ্ট ও বুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল বিপুল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি ও আনুগত্য জয় করা সম্ভব হইয়াছে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বিরাট ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের সাগ্রহ সমর্থনের ফলে এই বিরোধিতা ক্রমশঃই স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলার যেরূপ করিয়াছেন—ঠিক সেই ভাবে মহাত্মাও জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতির মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিতে গিয়া তিনি যে অস্ত্রকে কাজে লাগাইতেছিলেন তাহা যে তাঁহাকে প্রত্যাঘাত করিবে ইহা একরূপ নিশ্চিত ছিল। স্বদেশবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা ভারতের অধঃপতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী, তিনি তাহার অনেকগুলিরই সুযোগ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বাস্তব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে কেন? অদৃষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস—আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য—আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পিছাইয়া পড়া, এই সকলই তাহার অধঃপতনের কারণ। তাহার সঙ্গে ছিল পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তা হইতে উদ্ভূত নিরুপদ্রব আত্মসন্তুষ্টির ভাব এবং অহিংসার (non-violence) প্রতি মাত্রাজ্ঞানহীন অনুরাগ। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন উহার রাজনৈতিক মতবাদ—অসহযোগ প্রচার করিতে সুরু করে তখন বহু কংগ্রেসী এই নূতন মুক্তিদাতার মতের প্রচারক হইয়া উঠিলেন: তাঁহারা মহাত্মাকে কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই মানিয়া লন নাই বরং একজন ধর্মগুরু হিসাবেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে, বহু লোক মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া মহাত্মার মত পোষাক পরিয়া তাঁহার প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য প্রার্থনার মত দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক স্বরাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মুক্তির কথাই বেশী বলিতে থাকেন। দেশের কোনও কোনও অংশে অবতাররূপে তাঁহাকে পূজা করা হইতে থাকে। এই পাগলামি তখন এমনভাবে দেশকে পাইয়া বসিয়াছিল যে, বাঙলার মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রদেশে ১৯২৩ সালের এপ্রিলে যশোহর প্রাদেশিক সম্মেলনে এই মর্মে যখন একটি প্রস্তাব আনা হয় যে, আধ্যাত্মিক স্বরাজ নয় বরং রাজনৈতিক স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য, প্রস্তাবটি তুমুল বিতর্কের পর অগ্রাহ্য হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন জেলে ছিলেন তখন জেল বিভাগে যে সকল ভারতীয় ওয়ার্ডার কাজ করিত

তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিত না যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা স্থির বিশ্বাসের সহিত বলিত যে, যেহেতু গান্ধীজী একজন মহাত্মা সেজন্য তিনি যখন খুশী পাখীর রূপ ধরিয়া জেল হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারেন। রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে আর নিছক যুক্তিবাদের দ্বারা বিচার না করিয়া নৈতিক প্রশ্নের সহিত অনাবশ্যকভাবে জড়াইয়া ফেলা হইত, যাহার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাত্মা ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ বৃটিশদিগের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবে বলিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জনকে সমর্থন করিতেন না। এমন কি বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মত উচ্চ-জ্ঞানসম্পন্না নারীও ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতায় স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন যে, পরিষদগুলি 'মায়া'[১] ছাড়া আর কিছু নয়; সেখানে কংগ্রেসীরা আমলাতান্ত্রিক প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। উপরন্তু, সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যাহা হইয়াছিল তাহা এই যে, মহাত্মা যাহা কিছু বলিতেন তাহাকেই বিনা যুক্তিতর্কে বেদবাক্য মনে করা ও তাঁহার পত্রিকা '**ইয়ং ইন্ডিয়া**'-কে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ঝোঁক তাঁহার গোঁড়া ভক্তদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।

দুর্জ্ঞেয় ও অলৌকিক ব্যাপারসমূহে যে জাতির এত ঝোঁক, সুস্থ বিচার-বুদ্ধির বিকাশ ও জীবনের বাস্তব দিকের আধুনিকীকরণের মধ্যেই তাহাদের রাজনৈতিক মুক্তির একমাত্র আশা নিহিত। সেজন্য ইহা দেখিয়া বহু ধীরস্বভাব জাতীয়তাবাদী কষ্ট বোধ করিতেন যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহাত্মার প্রভাবের ফলে ভারতীয় চরিত্রের উপরোক্ত দুর্বল বৈশিষ্ট্যগুলি কিছু কিছু পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। এইরূপে মহাত্মা ও তাঁহার দর্শনের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের বিদ্রোহ দেখা দিল। যেহেতু স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হইয়াছিল সেই কারণে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি, মহাত্মার অযৌক্তিকতায় বিরক্ত হইয়া, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যাঁহারা আইন অমান্য অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক পথ পছন্দ করিতেন তাঁহারা ছিলেন দক্ষিণপন্থী এবং দেশবন্ধু তাঁহার সামাজিক মর্যাদা ও এডভোকেটের পেশার দরুন তাঁহাদের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত তরুণ, তাঁহারা বামপন্থী ছিলেন; তাঁহাদের নিকট মহাত্মার মতবাদ ও নীতি আধুনিক জগতের পক্ষে যথেষ্ট মূলধর্মী ছিল না এবং তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধুকে অধিকতর চরমপন্থী (অথবা বিপ্লবী) শক্তি বলিয়া মনে করিতেন। দেশবন্ধু দাশের অনন্য ব্যক্তিত্বের দ্বারাই

[১] 'মায়া'কে ইংরাজীতে বলা যায় illusion অথবা অসার বস্তু যাহা মোহ সৃষ্টি করিয়া প্রলুব্ধ করে।

গোঁড়া 'সংস্কার-বিরোধীদের' হাত হইতে কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা কাড়িয়া লওয়ার জন্য এই সকল বিভিন্ন উপাদানকে একটি দলের মধ্যে একত্র করিয়া নানা দিক হইতে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার বহুমুখী কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া অথবা যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া স্বরাজ্য দল গঠিত হইয়াছিল সেগুলিকে একত্রে ধরিয়া রাখার মত যথেষ্ট যোগ্যতা আর কাহারও ছিল না। ইহার ফলে মহাত্মা যতদিন পর্যন্ত তাঁহার স্বেচ্ছাবসর ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে ফিরিয়া আসেন নাই ততদিনই কেবল স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা বজায় ছিল। ১৯২৯ সালে তাঁহার পুনরাবির্ভাব ঘটিলে স্বরাজ্যপন্থী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কোনও প্রকার বাধা না দিয়াই আত্মসমর্পণ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু দেশে সর্বদিক দিয়া একটি হতাশাপূর্ণ সময়ের সূচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যদি ঠিক এই সঙ্কটকালে মহাত্মা গান্ধী দূরে সরিয়া না থাকিতেন তাহা হইলে অবস্থা অন্য রকম হইতে পারিত; কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, তিনি তাহা করেন নাই। অন্যান্য বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিলেও, স্বরাজ্য দলের মধ্যে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ছিল ঐক্য সাধনের একটি শক্তিশালী সূত্র। অধিকন্তু, তাঁহার ব্যক্তিত্ব দলের মনোভাবে একটি চরমপন্থী সুর আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অবর্তমানে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে সুরু করে। এই সকল বিরোধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হইল বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর ও পুণার শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ। মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থিগণ কোনও সময়েই স্বরাজ্য দলের 'ক্রমাগত, অবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ়' বাধাদানের নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা দেশবন্ধুকে ও তাঁহার নীতি বিনাবাক্যে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসের সময় লোকমান্য তিলক 'ইচ্ছামূলক সহযোগিতার' যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই নীতির অর্থ ছিল যে, দেশের স্বার্থে গভর্নমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করা হইবে; কিন্তু তাঁহাদের নীতি যদি জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহা হইলে অসহযোগিতা কিংবা বিরোধিতা করা হইবে। লোকমান্যের মৃত্যুর পর হইতেই মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থিগণ দেশবন্ধুকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং সেজন্যই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতনির্বিশেষে তাঁহার নীতির প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য জানাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যখন স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় ভক্তদের সহিত মতবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতে থাকে: তাহার পর এক অশুভ

মুহূর্তে পণ্ডিতজী তাঁহাদের সম্বন্ধে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন এবং তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগত আকস্মিক ক্রোধবশতঃ ঘোষণা করিয়া বসেন যে, 'স্বরাজ্য দলের রুগ্ন অংশটিকে (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী) কাটিয়া বাদ দেওয়া হইবে।' এই বিবৃতিতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এত অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহারা পণ্ডিতজী ও স্বরাজ্য দলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ও সহযোগিতাবাদী দল গঠন করার সংকল্প করেন। পরে স্বরাজ্য দলের মধ্যে অন্যান্য বহু বিরোধও দেখা গিয়াছিল। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, যদিও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু উচ্চতর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিবার মত ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল তবু তাঁহার মধ্যে ভাবাবেগের সেই আবেদন ছিল না, কেবল যাহার দ্বারাই ভালমন্দ যে কোনও অবস্থায় দলের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধু ছিলেন ঐক্যের উৎস। তাঁহার যে 'বাঙলা চুক্তি' ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয় কিন্তু ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে তাহা হইতে সকল মুসলমান বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই তাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু। এরূপ একজন ব্যক্তির উপর স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব ছিল বলিয়াই ঐ দলের পক্ষে মুসলমানদিগের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলে বহু মুসলমান সদস্য ছিলেন যাঁহারা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্য দলের উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্বের আর সেই আস্থা রহিল না। উপরন্তু, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল উহা সাম্প্রদায়িকতার প্রবল স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর উহার প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দুর্ভাগ্যক্রমে দলের চরমপন্থী সুরটিও নরম হইয়া আসিল। স্বরাজ্য দলের জন্মের সময় দক্ষিণ ও বাম উভয়গোষ্ঠী হইতেই ইহার সদস্য হইয়াছিলেন। নেতার জীবদ্দশায় বাম-পন্থীদের প্রাধান্য ছিল কারণ তিনি নিজে ছিলেন ঐ দলের। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে দক্ষিণপন্থিগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হন। যে সকল লোক সাধারণতঃ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন এবং ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এরূপ কোনও কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সংকটের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের পক্ষেও আগাইয়া আসা সম্ভব হয়। বাঙ্গলায় কিছুকালের জন্য বামপন্থিগণ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন কেন না কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের গোষ্ঠীভুক্ত তাঁহাদের অনেকেই হয় ১৮১৮-র ৩নং ধারায় নতুবা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী ছিলেন।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি হইতে সুরু করিয়া স্বরাজ্যপন্থীদের অবিমিশ্র বাধাদানের মূলনীতি ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া আসিতেছিল। জুন মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্কীন কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন; ভারতীয়দিগকে লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক ঐ কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহার পর অচিরেই মধ্য প্রদেশের স্বরাজ্য দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত এস. বি. তাম্বেকে[১] গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যপদে নিয়োগ করা হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকার ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট স্বরাজ্যপন্থী নেতাগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় আইন সভাকে ইহার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং শ্রীযুক্ত বীঠলভাই জে. প্যাটেল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া যথারীতি ঐ পদে নির্বাচিত হন; স্বরাজ্য দলে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা খাঁটি প্রতিরোধবাদী ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। যদিও ঐ পদ গ্রহণের অর্থ ছিল গভর্নমেন্টের সহিত আংশিক সহযোগিতা,—তথাপি শ্রীযুক্ত প্যাটেল এরূপ আশ্চর্য দক্ষতা ও বিশেষ সাফল্যের সহিত তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘন না করিয়া ও একান্ত ন্যায়নিষ্ঠার সহিত সর্বদা কাজ করিলেও তাঁহার স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন মত-প্রকাশের জন্য অর্থ দপ্তর তাঁহাকে ভয় করিতে সুরু করিয়াছিল। স্বরাজ্য দল তাঁহার কার্যকালে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা সভাপতি হিসাবে তাঁহার কার্যের জন্যই বহুল পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল। জঘন্য একটি শাসনতন্ত্র লইয়া সংবিধানীয় কোনও নজির ব্যতিরেকেই শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে কাজ করিতে হইলেও সভায় সদস্যদিগের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ভার তিনি সাফল্যের সহিত বহন করিতে সমর্থ হন: এবং স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল ও উহার নেতা যে মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাকেন তিনি তাহা তাঁহাদিগকে দেন।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুডিম্যান কমিটি রূপে সুপরিচিত, সংস্কার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আইন সভায় পেশ করা হয়। কমিটির অধিকাংশ সদস্য যে রিপোর্ট তৈয়ারী করিয়াছিলেন উহা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান প্রস্তাব আনেন এবং উহার যে সংশোধনী প্রস্তাব স্বরাজ্যপন্থী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু উত্থাপন করেন তাহাকে 'জাতীয় দাবী' বলা হয়। আইন সভার সদস্যদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বরাজ্যপন্থী ছিলেন না তাঁহাদের সহিত আপোষের ফলেই পণ্ডিতজীর এই জাতীয় দাবী রচিত হইয়াছিল এবং ইহা ছিল বেসরকারী সদস্যদিগের মধ্যে

[১] পরে যখন মধ্য-প্রদেশের গভর্ণর কয়েক মাসের ছুটিতে ইংলণ্ডে যান তখন শ্রীযুক্ত তাম্বে ঐ প্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর হইয়াছিলেন।

সর্বাধিক সংখ্যকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চুক্তিব্যবস্থা। জাতীয় দাবীর মর্ম ছিল, —শাসনতান্ত্রিক সংস্কার—যদ্দ্বারা কার্যতঃ অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে—বৃটিশ পার্লামেন্ট ইহা মানিয়া লইবে এবং সংস্কার কার্যকর করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি গোল টেবিল বৈঠক ডাকা হইবে। সেই সময়ে আইন সভায় সরকারী মুখপাত্র ও পরে বড়লাট এই দাবীর যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে বস্তুত এই দাবী অগ্রাহ্য করা হয়।

ঐ বৎসরটি শেষ হইবার পূর্বে স্বরাজ্যপন্থী হিসাবে লালা লাজপৎ রায় ভারতীয় আইন সভায় যোগদান করেন এবং দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। প্রায় এই সময়েই শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর ও শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকারের নেতৃত্বে সহযোগিতাবাদী দলের সুরু হয়: এ পর্যন্ত তাঁহারা স্বরাজ্যপন্থী নেতা ছিলেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে দুইটি প্রধান বিষয়ে এই দলের মতপার্থক্য হয়। আইন সভাগুলিতে নির্বিচারে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার যে নীতি স্বরাজ্যপন্থীদের ছিল তাহার বিরুদ্ধে পার্থক্যমূলক বিরোধিতার কথা ইঁহারা বলেন। অধিকন্তু, স্বরাজ্য দল অথবা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলমান-ঘেঁষা মনোভাব ইঁহারা অনুমোদন করেন নাই—হিন্দু মহাসভার সহিতই বরং ইঁহাদের অধিকতর মিল পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৫ সালে ও তাহার পরে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হওয়ায় আরও অনেক হিন্দু কংগ্রেসী হিন্দুমহাসভায় যোগ দিতে বাধ্য হন; এবং সাধারণভাবে, হিন্দুমহাসভার রাজনীতি হইতে সহযোগিতাবাদী দলের রাজনীতির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হিন্দুমহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দল উভয়েই মনে করিত যে, মুসলমান সম্প্রদায় গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতার দ্বারা তাহাদের অবস্থা শক্তিশালী, এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নির্বিচার বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দুদের জন্য কোনও কিছুই করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফজিল হুসেনের আচরণের ফলে এই মনোভাব দৃঢ় হইয়াছিল; তিনি পাঞ্জাবে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও শিখের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রদেশের মুসলমানদিগের জন্য বহু সুবিধা করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে মুসলিম লীগের বৈঠকে যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করা হয় তাহার ফলে হিন্দু-মহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দলের সৃষ্টিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আরও সমর্থন জানানো হয়; ঐ বৈঠকে মৌলানা মহম্মদ আলি, শ্রীযুক্ত এম. এ. জিন্না, স্যার আব্দার রহিম ও স্যার আলি ইমামের মত বিশিষ্ট নেতাগণ অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইনসভাগুলির পরবর্তী নির্বাচন ১৯২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল, সেজন্য এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব কি হইবে তাহা ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে স্থির করিতে হইয়াছিল। নির্বাচন পরিচালনার ভার স্বরাজ্য দলের উপর ছাড়িয়া না দিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই গ্রহণ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর[১] সভানেতৃত্বে কানপুর কংগ্রেস বিনা বাদবিতণ্ডায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল, কেন না ইতিমধ্যেই মহাত্মা ও তাঁহার গোঁড়া ভক্তদিগের বিরোধিতা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল; তবে আইন-সভাগুলিতে কি নীতি অনুসৃত হইবে এই প্রশ্নটি আলোড়ন তুলিয়াছিল। স্বরাজ্য দল কর্তৃক পূর্বঘোষিত তীব্র বিরোধিতা কিংবা অসহযোগের নীতি অথবা নবগঠিত সহযোগিতাবাদী দল কর্তৃক প্রচারিত বৈষম্যমূলক বিরোধিতা —কিংবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতার নীতি? স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে সমর্থন জানাইতে আগাইয়া আসিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও লালা লাজপৎ রায়; পক্ষান্তরে, তাঁহাদের বিরোধী রূপে দেখা দিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও শ্রীযুক্ত কেলকার। প্রথমোক্তদের জয় হইল কিন্তু এক বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই লালা লাজপৎ রায় স্বরাজ্য দল ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত মালব্যের[২] সহিত একযোগে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন; মধ্য ও পশ্চিম ভারতে সহযোগিতাবাদী দলের যে ভূমিকা ছিল উত্তর ভারতেও সেই একই ভূমিকায় ঐ দল অবতীর্ণ হইয়াছিল। লালা লাজপৎ রায় যখন স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেন তখন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ দলে যোগদান করেন। তিনি হইতেছেন মাদ্রাজের প্রাক্তন এডভোকেট-জেনারেল[৩] ও ঐ প্রদেশের আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। ১৯২৬ সালে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার আইন সভার নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দলের সহকারী নেতা এবং ইহার পর শীঘ্রই কংগ্রেসের ১৯২৬ সালের অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন; ঐ অধিবেশন আসামের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

[১] কংগ্রেসের সভানেত্রীদের মধ্যে শ্রীযুক্তা নাইডু দ্বিতীয়া; প্রথম হইতেছেন শ্রীযুক্তা বেসান্ত—যিনি ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীযুক্তা নাইডু ১৯২০ সাল হইতেই অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠতম অনুরাগীদের একজন এবং একটানা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যা হইয়া আসিতেছেন।

[২] পণ্ডিত মালব্য যদিও একজন প্রবীণ কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন, তবু তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি আইন সভার সদস্য থাকিলেও স্বরাজ্য দলে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে তিনি কাজ চালাইয়া যান। লালা লাজপৎ রায়ের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ এবং হিন্দু মহাসভার প্রভাবের ফলে।

[৩] মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেলের পদমর্যাদা ইংলণ্ডের সলিসিটর-জেনারেলের পদমর্যাদার সমান হইবে।

দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর গভর্নমেন্টের সাধারণ মনোভাব ছিল মোটের উপর প্রতিক্রিয়াশীল। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল অন্তঃশুল্ক রদের ব্যাপারে; ঐ শুভ ঘটনা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে ঘটিয়াছিল। ১৮৯৪ সালে প্রথম ভারতীয় মিলগুলিতে তৈয়ারী বস্ত্রের উপর কর হিসাবে এই অন্তঃশুল্ক চাপানো হইয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহ হইলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বস্ত্রশিল্প ভারতের দেশীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সমান তালে তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় উহাকে সাহায্য করা। ১৯১৬ সাল হইতে ভারতীয় মিলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের অন্তঃশুল্ক অপেক্ষা আমদানী বস্ত্রের উচ্চতর শুল্ক-হার নির্দিষ্ট থাকিলেও, ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ, বিশেষতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইহাতে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে ভারতীয় বস্ত্রব্যবসায়ীদের নিকট এই শুল্ক-রদ ছিল সান্ত্বনাস্বরূপ। ভারত বা ইংলন্ডের গভর্নমেন্ট এই আইনের অতিরিক্ত আর কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখান নাই। যাহাই হউক, ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীযুক্তা বেসান্ত যে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিয়া বিলের খসড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন উহা গ্রহণ করিয়া শ্রমিক দল সৌহার্দ্যের পরিচয় দিলেন এবং হাউস অব কমনসে ইহাকে একটা বেসরকারী বিল হিসাবে উত্থাপন করার জন্য শ্রীযুক্ত জর্জ ল্যান্সবেরিকে ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এই বিলের আলোচনা হয়, কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হইল না। যাহা হউক, সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে ইহার কিছু মূল্য ছিল।

১৯২৬ সালের ইতিহাস প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ইতিহাস। সর্বত্রই যেরূপ হইয়া থাকে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঢিলা পড়িতেই আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন ও কলহে জাতির কর্মশক্তি তৎপর হইয়া উঠিল। ১৯২৪ সালে তুর্কীরা খলিফার পদ লোপ করায় ভারতে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দিগের অনেকে খিলাফৎ আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া জাতীয়তাবাদী কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানগণের সহিত খিলাফৎ কমিটিগুলি চালাইয়া যাইতে লাগিলেন,—যেমন বোম্বাইয়ে মৌলানা সৌকৎ আলি করিয়াছিলেন; এবং তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহারা বিভিন্ন নামে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল অন্যান্য বহু সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ একটি আন্দোলন দেখা দিল এবং সারা ভারতে হিন্দুমহাসভার শাখা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান প্রতিপক্ষের মত, এ পর্যন্ত যাঁহারা জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাঁহাদের লইয়াই শুধু যে হিন্দুমহাসভা গঠিত হইয়াছিল তাহাই নহে, এমন আরও অনেকে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

করিতে ভয় পাইতেন এবং নিজেদের জন্য অধিকতর নিরাপদ সংগঠন চাহিতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিস্তারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। স্বার্থসংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ যাঁহারা তাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই চলুক ইহা তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যাহাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ যে সকল কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইত সেগুলি ছিল গো-হত্যা—যাহাতে হিন্দুগণ নিদারুণ ক্ষুব্ধ হইতেন এবং নমাজের সময় মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো—যাহা মুসলমানদিগের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিত। যে কোনও প্রকারে মুসলমানের মসজিদ কিংবা হিন্দুমন্দির কলুষিত হইলেও সংঘর্ষ বাধিয়া যাইত। কোনও বিশেষ অঞ্চলে একবার যদি এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইত তাহা হইলে এরূপ ঘটনা সহজেই ছড়াইয়া পড়িয়া সাম্প্রদায়িক বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিত এবং এই জঘন্য বৃত্তির জন্য চর নিযুক্ত করা তৃতীয় পক্ষের নিকট কঠিন হইত না।

১৯২৬ সালের ঘটনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইল মে ও পুনরায় জুলাই মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। আর্য সমাজের[১] এক শোভাযাত্রা লইয়া অশান্তির শুরু হইয়াছিল—যাঁহারা মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বাজনা বাজাইয়াছিলেন। তাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন যে, বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ঐ শোভাযাত্রা শান্তিতে করিয়া আসিতেছিলেন। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ বলিয়াছিলেন যে, ঐ বাজনার ফলে মসজিদের ভিতরে তাঁহাদের নমাজ পড়ার অসুবিধা হইয়া থাকে। বহুদিন ধরিয়া এই দাঙ্গা চলিল এবং উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দুই পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহারা শান্তি স্থাপন করিলেন। যদিও কলিকাতার মত আর কোথাও পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হইয়া উঠে নাই, সারা দেশেই যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কংগ্রেস দলের পক্ষে ইহা ছিল এক দুঃসময়। নভেম্বরে আইনসভাগুলির নির্বাচন হওয়ার কথা এবং হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় ইহা হইতে চলিয়াছিল। কংগ্রেসীদের পক্ষে ১৯২৩ সালের মত এই নির্বাচন সহজ ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ও মুসলমানদিগের নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রার্থী দাঁড় করাইবেন। ১৯২৬ সালের নির্বাচনকালে এক শ্রেণীর মুসলমান এই মর্মে জোর প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন যে, যদি হিন্দুরা গভর্নমেন্টের সহিত অসহযোগ চালাইয়া যাইতে থাকেন তাহা হইলে হিন্দুদের সহিত তাঁহারা যোগ দিবেন না, তাঁহারা শাসনতন্ত্র কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। অপর

[১] ভূমিকার ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, আর্য সমাজ হিন্দুদের মধ্যে একটি সংস্কার সম্প্রদায়; উত্তর ভারতে ইহার বহু অনুগামী আছেন।

দিকে, হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে এই রব তোলা হয় যে, হিন্দুরা যদি সহযোগিতা না করেন তাহা হইলে মুসলমানগণ গভর্নমেন্টের সাহায্য পাইবেন বলিয়া তাঁহাদের তুলনায় হিন্দুরা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন। সেজন্য হিন্দুমহাসভা স্বরাজ্যপন্থীদের অসহযোগের নীতি পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। তথাপি, ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলমান ভোটদাতাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির প্রভাব প্রবলতর প্রমাণিত হইলেও হিন্দু ভোটদাতাদের মধ্যে হিন্দুমহাসভার তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাবই অনেক বেশী ছিল।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় উহাতে জাতীয়তাবাদিগণ কংগ্রেসের নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় প্রাদেশিক আইনসভাগুলির অনেকগুলিতেই তাঁহাদের শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়—যথা, মাদ্রাজ ও বিহারে। কংগ্রেসীদের মধ্যে সকল গোষ্ঠীর ঐকান্তিক সহযোগিতাই এই উন্নতির কারণ; ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল যখন নির্বাচন পরিচালনা করে তখন এইরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এক দিক হইতে নির্বাচনের ফলাফল ১৯২৩ সাল অপেক্ষা খারাপ হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে বহু সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন কিন্তু ১৯২৬ সালে ঐ আসনগুলি সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বধর্মীদিগের দ্বারা পূর্ণ হয়। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মত প্রদেশগুলিতে—যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বহু মুসলমান রহিয়াছেন—আইনসভাগুলির ভিতরের অবস্থা কংগ্রেস দলের অনুকূলে যায় নাই। যে মধ্যপ্রদেশ স্বরাজ্যবাদের ঘাঁটি ছিল সেখানে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কতক অংশে সহযোগবাদী দলের সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে সহযোগবাদী দলের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি মুসলমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হওয়ায় গভর্নমেন্টের পক্ষে এই দুইটি প্রদেশে মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল; তিন বৎসর যাবৎ এই দুটি প্রদেশে কোনও মন্ত্রী ছিলেন না। ভারতীয় আইন সভায়ও একদিকে সহযোগবাদীদের দল ও অপর দিকে মুসলমানদিগের একটি গোষ্ঠী তৈয়ারী হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; যাহার ফলে আইন সভায় গভর্নমেন্টের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। আইন সভাগুলি বাদ দিলেও, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদিগের মধ্যেও কিছু ভাঙ্গন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও মধ্যপ্রদেশের মত প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদী দলের কার্যকলাপই ইহার জন্য দায়ী। বাঙ্গলার মত যে প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদীদের প্রভাব সামান্য ছিল, সে সকল স্থানে কংগ্রেস দলের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির জন্যই এই ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। বাঙ্গলায় দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর, মহাত্মার

প্রভাবে ও সমর্থনে স্বর্গত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভ করেন। ঐ দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বৎসর না যাইতেই তাঁহার নেতৃত্বের বিরোধিতা সুরু হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধিতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে দানা বাঁধিয়া উঠে; এক সময়ে বাঙ্গলার কংগ্রেস মহলে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই লড়াই চলে। বাঙ্গলায় কিছুদিনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা পৌরসভার নির্বাচনে দুই দল কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করানো হয়। এই লড়াইয়ে শ্রীযুক্ত শাসমলের দল পরাজিত হওয়ায় কিছুকালের জন্য তিনি একেবারে চুপচাপ হইয়া যান।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যখন এই দলাদলি লাগিয়া ছিল তখন নেতৃবৃন্দ কঠোর এক পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন। এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, ঘটনার গতিরোধ করা অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ ও আগের বৎসর দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুতে তাঁহাদের নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এই দায়িত্বের ধাক্কা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকেই সামলাইতে হইয়াছিল। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইন সভায় তাঁহার দ্বারা উত্থাপিত জাতীয় দাবী গভর্নমেন্ট কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার করণীয় কি ছিল? এরূপ অবস্থা তাঁহার ছিল না যে, দেশে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিতে পারেন। কাজেই, গভর্নমেন্টের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি আইন সভা হইতে সরিয়া আসা স্থির করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের অনেক বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল—কিন্তু গভর্নমেন্টের নীতিতে একমাত্র হীন সম্মতি প্রকাশ করা ব্যতীত এই ব্যবস্থার কোনও বিকল্প যে ছিল না, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে এক বক্তৃতা দিবার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সকল স্বরাজ্যপন্থী সদস্যকে লইয়া আইন সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; ঐ বক্তৃতা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ যদিও খানিকটা ব্যর্থতার সুর ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইন সভায় এই নীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাদেশিক আইন সভাগুলি হইতেও স্বরাজ্য দল বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু ১৯২৬ সালের দুর্যোগের আঁধারেও আশার রেশ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অশান্তি সত্ত্বেও, অতি দ্রুত খাদির উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছিল। অন্যান্য চিন্তা হইতে মুক্ত থাকায় মহাত্মার পক্ষে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বে সারা দেশে অল-ইন্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশনের শাখা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সংগঠনের মধ্য দিয়া মহাত্মা পুনরায় তাঁহার নিজের দল গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তিনি যখন কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা পুনর্বার দখল করিতে চাহিলেন তখন এই দল যে সাহায্য

করিয়াছিল তাহা অমূল্য। বহু লোক কংগ্রেস দল ত্যাগ করায় আংশিক ক্ষতি-পূরণের জন্য প্রায় এই সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সর্বান্তঃকরণে দলে যোগদান করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তাঁহার খ্যাতি ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং ইহা তিনি কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁহার সাহায্যের ফলে ঐ প্রদেশে আন্দোলন খুবই জোরদার হইয়া উঠে এবং ব্যবস্থাপক সভায় একটি শক্তিশালী কংগ্রেস দল গঠিত হয়। ব্যবস্থা পরিষদে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত কংগ্রেস দলের সহকারী নেতার কর্তব্য সম্পাদন করেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর সারা দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকিতে হয়। এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়: ১৯২৬[১] সালে মহাত্মার সহিত তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি সুরু হইলেও ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ঐ বৎসরের সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক লক্ষণ ছিল সমগ্র দেশব্যাপী যুব সমাজের মধ্যে জাগরণ। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শ্রেণীর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের নির্মল বায়ুতে জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করা। এই যুব আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু সর্বত্রই ইহার প্রেরণা ছিল এক। চরম দুরবস্থার প্রতি অধৈর্য ও বিদ্রোহের ভাব, আত্মবিশ্বাস-বোধ এবং স্বদেশের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত হয়। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভা নামে এই আন্দোলন সুরু হয়, যাহা পরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে যুব সম্প্রদায় তাঁহাদের নিজ দায়িত্বে যে আন্দোলন সুরু করেন উহাকে অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ বলা হইয়াছিল। যে অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র রাখা বা বহন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তাহা অমান্য করা; এবং ইহা সুরু করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত আওয়ারি নামে স্থানীয় একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা যাঁহাকে তাঁহার অনুগামিগণ 'জেনারেল' আখ্যা দিয়াছিলেন। আন্দোলনের সূচনায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, বাঙলায় বহু সংখ্যক দেশসেবককে বিনা বিচারে আটক করিয়া গভর্নমেন্ট যে আচরণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করা হইতেছে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের নূতন বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড

[১] সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে হিন্দু-মুসলমানের দাংগা লইয়াই মহাত্মা ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এই বিতর্কে আলি ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমানদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিযোগ ছিল যে, মহাত্মা হিন্দুদের পক্ষ লইয়াছেন।

আরুইন; তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড রেডিং হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গভর্নমেন্ট ১৯২৭ সালেও তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালু রাখিলেন। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে স্কীন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল; উহাতে সুপারিশ করা হইল যে, আগামী পঁচিশ বৎসরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অর্ধেক সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দিগকে লইয়া গঠিত হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সেনা-বাহিনীর চীফ অব স্টাফ ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট আশাপ্রদ ছিল না এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইহাতে স্বাক্ষর করেন নাই; রিপোর্টের খসড়া তৈয়ারী হইবার পূর্বেই তিনি কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিটি যে সামান্য সুপারিশটুকু করিয়াছিলেন তাহাও ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের অনুরোধে কার্যকর করা হইল না। নিম্নলিখিত ব্যাপারটি হইতে গভর্নমেন্টের কপটতা আরও স্পষ্ট হইবে: স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু যখন বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য ছিলেন তখন সেনাবিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয়দের লইয়া পুরা সৈন্যবাহিনী গঠন করা যাইতে পারিত।

গভর্নমেন্ট ১৯২৭ সালে আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন—তাহা হইল টাকার মূল্য ১ শিঃ ৬ পেঃ নির্ধারণ; এই ব্যবস্থা সাদরে গৃহীত হইল না। চিরাচরিত বিনিময় হার ছিল ১ শিঃ ৪ পেঃ যাহা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। জনগণের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া টাকার মূল্য গভর্নমেন্ট শতকরা ১২½ ভাগ হ্রাস করার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারতের বাণিজ্যে আমদানীর হার স্বাভাবিকভাবেই বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহাই একমাত্র অসুবিধা ছিল না। এই নূতন হার চালু হওয়ার ফলে বিশ্বের বাজারের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতীয় কৃষক পূর্বাপেক্ষা অনেক কম অর্থ পাইতেন এবং ফলে ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পাইল। ইহা সন্দেহাতীত যে, এই নূতন হার প্রবর্তনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নূতন হার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট তাঁহার মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অংগ হিসাবে একটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ভারতীয় আইন সভা এই বিলকে[১] নাকচ করিয়া দেয় এবং বড়লাট তাঁহার 'সুপারিশের' দ্বারা ইহাকে আইনে পরিণত করেন নাই।

[১] আইন-সভার অধ্যক্ষ ভি. জে. প্যাটেল বিলটিকে প্রথমে বৈধতার কারণে নাকচ করিয়া দেন, পরে ইহা পরিবর্তিত আকারে পুনরায় উত্থাপিত হয়। কংগ্রেস দল ব্যাঙ্ক পরিচালনা সংক্রান্ত ধারাটিকে বাতিল করিয়া দিতে কৃতকার্য হইলে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট বিলটি প্রত্যাহার করিয়া লন।

১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে একমাত্র যে ঘটনাকে কতকটা সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে তাহা হইল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপটাউন চুক্তি। গোঁড়া জাতীয়তাবাদী জেনারেল হার্টজগের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ও তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করার দ্বৈতনীতি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এক প্রতিনিধি দল ভারত হইতে পাঠানো হইয়াছিল; ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা, মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী ও স্যার জর্জ প্যাডিসন। তাঁহাদের আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত চুক্তি হইয়াছিল। ভারতীয়দিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য যে অঞ্চল সংরক্ষণ আইনটি তৈয়ারী হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট উহা একেবারে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু, ভারতীয়গণকে দেশত্যাগ করিতে উৎসাহিত করা হইবে, যদিও পূর্বাপেক্ষা অধিক বোনাসের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মিয়াছেন এবং ঐ দেশকেই স্বদেশ করিয়া লইতে চাহেন তাঁহাদের 'শ্বেতাঙ্গদিগের' ন্যায় জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্য গভর্নমেন্টকে সাহায্য করিতে হইবে। চুক্তিটি কেবল অংশতঃ সন্তোষজনক হইলেও মন্দের ভাল হইয়াছিল এবং বড়লাট লর্ড এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। চুক্তিতে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গভর্নমেন্টের একজন 'এজেন্ট' থাকিবেন এবং শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে প্রথম 'এজেন্ট'-রূপে ভারত হইতে পাঠানো হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলন্ড ১৯২৭ সালে রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহার পর হইতেই ভারতে কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ায় এবং শ্রমিক অশান্তি বৃদ্ধির ফলে এইরূপ কার্যকলাপ চালাইবার সুবিধা হইয়াছিল।

৭

বর্মায় বন্দিজীবন[১] (১৯২৫-২৭)

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর অতি প্রত্যূষে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলা হইল যে কয়েকজন পুলিস-অফিসার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। আমি উপস্থিত হইলে কলিকাতার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস বলিলেনঃ 'মিঃ বোস, আমাকে খুবই অপ্রীতিকর একটা কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। ১৮১৮-র ৩নং ধারানুসারে আপনার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।' অতঃপর তিনি আর একটি পরোয়ানা বাহির করিলেন যাহাতে তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, গোলাগুলি ইত্যাদির জন্য আমার গৃহ তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া না যাওয়ায় তাঁহাকে কিছু কাগজপত্র ও চিঠি লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার নিজের গাড়ীতে করিয়া জেলে লইয়া গেলেন, কিন্তু আমার এই গ্রেপ্তার এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, পরিচিত যাঁহাদেরই সহিত রাস্তায় দেখা হইল তাঁহারা কোনও ক্রমেই অনুমান করেন নাই যে, আমার গন্তব্যস্থল ছিল আলিপুরে মহামান্য সরকার বাহাদুরের জেলখানা। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে অন্যান্য আরও অনেকের আমার মতই দশা হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদিগকে পাইয়া জেল কর্তৃপক্ষ খুশী হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। জেলের আর সব বাসিন্দা হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি করিতে হইয়াছিল, এবং সেখানে অতিরিক্ত কোন স্থানও ছিল না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যাবেলা যখন আমাদের সেলে পুরিবার সময় হইল তখন (জেলে সঙ্গীর মত প্রীতিকর আর কিছুই নাই) সংখ্যায় আমরা আঠারো জন হইয়াছি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ হইল।

সেই সময়ে আমি কলিকাতা পৌরসভার চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম বলিয়া আমার এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে পৌরসভার কাজকর্মে অসুবিধা হইল। গভর্নমেন্ট সেজন্য বিশেষ আদেশ দিলেন যে, ডিসেম্বরের সুরু পর্যন্ত

[১] বর্তমান গ্রন্থের লেখক আটবার জেলে গিয়াছেন কিন্তু এখানে কেবল একটি অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী তিনি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কারণ অন্যান্যগুলি অপেক্ষা ইহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

আমি আমার অফিসের কাজকর্ম জেলে করিতে পারিব এবং আমার সেক্রেটারী মধ্যে মধ্যে অফিসের ফাইল ও নথিপত্র সহ আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় জেল-অফিসার ব্যতীত একজন পুলিস-অফিসার উপস্থিত থাকিবেন, এবং সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অবাঞ্ছিত পুলিস-অফিসারদের কাহারও কাহারও উপর এই সাক্ষাৎকার পরিচালনা করার ভার পড়িত। তাহাদের সহিত প্রায়ই আমার গোলমাল বাধিত এবং অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থা আমাকে সহ্য করিতে হইত; উপরন্তু কখনও কখনও তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও অশিষ্টতার জন্য ভর্ৎসনাও করিতে হইত। শাস্তিস্বরূপ আমাকে প্রদেশাভ্যন্তরে আর একটি জেলে (বহরমপুর জেল) বদলির আদেশ দেওয়া হইল—যেখানে সকলের পক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ করা কঠিন হইবে। কি আলিপুর কি বহরমপুর—কোথাও জেল-কর্মীদিগের সহিত আমার বিশেষ গোলমাল হয় নাই। গভর্নমেন্টের আদেশগুলির মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু অপমানকর ছিল কিন্তু উহার জন্য আমরা জেল-কর্মীদের দোষারোপ করি নাই। যাহাই হউক, বহরমপুরে পুলিস-অফিসারদের সহিত আমার গোলমাল চলিতেই লাগিল। আমার বেশীর ভাগ সময় পড়াশুনায় কাটিত এবং জেল হইতে বাহির হইয়া পুনরায় যে কাজ আমরা করিব সে সম্বন্ধে বহু পরিকল্পনা লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত গ্রেপ্তার চলিবার ফলে জেলের অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং আমাদের পক্ষে ইহা খুবই আনন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। দুই মাসের অধিক আমাকে বহরমপুরে থাকিতে হয় নাই। ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী অকস্মাৎ আমার কলিকাতায় বদলির হুকুম হইল। যাত্রাপথে দারুণ বিস্ময়ের সহিত অবগত হইলাম যে, আমার প্রকৃত গন্তব্যস্থল হইতেছে উত্তর ব্রহ্মের মান্দালয় জেল। মধ্যরাত্রে কলিকাতা পৌঁছিলাম এবং রাত্রিটা কাটাইবার জন্য আমাকে লালবাজার থানায় লইয়া যাওয়া হইল। ঐ থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হইয়াছিল উহা ছিল একটি নোংরা অন্ধকূপ এবং মশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষেব জন্যও চোখের পাতা এক করা সম্ভব হয় নাই। নর্দমাদির ব্যবস্থা মারাত্মক রকমের খারাপ ছিল এবং গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বে অন্যেরা যেরূপ বলিয়াছেন,—পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তাহা হইতেছে লালবাজার থানা—ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব হইল। শুইয়া শুইয়া যখন সময় কাটাইবার জন্য ঘরের কড়িকাঠ গুনিতেছিলাম তখন পাশের একটি ঘরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সদাশয় গভর্নমেন্ট ত এখানেও আমার জন্য সঙ্গী পাঠাইয়াছেন! অতি প্রত্যূষে—ফর্সা হইবার পূর্বে,—একজন পুলিস-অফিসার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট-ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস শ্রীযুক্ত লোম্যান; পরে আমরা জানিলাম যে

তাঁহার উপর আমাদিগকে প্রহরাধীনে মান্দালয়ে লইয়া যাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে। সেলের দরজাগুলি খোলা হইলে সাতটি পরিচিত মুখ দেখা গেল, সকলেরই জন্য একই গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট। সত্যই আশ্চর্য হইলাম।

অন্ধকারের মধ্যে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আমরা থানার বাহিরে আসিলাম। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল দুইটি প্রিজন্ ভ্যান—দরজা খোলা,—যেন আমাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে। একটিতে আমাদের পার্থিব জিনিসপত্র তোলা হইল; আর একটিতে উঠিলাম আমরা সব জীবন্ত মাল। প্রিজন্ ভ্যান দুইটি প্রচণ্ড বেগে থানার সীমানা হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ভ্যান দুইটি থামিলে নামিয়া আমরা দেখিলাম যে, নদীতীরে আসিয়া গিয়াছি। তীরের নিকটেই একটি জাহাজ ভিড়িয়া ছিল, কিন্তু আমাদের সকলকে ছোট একটি মোটরবোটে তোলা হইল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া আমরা নদীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলাম এবং যখন জাহাজ ছাড়ার সময় হইল, তখন আমাদিগকে অপর দিক হইতে গোপনে জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল। সকাল নয়টা নাগাদ আমাদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে আগাইয়া চলিল। আমাদের কেবিনগুলির সম্মুখে কড়া সশস্ত্র পাহারা বসানো হইয়াছিল এবং আমরা কাহারা, কেন এই বিরাট আয়োজন—তাহা জানিবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের খুব কৌতূহল হইয়াছিল। জাহাজ দূর সমুদ্রে গিয়া পড়িবার পর আমাদের কেবিনগুলির সম্মুখ হইতে সশস্ত্র পাহারা তুলিয়া লইয়া আমাদের দেখাশুনা করিবার জন্য কেবল সাদা পোশাকের অফিসারদের রাখা হইল। আমাদের চারি দিনের এই সমুদ্রযাত্রা বেশ চিত্তাকর্ষকই হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লোম্যান ছিলেন আমোদপ্রিয় ও আলাপী ব্যক্তি—এবং, আমরা তাঁহার সহিত সম্ভবপর সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতাম: তাহার মধ্যে গভর্নর, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর, জননেতা প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথাও থাকিত। এমন কি আমি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিসের অত্যাচারের প্রশ্নও তুলিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লোম্যান প্রথমে এই অভিযোগ অস্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরূপ দুষ্কার্য করা হইয়াছে। মোটের উপর, প্রথমে তাঁহার প্রতি আমার তীব্র বিদ্বেষভাব থাকিলেও শেষে অনুকূল ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরে তাঁহার সহিত আমার দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল। আমাদের রেঙ্গুন পৌঁছিবার পূর্বরাত্রে শ্রীযুক্ত লোম্যান এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সকালে তিনি অভিযোগের সুরে বলিলেন যে, তাঁহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই কারণ তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, জাহাজের পার্শ্বের ছিদ্র দিয়া সন্ধ্যাবেলা রাজবন্দীদের কয়েকজন পলায়ন করিয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় পর্যন্ত কুড়ি ঘণ্টার দীর্ঘ পথ। আমাদের উপর খুব

কড়া পুলিস পাহারা ছিল এবং পথে যেখানেই থামিতে হইয়াছে সেখানেই ট্রেনের উভয় পার্শ্বে তাহারা লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। তাহারা যেরূপ শশব্যস্ত ভাব দেখাইত তাহাতে মনে হইতে পারিত যে, আমরা হয় খুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, না হয় হিংস্র প্রাণী।

তখনও পর্যন্ত মান্দালয়ের নাম ছাড়া আমরা আর কিছু জানিতাম না। আমার কেবল অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, ইহা শেষ স্বাধীন ব্রহ্ম রাজ্যের রাজধানী এবং দ্বিতীয় বর্মী যুদ্ধের ঘটনাস্থল। কিন্তু আমার স্পষ্ট স্মরণ ছিল, এই স্থানেই লোকমান্য তিলককে প্রায় ছয় বৎসর এবং পরে লালা লাজপৎ রায়কে প্রায় এক বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি ভাবিয়া আমরা কিছু শক্তি পাইয়াছিলাম ও গর্ব বোধ করিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে আমাদিগকে গাড়ী করিয়া দুর্গের ভিতরে জেলের দিকে লইয়া যাওয়া হইল এবং পথে, লালাজী ও সর্দার অজিত সিংহ তাঁহাদের কারাবাসের সময় যে গৃহগুলিতে বাস করিয়াছিলেন, সেইগুলি আমরা পার হইয়া গেলাম। প্রত্যুষের আকাশের পটভূমিতে অঙ্কিত বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল; আমাদের বলা হইয়াছিল, ঐগুলি পুরাতন আমলের রাজপ্রাসাদ ও সরকারী ভবন। অতীতের যে উজ্জ্বল দিনগুলি হারাইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বেদনা বোধ করিলাম এবং অবাক হইয়া আমরা ভাবিতে লাগিলাম কবে পুনরায় ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতার পতাকা উড়িবে। মান্দালয় জেলের ধূসর প্রাচীরের সম্মুখে গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দিবাস্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। জেলখানার বিশাল ফটক হাঁ করিয়া অচিরেই আমাদের গ্রাস করিয়া লইল। ব্রহ্মদেশের জেলখানার অভ্যন্তর ভারতীয় জেলখানা হইতে কতকটা অন্য প্রকারের এবং আমাদের এই নূতন পরিবেশ দেখিয়া লইতে প্রথমে কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল। প্রথমে যাহা আমরা উপলব্ধি করিলাম তাহা হইল এই যে, জেলখানাটি পাথর বা ইটের তৈয়ারী নহে, কাঠের খুঁটির দ্বারা নির্মিত। বাড়িগুলি অনেকাংশে চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের খাঁচার মত দেখাইত। বাহিরের দিক হইতে বিশেষতঃ রাত্রিতে এই সকল গৃহের বাসিন্দাদিগকে দেখিয়া মনে হইত ঠিক যেন খাঁচার ভিতরে কতকগুলি প্রাণী এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইপ্রকার গৃহে আমাদিগকে প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহ কিংবা গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ মান্দালয়ের বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার মত আমাদের কিছুই ছিল না। আমরা বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে সুরু করিলাম, কিভাবে আমরা সেখানে বসবাস করিব। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না এবং অবস্থা শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইয়াছিল। আমাদের পাশের জেলটিতেই লোকমান্য তিলক তাঁহার জীবনের প্রায় ছয়টি বৎসর

কাটাইয়াছেন—আমাদের বলা হইয়াছিল। জেলের কর্মচারীদের মধ্যে এমন অনেকের আমরা সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, যাঁহারা লোকমান্য তিলকের বন্দিদশার সময় ঐ জেলে ছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং পরে কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের নিজের মুখ হইতেও আমরা তাঁহার সম্বন্ধে বহু কৌতূহলোদ্দীপক গল্প ও জেলের মধ্যে কিভাবে তাঁহার দিন কাটিয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলাম। তিনি নিজহস্তে যে লেবুগাছগুলি লাগাইয়াছিলেন সেগুলি আমাদের নিকট ঐ সকল কাহিনী অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। রাজবন্দীদের একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত জীবনলাল চ্যাটার্জী, যিনি আমাদের পূর্বেই ঐ জেলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই আমাদের বর্মী ভাষা শিক্ষার আরম্ভ। অল্প দিনের মধ্যেই বর্মীদিগকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ভাল না লাগিয়া পারে না। তাহারা খুবই সহৃদয়, সরল ও কৌতুক-প্রিয়। অবশ্য অতি অল্পেই তাহাদের মেজাজ চড়িয়া যায় এবং কখনও কখনও উত্তেজনাবশে তাহারা আত্ম-সংযম হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ইহা অতি মারাত্মক ত্রুটি বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। যাহা আমার মনকে খুব বেশী নাড়া দিয়াছিল তাহা হইল প্রত্যেক বর্মীর সহজাত শিল্পরুচি। যদি তাহাদের কোনও ত্রুটি থাকেই, তাহা হইতেছে তাহাদের অত্যধিক সরলতা এবং বিদেশীদের প্রতি যে কোনও প্রকার বিরূপতার অভাব। বস্তুতঃ, পরে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, বর্মী মহিলা তাহার নিজ সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা বিদেশীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিয়া থাকে।

আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) স্মিথ আমাদের সঙ্গে খুবই মধুর ব্যবহার করিতেন এবং আমাদের মধ্যে কখনও কোনও ভুল বুঝাবুঝি হয় নাই। এমন কি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যখন আমাদের লড়াই করিতে বা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে হইয়াছে তখনও আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয় নাই। চীফ জেলারের সহিত প্রায়ই আমাদের গোলমাল বাধিত এবং সর্বক্ষণ তিনি আমাদিগকে উৎপাত করিতেন। তিনি নিজ কার্যের যৌক্তিকতা এই বলিয়া প্রমাণ করিতেন যে, তাঁহাকে হুকুম মানিয়া চলিতে হয়; কিন্তু এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী, আমি শেষ পর্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক, কিছুদিন কাটিবার পর অধস্তন কর্মচারীরা যখন উপলব্ধি করিলেন যে, আমাদের কষ্ট দিলে আমরাও অনুরূপ করিতে পারি তখন আমাদের সহিত তাঁহারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। কারা-বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন পার্সী ভদ্রলোক, লেঃ-কর্নেল তারাপোর; তিনি অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান কর্মচারী ছিলেন এবং কোনও অসৎ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। যদিও কখনও কখনও তাঁহার সহিত মান্দালয় কিংবা বর্মার অন্যান্য জেলের রাজবন্দীদের ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে তবু

আমাকে অবশ্যই অতীব আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মোটের উপর আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অসুবিধা ছিল এই যে,—প্রথমতঃ, যে বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য দায়ী ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং তাঁহারা চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতেন। তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশের গভর্নমেন্টের আমাদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব না থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে কোনও কিছু করিতে চাহিতেন না। লেঃ-কর্নেল তারাপোর ছিলেন কারা-সংস্কারে পরম উৎসাহী এবং তাঁহার অনুরোধে বর্মা গভর্নমেন্ট ইংলন্ডের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কারা-বিভাগের অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত প্যাটার্সনকে বর্মাতে আসিয়া তথাকার কারা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উৎসাহ সত্ত্বেও লেঃ-কর্নেল তারাপোর প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের জন্য বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। স্মরণ আছে যে, একবার তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য মহলের বিরোধিতার জন্য উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধারণ বর্মীরা খুব অল্প বয়স হইতেই তামাক সেবনে অভ্যস্ত—খাদ্য অপেক্ষা ইহা তাহাদের নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয়। যেহেতু ব্রহ্মদেশের জেলগুলিতে ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল সেজন্য বাহির হইতে ইহা গোপনে আমদানী করিতে গিয়া বন্দীরা জেলের ভিতরে বহু অপরাধ করিত। ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগকে যদি আইনমত তামাক দেওয়া হয় তাহা হইলে জেলের ভিতরে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইবে, সেই সঙ্গে অবৈধ ব্যবসাও বহুলাংশে বন্ধ হইবে। তিনি সেজন্য নিয়ম চালু করিলেন যে, ভাল আচরণের জন্য পুরস্কার হিসাবে বন্দীদিগকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক দেওয়া হইবে। যদিও এই সংস্কার যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী হয় নাই, তথাপি অবস্থার পূর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটিয়াছিল। এক বৎসর এই পরীক্ষা চালানো হয় কিন্তু তাহার পর জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন এবং অর্থ দপ্তরও আর্থিক ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেন। কাজেই এই সংস্কার-কার্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ব্রহ্মদেশে আমাদের অবস্থিতিকালের শেষের দিকে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে প্রয়াসী হন। কয়েদীদিগকে জেলের বাহিরে লইয়া গিয়া রাস্তা তৈয়ারীর কাজে লাগানো হইত। তাহাদের তাঁবুতে থাকিতে দেওয়া হইত, জেল হইতে অধিকতর স্বাধীনতা এবং খাদ্য ছাড়া একটি নির্দিষ্ট ভাতাও দেওয়া হইত। এই পরীক্ষার ফল শেষ পর্যন্ত কি হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই, তবে যখন আমি বর্মা ত্যাগ করি তখন এই সকল শিবির চালাইবার মত যোগ্য

অফিসার খুঁজিয়া পাওয়ার অসুবিধা বোধ করা হইতেছিল। ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সহিত আমাদের আলোচনাকালে তিনি এরূপ অভিযোগ করিতেন যে, এমন অফিসার তিনি পান না যাহার জেলের পরিবেশ ভুলিয়া গিয়া কয়েদীদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করিবার মত উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্র আছে।

ব্রহ্মদেশে থাকাকালে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও কারা-সংস্কারের সমস্যা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আমাদিগকে আবশ্যক কাগজপত্রাদি দিয়া ইন্সপেক্টর-জেনারেল খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্মার বিভিন্ন জেলের কয়েদীরাও এই পর্যালোচনায় মূল্যবান উপকরণের কাজ করিয়াছে। আমার এই পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় কিছু কিছু ফল যাহা হইয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব বা আবশ্যক নয় বলিয়া একটি পরীক্ষার কথা বলিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, কয়েদীদের মধ্যে যাহারা খুনী তাহারা মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিপরীতপক্ষে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, কয়েদীদের মধ্যে খুনীরাই সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে। অন্ততঃ তাহারা তো বটেই যাহারা উত্তেজনা বা সাময়িক উন্মত্ততা বশতঃ খুন করিয়া থাকে। অপর পক্ষে, চুরি করা ও পকেট মারা যাহাদের পেশা তাহারাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে সেলগুলিতে কয়েদীদের ফাঁসি দিবার পূর্বে রাখা হয়, কখনও কখনও তথায় মানবজাতির সুন্দর সুন্দর নমুনা আমার চোখে পড়িত; কখনও কখনও ঊনিশ বছরের অনূর্ধ্ব বালকও দেখিয়াছি যাহারা ক্ষণিকের জন্য আত্ম-সংযম হারাইয়া হঠাৎ উত্তেজনাবশতঃ কাহাকেও খুন করিয়াছে কেবল এজন্যই তাহাদের ফাঁসি হইবে। বর্মার হাইকোর্ট যেরূপ সহজে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিত তাহা আমার বিস্ময়কর মনে হইত। হাইকোর্টের আচরণ আরও এই কারণে অদ্ভুত ঠেকিত যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্মীদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা স্বহস্তে রাখিবার অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উত্তর বর্মা ও মান্দালয় ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের অধীনে আসে নাই। মধ্যে মধ্যে আমাদের বিচিত্র ধরনের সব লোক দেখিতে আসিতেন—বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীও থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত কেহই আমাদের উপেক্ষা করিতেন না, কারণ তাঁহাদের নিকট ভারতীয় রাজবন্দিগণ ছিলেন মানবজাতির একটি অদ্ভুত নিদর্শন। এই সকল অতিথির মধ্যে ছিলেন ইংলন্ডের কারা-বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত প্যাটার্সন—যিনি আমাদের 'ভারতের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক লোকদিগের আট জন' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার (অর্থাৎ, ডিস্ট্রিক্ট অফিসার) মিঃ ব্রাউন নিয়মিতই আসিতেন। মান্দালয়বাসীদের প্রতি তাঁহার মনোভাব যাহাই

হউক না কেন, রাজবন্দীদের সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে ভদ্র ব্যবহার করিতেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া আমরা আনন্দবোধ করিতাম। উপরন্তু, কাগজপত্রাদি দিয়া এবং জেল-কর্মচারীদের সহিত যখনই কোনও গণ্ডগোল হইত তখন মধ্যস্থতা করিয়া তিনি আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছুটি লইলে জেল-কর্মচারীদের সহিত আমাদের হঠাৎ মনোমালিন্য সুরু হয়। তাঁহার স্থানে আসিয়াছিলেন মেজর ফিণ্ডলে। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছিলেন প্রফুল্ল স্বভাবের, এবং বাহ্যিক চাল-চলনের দিক হইতে মেজর ফিণ্ডলে ছিলেন কর্কশ এবং কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির। শীঘ্রই মেজর ফিণ্ডলের সহিত আমাদের তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ঝগড়া হইয়া গেল, যাহার ফল হইল অনশন-ধর্মঘট। যাহা হউক, মিঃ ব্রাউনের মধ্যস্থতায় ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইল। তাহার পর, যখন আমরা একে অপরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে পারিলাম তখন দেখিলাম যে, তিনি খুবই চমৎকার ও স্পষ্টবাদী লোক। আরও একজন অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কিছুদিন ছিলেন—তিনি হইলেন মেজর শেপার্ড। তাঁহার সহিত আমাদের ঝগড়া লাগিয়াই ছিল কিন্তু তিনি বেশীদিন ছিলেন না বলিয়া ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠে নাই।

বর্মাতে যে সকল রাজবন্দীকে পাঠানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে আমরাই প্রথম দল ছিলাম না। আমাদের যাওয়ার প্রায় এক বৎসর পূর্বে আর একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। এই প্রথম দলটি যখন আসেন তখন তাঁহাদের একই জেলে না রাখিয়া দুজন দুজন করিয়া বর্মার বিভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের এই অবস্থা ছিল দুঃসহ এবং যেহেতু তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল সেজন্য তাঁহারা তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালাইতে পারেন নাই। এই সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে দুই-জন, শ্রীযুক্ত জীবনলাল চ্যাটার্জী ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বেঙ্গল পুলিসের পলিটিক্যাল ব্র্যাঞ্চের (ভারতে যাহাকে ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ বলা হয়) আচরণের তীব্র সমালোচনা করিয়া তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ারের নিকট এক পত্র দেন। উহাতে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, অত্যুৎসাহী কিন্তু নির্দোষ যুবকদিগকে ধরিবার জন্য পুলিস কর্তৃক ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করা হয় এবং ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ ইচ্ছা করিয়াই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের ভয় দেখাইয়া থাকে কারণ তদ্দ্বারা তাহারা 'বিপৎকালীন ভাতার' ন্যায় অতিরিক্ত সুবিধাগুলি পাইতে পারে এবং, ঐ সকল চর নিযুক্ত করিবার জন্য মোটা রকমের অর্থেরও তাহাদের ব্যবস্থা হয়। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া কিছু কিছু তথ্য ও সংখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় পত্রিকায় এই পত্রটি কোনও প্রকারে প্রকাশ হইয়া যায়, এবং ইহা প্রকাশ হওয়ার পর আইনসভায়

বিনা-বিচারে আটক রাখার নীতিকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা দানকালে স্বরাজ্যপন্থী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইহার উল্লেখ করেন। পত্রটি প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় গভর্নমেন্ট এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, বর্মাতে রাজবন্দীদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ জারী করা হয়। কিছুকাল পরে গভর্নমেন্টের ক্রোধ পড়িয়া গেলে রাজবন্দীদিগকে একত্র একটি জেলে থাকিতে দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে; গভর্নমেন্ট তাঁহাকে ঐ পত্রটি প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন।

জেলের মধ্যে কখনও কখনও বর্মী রাজবন্দীদের সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিত; তাঁহাদের নিকট হইতে বর্মী রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে যাঁহাদের আমরা দেখিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন যাজক (বর্মায় 'ফুঙ্গি' বলা হয়)। এ পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ হিসাবে যাঁহারা আমার চোখে পড়িয়াছেন, বর্মার জেলে দেখা এই সকল যাজক বা ফুঙ্গিরা তাঁহাদের সার্থকতম প্রতিনিধি। বর্মা এমন একটি দেশ যেখানে কোনও জাতি নাই, কোনও শ্রেণী নাই। রাশিয়ার বাহিরে, সম্ভবতঃ এখানেই সর্বাধিক শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সেখানকার প্রধান ধর্ম এবং যে সকল যাজক ঐ ধর্মমতানুসারে চলিয়া থাকেন তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। বহু শতাব্দীব্যাপী বর্মী নরনারীরা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছেন, যাহার ফলে সাক্ষরতার ব্যাপারে বর্মা আজ ভারতবর্ষ হইতে অনেক আগাইয়া আছে। বৃটিশের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর হইতে কেবল ফুঙ্গিরাই ধ্বংসোন্মুখ জাতীয়তাবাদের শিখাকে প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বৃটিশের আধিপত্য বা সংস্কৃতিকে কোনও সময়েই স্বীকার করিয়া লন নাই---তাঁহাদের নেতৃত্বেই বহু বৎসর ধরিয়া গরিলা যুদ্ধ চলিয়াছে। বিদেশী গভর্নমেন্টকে দৃঢ়ভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সরকারী ও বেসরকারী—সকল বৃটিশেরই প্রচণ্ড শত্রুতার সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহারা। ইহা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তাঁহারা বৃটিশ-বিরোধী হইলেও ভারতীয়-ঘেঁষা এবং ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোরতর বিরোধী। ভারতের সহিত তাঁহাদের সাংস্কৃতিক একটি সম্বন্ধ ত আছেই- তাহা ছাড়াও, তাঁহারা মনে করেন যে, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য গ্রেট বৃটেনের সহিত লড়াই করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর কঠিন হইবে। বর্মী জনসাধারণের মধ্যে যাজকদিগের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। রাজনৈতিক দিক হইতে, ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীগণের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বেশীর ভাগ লোক যে সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন, তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে যাজকদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা ভারতীয়-বিরোধী এবং বৃটিশ-

ঘেঁষা[১]। কিন্তু সংখ্যাল্পদের রাজনৈতিক ব্যাপারে যাজকদের সহিত মিল আছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়রা নন, বৃটিশেরাই দেশে সমস্ত সুখসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন তথাপি ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীগণ সচরাচর মনে করেন যে, ভারত হইতে পৃথক হইয়া গেলে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। সাধারণতঃ, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার কোনও ধারণা কিংবা ইচ্ছা 'ইংরাজী ভাবাপন্ন' বর্মীদের নাই এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে, ভারতীয়রা বর্মা হইতে একবার চলিয়া গেলেই সব কিছু ঠিক হইয়া যাইবে। বিপরীতপক্ষে, ফুঙ্গি বা যাজকগণ রাজনৈতিক-মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কৌশল অনুসরণ করিয়া চলেন। বর্মাতে যখন ছিলাম তখন বর্মীদের মুকুটবিহীন রাজা ছিলেন একজন যাজক, রেভারেন্ড ইউ. ওত্তামা[২]। সেখানে অবস্থানকালে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, দেশে যাজকদিগের অনুগামীর সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯২০ সাল হইতেই বর্মী আইনসভা তাঁহারা বর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন না। উহার ফলে গভর্নমেন্ট মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীরা সাধারণতঃ যেরূপ বলিতেন সেইরূপ বর্মীরা সত্য সত্যই ভারত হইতে পৃথক হইয়া যাইতে চাহেন। যাহা হউক, সাম্প্রতিক নির্বাচন দেখাইয়া দিয়াছে যে, জনগণ পৃথক হওয়ার বিরুদ্ধে। নির্বাচকদের পুরানো তালিকার ভিত্তিতে যে ঐ নির্বাচন চালানো হইয়াছিল এবং স্বাতন্ত্র্যবিরোধী দল ঐ তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচনের পূর্বে যে অনুরোধ জানাইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করা হয়, ইহা স্মরণ রাখিলেই গত নির্বাচনের তাৎপর্য আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের (ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীরা) অথবা স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধীদের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করা খুবই কঠিন, কেন না বর্মাতে ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধী

[১] ভারত হইতে পৃথক হওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত পার্লামেন্টারী কমিটি কর্তৃক রচিত নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়াটি সম্ভবতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীদের কাছে নৈরাশ্যজনক প্রমাণিত হইবে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের সাধারণ মনোভাবের একটা পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

[২] রেভারেন্ড ইউ. ওত্তামা এখন কলিকাতায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছেন এবং তাঁহাকে বর্মায় ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বার বার কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যখন বর্মাতে ছিলাম তখন কৌতূহলোদ্দীপক একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রেভারেন্ড ইউ. ওত্তামা জেলে ছিলেন এবং এরূপ গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে গোপনে ভারতের কোনও জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্মী আইন পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং ছিলেন বর্মী; এই সকল প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করিয়া তিনি জবাব দিয়াছিলেন যে, ইউ. ওত্তামা তাঁহার জেলের দশ হাজার অপরাধীর মধ্যে একজন এবং ঐ সময়ে তাঁহাকে কোথায় রাখা হইয়াছে তাহা তাঁহার জানা থাকিবে এরূপ আশা করা উচিত নয়। ইউ. ওত্তামা সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে বেসরকারী সদস্যগণ সকলেই প্রতিবাদস্বরূপ আইন পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক পৃথক দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া স্থির করিয়া পিপলস্ পার্টি নামে একটি যুক্ত দল সুরু করেন।

যাজকদিগের দল মোটের উপর সুসংহত। যখন বর্মাতে ছিলাম তখন ইংরাজী-শিক্ষিত বর্মীদের মধ্যে কয়েকটি দল ছিল; ঐগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান টুয়েন্টি-ওয়ান পার্টি[১]—একুশ জন ব্যক্তি এক হইয়া দলটি গড়িয়াছিলেন বলিয়া এরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। বর্মাতে জাতীয়তাবাদী দলকে বলা হয় জি. সি. বি. এ.—অর্থাৎ, জেনারেল কাউন্সিল অব বার্মিজ এসোসিয়েশন—এবং, সেখানে যতগুলি দল ততগুলি জি. সি. বি. এ.। অনেকেই আজ ভাবিয়া আশ্চর্য হন, বর্মাকে ভারত হইতে পৃথক করিবার জন্য বৃটেন কেন এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু বর্মার কথা যাঁহার জানা আছে তাঁহার আশ্চর্য হইবার কোনও কারণ নাই। বৃটিশদিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, ভারতরাজ্যকে যদি হারাইতেও হয়, বর্মাকে ধরিয়া রাখার জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। বর্মা এরূপ বিরলবসতি দেশ, খনিজ দ্রব্যে এত সমৃদ্ধ এবং কোনও কোনও অংশে ইহার জলবায়ু এরূপ মনোরম যে, বৃটিশদিগের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে ইহা উপযুক্ত। উপরন্তু, দূর প্রাচ্যের প্রবেশপথ বর্মা এবং সামরিক দিক হইতে ইহার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

বর্মার রাজনীতি আমার নিকট যতটা না কৌতূহলপ্রদ ছিল তদপেক্ষাও আকর্ষণীয় ছিল ঐ দেশ ও দেশের লোক। বর্মার প্রাচীন ইতিহাসের পড়াশুনায় ও দুই দেশের মধ্যে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আবিষ্কারে বহু সময় আমার ব্যয় হইয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারত হইতে ক্ষত্রিয়-দিগের বহু শাখা বর্মায় চলিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম ও পালিসাহিত্য সেখানে লইয়া আসে। বর্মার সংস্কৃতি ও দর্শনের উপর ভারতের প্রভূত প্রভাব পড়িয়াছে। অক্ষরগুলি লওয়া হইয়াছে সংস্কৃত হইতে এবং ইহার লিপির সহিত ভারতের কোনও কোনও লিপির অনেক মিল আছে। বর্মার যে প্যাগোডাগুলির (মন্দির) নিজস্ব অতুলনীয় আকর্ষণ রহিয়াছে তাহাও ভারতীয় প্রভাবমুক্ত নয়। পাগান ও বর্মী সংস্কৃতির অন্যান্য প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে এখনও এমন সব সৌধ দৃষ্ট হইতে পারে—যেগুলিতে হিন্দু মন্দির ও বর্মী প্যাগোডার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধারণ বর্মীর শিল্পবোধ খুবই উন্নত মানের। মান্দালয় কিংবা অন্যান্য জেলের কয়েদীদের অতি সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষেই শুধু ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব। মান্দালয় জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বৎসরে দুই তিনদিন ছুটির দিনে কয়েদী-দিগকে নৃত্যগীতাদির অনুমতি দিতেন। এই সময় তাহারা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করিত। নাটক অভিনয় করিত, ঐ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে রচিত গান

[১] জি. সি. বি. এ.-র নীতি যখন ছিল .. বর্জন করা, তখন টুয়েন্টি-ওয়ান পার্টি ইহাকে কার্যে পরিণত করার নীতি গ্রহণ

গাহিত এবং তাহাদের অপূর্ব জাতীয় নৃত্য দেখাইত। উপরন্তু, আবশ্যক সুরসৃষ্টির জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়াও জেলের কয়েদীদিগকে লইয়াই ঐকতান-বাদনের দায়িত্ব সমাধা করিত। এ সমস্তই সম্ভব হইত তাহাদের অত্যুন্নত শিল্পবোধের জন্য।

১৯২৫ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতির ধর্মীয় উৎসব—দুর্গাপূজা—আসিয়া পড়ায় আমরা ঐ উৎসব করিবার জন্য অনুমতি ও অর্থ চাহিয়া সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট আবেদন করিলাম। যেহেতু, ভারতীয় জেলে খৃস্টান বন্দীদিগকে ঐ একই রকমের সুবিধাদি দেওয়া হইত সেজন্য তিনি আমাদের আবশ্যক সুবিধাদি দেন; তাঁহার আশা ছিল, ইহাতে গভর্নমেন্টের অনুমোদন পাওয়া যাইবে। কিন্তু, গভর্নমেন্ট কেবল যে ঐ অনুমোদন দান হইতেই বিরত রহিলেন তাহা নয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ফিন্ডলে নিজে দায়িত্ব লইয়া কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনাও করিলেন। ফলে আমরা গভর্নমেন্টকে জানাইলাম যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন, অন্যথায় আমরা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইব। নেতিবাচক জবাব আসিলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনশন-ধর্মঘট সুরু করিলাম। তৎক্ষণাৎ বহির্জগতের সহিত আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তৎসত্ত্বেও, অনশন-ধর্মঘট সুরু করার তিন দিন পরে কলিকাতার **ফরোয়ার্ড পত্রিকা** আমাদের এই অনশন-ধর্মঘটের খবর এবং সেই সঙ্গে গভর্নমেন্টের নিকট আমরা যে চরমপত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাও প্রকাশ করিয়া দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-২১ সালের ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কমিটির কাছে কারাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেঃ-কর্নেল মালভ্যানি সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন উহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া তাহার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট দিবার জন্য উপরওয়ালা অফিসার, বাঙ্গলার ইন্স্পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছেন। এই সকল খবর ফাঁস হইয়া যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের আলোড়ন সুরু হয়। সেই সময়ে দিল্লীতে ভারতীয় আইন সভার অধিবেশনকালে স্বরাজ্যপন্থী এক সদস্য শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মান্দালয় জেলে অনশন-ধর্মঘটের কারণে সভা মুলতবী রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ-কর্নেল মালভ্যানির সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কারাবিভাগ রাজবন্দীদের সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট তৈয়ারী করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনব্রতী রাজবন্দীদের দাবীগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দেন। আইন সভায় বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিরূপে **ফরোয়ার্ড** প্রকাশার্থ

আবশ্যক তথ্যাদি লাভ করিল, তাহা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে জোর তদন্তকার্য সুরু হইল। যাহা হউক, গভর্নমেন্ট অবিলম্বে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, আমরা যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি তাঁহারা তাহা মঞ্জুর করিবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সুবিধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হইবে। অতএব পনের দিন অনশনের পর আমাদের দাবী জয়যুক্ত হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান ঘটিল।

১৯২৬ সালের শেষার্ধে চিত্তাকর্ষক একটি ব্যাপার ঘটিল। আইন সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং নভেম্বরে নূতন করিয়া নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমার সহিত রাজবন্দী ছিলেন; বাঙ্গলার কংগ্রেস দল তাঁহাকে ভারতীয় আইন সভার জন্য একটি নির্বাচন কেন্দ্র দেওয়ার প্রস্তাব করিল এবং আমাকে দেওয়া হইল বঙ্গীয় আইন পরিষদের জন্য কলিকাতার একটি নির্বাচন-কেন্দ্র। আমরা উভয়েই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত মিত্র বিনা বাধায় জয়ী হইলেন কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইলেন বাঙ্গলায় উদারপন্থী দলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। গত নির্বাচনে শ্রীযুক্ত বসু স্বরাজ্যপন্থী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া তাঁহার আসনটি দখল করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস দল মনে করিয়াছিল যে, ঐ আসনটি কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। তিনি তাঁহার নির্বাচন-কেন্দ্রে খুবই জনপ্রিয় ও মার্জিত ধরনের ভদ্রলোক ছিলেন এবং উদারপন্থী রাজনীতি ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার আর কিছুই ছিল না। বাঙ্গলায় ইহা ছিল বছরের প্রধান নির্বাচন, এবং জয়লাভ করিবার জন্য দলকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই নির্বাচন পূর্বেকার সিন ফিন নির্বাচনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল; উহাতে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং ধ্বনি তোলা হইয়াছিল—'বাহিরে আনিবার জন্যই তাঁহাকে ভিতরে পাঠাও।' নির্বাচনে আমাদের দল আধুনিক প্রচারপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহার মধ্যে ছিল প্রচারপত্র ও পুস্তিকা বিতরণের জন্য রকেটের ব্যবহার—ঐসকল প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় প্রার্থীকে জেলের গরাদের আড়ালে বন্দী অবস্থায় দেখানো হইত। ভোটদাতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে, আমার সাফল্যের দ্বারা দেশবাসীর আমার উপর আস্থা প্রমাণিত হইবে এবং গভর্নমেন্ট হয় আমাকে ছাড়িয়া দিতে নতুবা আমার বিচারের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। ফলে বিপুল ভোটাধিক্যে আমি জয়লাভ করিলাম। কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডে গভর্নমেন্ট জনতার রায়ে যেভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেন্টের দিক হইতে অনুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না এবং আমার কারাবাস চলিতেই থাকিল।

ইতিমধ্যে, স্থানীয় জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় এবং অনশন-ধর্মঘটের ফলে বৎসরের গোড়ার দিকে আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিল।

১৯২৬ সালের শীতকালে যখন ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইলাম তখন অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিল। ঐ অসুখের পর হইতে রোজই জ্বর হইত, সেই সঙ্গে আমার ওজনও কমিয়া যাইতে লাগিল। সেজন্য একটি মেডিকেল বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য আমাকে রেঙ্গুনে বদলি করা হইল। ঐ মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন লেঃ-কর্নেল কেলসল ও আমার ভ্রাতা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু; বোর্ড এই মর্মে সুপারিশ করিল যে, আমাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। রেঙ্গুন জেলে যখন গভর্নমেন্টের আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ফ্লাওয়ারডিউর (বাঙ্গলায় এখন তিনি ইন্স্পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ হইয়াছেন) সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল, যাহার ফলে আমাকে ইনসিন জেলে বদলি করা হইল। ইনসিনে আমার এই বদলি অপ্রত্যাশিত একটা সৌভাগ্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল। সেখানে পৌঁছিয়া সুপারিন্টে-ন্ডেন্ট হিসাবে পাইলাম মেজর ফিন্ডলেকে, যিনি কিছুদিন মান্দালয় জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্ময় ও বেদনা বোধ করিলেন। তিন সপ্তাহ আমাকে পরীক্ষাধীনে রাখিবার পর তিনি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের নিকট খুব কড়া এক নোট পাঠাইলেন। এই নোট পাইবার পর গভর্নমেন্ট তৎপরতা দেখাইতে বাধ্য হইলেন--কিন্তু তাঁহারা তখনও আমার মুক্তি-প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ইত্যবসরে, তাঁহারা বঙ্গীয় আইন পরিষদে এরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি নিজ ব্যয়ে সুইজারল্যান্ডে যাইতে চাহি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন এবং রেঙ্গুন হইতে ইউরোপগামী জাহাজে আমাকে তুলিয়া দিবেন। এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি অংশতঃ এই কারণে যে, প্রস্তাবের সহিত যে সকল শর্ত দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং অংশতঃ এই কারণে, বর্মা হইতে সোজা ইউরোপের দিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য যাত্রা করার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে নাই। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার পর, গভর্নমেন্ট পরবর্তী যে আদেশ আমাকে পাঠাইলেন তাহা হইল যুক্ত প্রদেশের আলমোড়া জেলে আমার বদলির আদেশ। আবার একবার অত্যন্ত গোপনে আমার বদলির ব্যবস্থাদি করা হইল এবং ১৯২৭ সালের মে মাসে একদিন অতি প্রত্যুষে আমাকে ইনসিন জেল হইতে রেঙ্গুনে যে জাহাজ ছাড়িবার কথা তাহাতে তোলা হইল। চতুর্থ দিনে হুগলী নদীর মোহানায় ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছিলাম। কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্বে আমাদের জাহাজ থামাইয়া মিঃ লোম্যান (যিনি তখন পুলিসের ইন্টেলিজেন্স্ ব্র্যাঞ্চের প্রধান ছিলেন) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে নামিতে বলিলেন। তিনি আমাকে কলিকাতার বাহিরে গোপনে সরাইয়া দিতে চাহেন ভাবিয়া আমি অসম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইল

যে, মহামান্য গভর্নর আমাদের জন্য তাঁহার লঞ্চ দিয়াছেন, আমার জন্য মেডিকেল বোর্ড লঞ্চে অপেক্ষা করিতেছে এবং বোর্ডের নিকট আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে; তখন আমি সম্মত হইলাম। এই বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লেঃ-কর্নেল স্যান্ডস্ এবং গভর্নরের চিকিৎসক মেজর হিংস্টন; তাঁহারা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দার্জিলিং-এ গভর্নরের নিকট তারযোগে তাঁহাদের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। সেদিনটি আমি গভর্নরের লঞ্চে কাটাইলাম এবং পরদিন সকালে মিঃ লোম্যান একটি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, গভর্নর আমার মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। সংবাদ জানাইয়া তিনি মুক্তি সম্বন্ধীয় সরকারী আদেশটি আমার হাতে দিলেন। ঐ দিনটি ছিল ১৯২৭ সালের ১৬ই মে, কিন্তু আদেশটিতে স্বাক্ষর ছিল ১১ই মে তারিখের। ইহা ষড়যন্ত্রমূলক বলিয়াই বোধ হইল। প্রকৃতপক্ষে, ১১ই তারিখে যখন মুক্তির আদেশে সহি করা হইয়াছে তখন ১৫ই মে তারিখে কেন তাঁহারা লোক দেখানো ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মিঃ লোম্যানকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথমে জবাব দেন নাই; শেষে পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলিলেন যে, ১১ই মে তারিখে আলমোড়ায় আমার বদলির আদেশ সহ অন্যান্য আদেশও সহি করাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, গভর্নর মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট পাইবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দার্জিলিং হইতে আসিবে। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মেডিকেল বোর্ড যখন কি রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইবে তাহা বিবেচনা করিতেছিলেন তখন আমার মুক্তিতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বোর্ড যাহাতে আলমোড়ায় আমার বদলি কিংবা সুইজারল্যান্ড যাত্রার অনুকূলে রিপোর্ট দাখিল করেন সেজন্য পুলিস-অফিসারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য, বোর্ড এরূপ করিতে সম্মত হন নাই। এইরূপে, স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পুলিস বিভাগ আমাকে মুক্তি না দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। অন্য কোনও গভর্নর থাকিলে তাহাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইত ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমার সৌভাগ্য, নূতন গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন অকপট মন লইয়া আসিয়াছিলেন এবং কড়া লোক ছিলেন। সুদক্ষ রাজনীতিবিদের অভ্রান্ত বিচারশক্তির সাহায্যে তিনি জনগণের অভিযোগ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আসার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জনগণ পুলিস বিভাগের অত্যাচার হইতে কিছু রক্ষামূলক ব্যবস্থা চাহে। লর্ড লিটনের আমলে পুলিস বিভাগই শাসন করিয়াছে এবং কলিকাতার পুলিস কমিশনার ছিলেন কার্যতঃ বাঙ্গলার গভর্নর। ঐ সব কিছুরই এখন পরিবর্তন ঘটিল। স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন তাঁহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকে বুঝিতে

পারিলেন যে, এখন হইতে পুলিস কমিশনার নহেন, তিনিই বাঙলা শাসন করিবেন। জনসাধারণ ও পুলিসের মধ্যে যখন কোনও সঙ্ঘর্ষ দেখা দিত তখন পরোক্তদিগকে অসন্তুষ্ট করিবার ঝুঁকি লইয়াও তিনি ন্যায়বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা ও কৌশলের সাহায্যে প্রায় চার বৎসর তিনি অশান্তি এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হন। সমগ্র ভারতে পুনরায় যখন বিরাট আর একটি আন্দোলন প্রবল হইয়া দেখা দিল, কেবল তখনই বাঙলাদেশ আরও একবার ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

৮

তাপ বৃদ্ধি (১৯২৭-২৮)

১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চরমতম দুর্দিনের অবসান ঘটিয়া আলোর রেখা৹ দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থপরতা ও ধর্মান্ধতা দেশকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহাতে বিরক্ত হইয়া দেশবাসীর হৃদয় পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল। এই নবজাগরণে তরুণদিগের অবদানই ছিল সর্বাধিক। মোটের উপর, কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব দেখা গিয়াছিল। মানসিক দিক হইতে মহাত্মা গান্ধী গভীরভাবে হতাশাগ্রস্ত হইয়া সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন। অংশতঃ পেশাগত কারণে ও কিছুটা পুত্রবধূর গুরুতর অসুস্থতার হেতু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইউরোপে চলিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে, নেতৃত্বের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের উপর এবং তিনি সময়োপযোগী কর্তব্য পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁহার অধিকাংশ সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশভ্রমণে কাটিল। ঐ বৎসরে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল, নভেম্বরে কলিকাতায় তাঁহার আহ্বানে ও সভাপতিত্বে ঐক্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ অধিবেশন: আসন্ন যে অভ্যুত্থানে সকল দল ও সম্প্রদায় আর একবার যোগদান করিয়াছিল উহাই তাহার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ১৯২৬ সালে যে বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় প্রকাশ ঘটে সেখানে এক নবযুগের সূচনার লক্ষণসমূহ দেখা গেল। আগস্টে বঙ্গীয় আইন পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মন্ত্রিগণ পুনরায় পদচ্যুত হন। প্রায় এই সময়েই কলিকাতা হইতে সত্তর মাইল দূরে খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠন এরূপ শক্তিশালী ছিল যে, কোম্পানীকে নতি স্বীকার করিয়া শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইতে হইয়াছিল। নভেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ঐক্য সম্মেলন আবহাওয়াকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিতে এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় ছিল উহা ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে। পরে ঐ মাসেই, বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির[১] বার্ষিক সভা যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন

[১] বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির এই সভায় বর্তমান গ্রন্থের লেখক সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে নব উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। যাহা হউক, এই নব-জাগরণে প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রেরণা আসে গভর্নমেন্টের দিক হইতেই।

১৯২৭ সালের নভেম্বরে বড়লাট লর্ড আরুইন যখন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে ইহা ছিল একটি শুভ মুহূর্ত। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের ৮৪ক ধারানুসারে এই নিয়োগ করা হইয়াছিল, যদ্দ্বারা দশ বৎসর অন্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনরায় অনুমোদন কালে বৃটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর ব্যাপারে যে রাজনৈতিক সমীক্ষা চালায় ইহা কতকটা তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ১৯২৯ সালে যেহেতু ঐ স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল সেই হেতু টোরী গভর্নমেন্টকে উহার তারিখকে ত্বরান্বিত করিতে দেখিয়া কিছুটা বিস্ময় বোধ হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অবিলম্বে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে একটি গোল টেবিল বৈঠকের জন্য চাপ দিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই দাবীকে দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ১৯১৯-এর যে শাসন-সংস্কারকে ভারতবাসী অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন উদারপন্থী মিঃ মন্টেগু। রক্ষণশীল দল কখনও উহাকে ভালভাবে গ্রহণ করে নাই; সুতরাং ক্ষমতাসীন হইয়া তাহারা নিজেরাই ভারতীয় প্রশ্নের একটি নিষ্পত্তি করিতে চাহিল—যাহাতে তাহাদের পরে শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসিলেও, স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী ভারতের আছে তাহার প্রতি আর কোনও সুবিধা দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব না হয়। ১৯২৯ সালে ইংলন্ডে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল বলিয়া ১৯২৭ সালেই স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিয়োগ করা রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা প্রয়োজন মনে করিলেন।

ঐ কমিশনে ছিলেন স্যার জন সাইমন (চেয়ারম্যান), ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্র্যাথকোনা, মাননীয় এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, মিঃ স্টিফেন ওয়ালশ্, মেজর এটলী এবং কর্নেল লেন ফক্স। (মিঃ ওয়ালশ্ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে আসেন মিঃ ভার্নন হার্টসহর্ন।) সাতজন সদস্যের মধ্যে দুইজন ছিলেন শ্রমিক দলের সদস্য, একজন (যথা, চেয়ারম্যান) উদারপন্থী আর বাকী সবাই রক্ষণশীল। এইরূপে, কমিশনের কাজ চালাইবার জন্য বৃটেনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছিল। 'বৃটিশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা, শিক্ষার অগ্রগতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির উন্নয়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের নীতি স্থাপন কিংবা ঐ সময়ে সেখানে

যে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট আছে উহার সীমাকে প্রসারিত, পরিবর্তিত বা নিয়ন্ত্রিত করা কতটা সমীচীন, সেই সঙ্গে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ চালু করা বাঞ্ছনীয় কি বাঞ্ছনীয় নয় ঐ প্রশ্নটি সম্বন্ধেও' তদন্ত করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল কমিশনের উপর। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয়দিগকে বাধ্য হইয়াই কমিশন হইতে বাদ দিতে হইয়াছে কারণ উহা নিতান্তই একটি পার্লামেন্টারী কমিশন; এবং ঐ পার্লামেন্টারী কমিশন গঠনের আবশ্যকতা বড়লাট এইরূপে ব্যাখ্যা করেন: 'সাধারণত সকলেই একমত হইবেন যে, এমন একটি কমিশন প্রয়োজন—যাহা পক্ষপাতহীনভাবে ও উপযুক্ত দক্ষতার সহিত পার্লামেন্টের সম্মুখে অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিবে; উপরন্তু ইঁহা অবশ্যই এরূপ একটি সংস্থাও হওয়া চাই যাহার সুপারিশে সকল বিষয়ের পর্যালোচনার দ্বারা যে কোনও ব্যবস্থাই উপযুক্ত বলিয়া মনে হউক না কেন উহা গ্রহণ করিতে পার্লামেন্ট রাজী হইবে।' এই কমিশন সম্বন্ধে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য বহু জনসেবককে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বরের রাজকীয় আজ্ঞাপত্রের দ্বারা এই কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং ঐ মাসেই কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে হাউস অব লর্ডসে বক্তৃতা দিবার সময় ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতের জন্য একটি সর্বসম্মত শাসনবিধি পেশ করিতে ভারতীয় রাজনীতিবিদদিগকে আহ্বান জানান।

স্ট্যাটিউটরি কমিশন সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে ভারতের সকল প্রান্তের কংগ্রেস নেতাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্য হইতেও সমস্বরে ধিক্কার-ধ্বনি উঠিল। ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের চিন্তায় জনসাধারণ এত বেশী অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর বৃটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা মনে করিতেন না। কাজেই, কংগ্রেস যে দ্বিধা কিংবা বিলম্ব না করিয়া কমিশনকে (সাইমন কমিশনরূপে যাহা পরিচিত) বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। উহাতে অবশ্য গভর্নমেন্ট কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। কিন্তু যাহা তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল তাহা হইল ভারতীয় উদারপন্থীদের কমিশনকে বর্জনের সিদ্ধান্ত। আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলনীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছিল বলিয়াই নয় বরং কমিশনের সকল সদস্যই শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় এবং উহা হইতে ভারতীয়দিগকে বাদ দেওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। বৃটিশ গভর্নমেন্টের দিক হইতে এই অসহযোগিতার সম্মুখীন হইয়া উদারপন্থীরা কিরূপে তাঁহাদের সাধের ভারত-বৃটিশ সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করিতে পারেন? ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে যে প্রকাশ্য জনসভা হয় উহাতে গৃহীত প্রস্তাবে উদারপন্থীদের মনোভাব

ব্যাখ্যা করা হয় এবং উহাতে বলা হয় যে, 'ভারতীয়দিগকে বাদ দিয়া ভারতবাসীকে ইচ্ছা করিয়াই অপমান করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা শুধু যে তাঁহাদিগকে স্পষ্টতঃই হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহাই নয়, উপরন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যবস্থা হইতেছে, স্বদেশের শাসনতন্ত্র রচনায় তাঁহাদের অংশগ্রহণের অধিকারকেও অস্বীকার করা।' সেই বৎসরেই ঐ একই ভদ্রলোকের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে নুষ্ঠিত লিবারেল ফেডারেশনের দশম অধিবেশন সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নভেম্বরে ঐক্য সম্মেলন হওয়ার পর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত মুশিলম লীগ মিলিত হয়। ঐক্য সম্মেলন কর্তৃক নির্দেশিত ধারানুসারে লীগ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করে। ইহাতে সাইমন কমিশন বর্জন করিতেও বলা হয় এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ যৌথ নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরই জয় হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত এম. এ. জিন্না ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় বিশিষ্ট মুসলমানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ঐ মাসেই কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে: এখানেই কমিউনিস্টদের একটি সুসংবদ্ধ দল প্রথমে দেখা দেয় যাহারা স্বাধীন সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র ও আমস্টার্ডামের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ দাবী করে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি মাদ্রাজে দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি কারণে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্মরণীয়। সাইমন কমিশনকে 'সর্ব ক্ষেত্রে ও প্রকারে' বর্জন করিয়া একটি প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাহার দ্বারা সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের সকল দলের একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ভারতবাসীর লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবও গৃহীত হয় তবে এ-বিষয়ে যে কিছু মতভেদ ছিল না এমন নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারার মধ্যে এই নির্দেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটি শুভ মুহূর্তে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং দেশবাসীর উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতেও ইহার ফল হইয়াছিল আশ্চর্যজনক। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সংহতি দেখা গিয়াছিল যাহা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। এই সংহতিবোধের সঙ্গে সঙ্গে, হাউস অব লর্ডসে লর্ড বার্কেনহেড যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার সমুচিত উত্তর

দিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সকল দলের একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। কেবল শ্বেতাঙ্গ সদস্য লইয়া কমিশন নিয়োগ করায় যে ফল হইয়াছিল উহা ছাড়াও আর একটি প্রভাব কংগ্রেসের উপর এই সময়ে পড়িয়াছিল, যাহা ছিল অনস্বীকার্য। উহা হইল যুব সমাজের মধ্যে জাগরণ। কংগ্রেসের ভিতরে যুব সম্প্রদায় গত কিছুকাল ধরিয়াই অধিকতর চরমপন্থী মতবাদের জন্য দাবী করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবেই মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জাতির পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতবাসীর লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত বলিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে। সুতরাং, কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহারই যুক্তিসম্মত পরিণতি হইল স্বাধীনতা[১] সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা মাদ্রাজ কংগ্রেস গ্রহণ করে—তাহা হইল কার্য-নির্বাহক সমিতিতে বামপন্থী দলের প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করা। উপরন্তু পরবর্তী বৎসরের জন্য সাধারণ সম্পাদকরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (মতিলাল নেহরুর পুত্র), শ্রীযুক্ত সাহেব কুরেশী ও বর্তমান গ্রন্থের লেখককে নিয়োগ করা হয়। এইরূপে বামপন্থী নীতির দিকে যে সুনির্দিষ্টভাবে কংগ্রেসের গতি ফিরিল, মাদ্রাজ কংগ্রেসকেই উহার সূচনাকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারায় আর একটি যে বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তাহা হইল ইউরোপ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের আলোচনায় অংশগ্রহণ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবনের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কেম্ব্রিজে পড়াশুনা শেষ করিয়া তাঁহাকে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি তাঁহার পেশা ত্যাগ করিয়া মহাত্মার সঙ্গে যোগ দেন। এরূপ গুজব আছে, তাঁহার পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকেও অনুরূপ করিবার জন্য বুঝাইয়া রাজী করাইবার ব্যাপারে তাঁহারই কৃতিত্ব ছিল অধিক। আইন সভার ভিতরে ঢুকিয়া কাজ করিবার প্রশ্নে তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের সহিত একমত হন নাই; এবং যেহেতু তাঁহাদের হাতেই ক্ষমতা ছিল তিনি কংগ্রেসের পরিষদগুলিতে স্বেচ্ছায় পিছনের সারির আসন গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি তিনি

---

[১] মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়, কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ইহা 'তাড়াহুড়া করিয়া রচনা ও পরিণামের কথা না ভাবিয়াই গ্রহণ' করা হইয়াছে। লালা লাজপৎ রায় বলেন যে, 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারাও জাতীয় স্বাধীনতা বুঝায়—বহু লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে' বলিয়া ইহা গৃহীত হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা অনুরূপ একটা প্রস্তাব আনেন এবং উহা সর্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয়।

তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া ইউরোপে ভ্রমণ করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে ইউরোপের, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বশেষ ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়া নূতন মতবাদ প্রচার করেন যাহা কংগ্রেসের বামপন্থী দল ও দেশের যুব সংগঠনগুলি সাদরে গ্রহণ করে। তাঁহার জনজীবনের এই নূতন অধ্যায়টি প্রথম প্রকাশ পায় মাদ্রাজ কংগ্রেসে।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে দৃঢ় প্রাচীর তুলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহাতে গভর্নমেন্টের চোখ খুলিয়া গেল। প্রতিরোধ নরম করিবার জন্য কিছু করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতে পেৌঁছিবার পর অবিলম্বে স্যার জন সাইমন বড়লাটকে এক পত্র দিয়া জানাইলেন যে, কমিশনের বৈঠকগুলি হইবে 'খোলাখুলিভাবে যৌথ আলোচনা'; উহাতে সাতজন বৃটিশ সদস্য ও ভারতীয় আইন সভাগুলি কর্তৃক মনোনীত একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করিবেন। স্যার শঙ্করন নায়ারের প্রশ্নের উত্তরে স্যার জন সাইমন আরও জানান যে, আইন সভা কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলি যে সকল রিপোর্ট পেশ করিবে সেগুলি কমিশন পার্লামেন্টে যে প্রধান রিপোর্ট দাখিল করিবে উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার প্রস্তাবিত উপরোক্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, সকল দলের নেতৃবর্গ অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে ইস্তাহার প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সাইমন কমিশনের তাঁহারা বিরোধিতা করিয়া যাইবেন। ভারতীয় আইন সভায় সাইমন কমিশনকে বর্জন করিয়া লালা লাজপৎ রায় একটি প্রস্তাব আনেন এবং ইহা যথারীতি গৃহীত হয়। ফলে, সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য কোনও কমিটি নিযুক্ত করা আইন সভার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক আইন সভা-গুলির মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ আইন পরিষদই এই কমিটির নিয়োগ ঠেকাইতে পারিয়াছিল। কংগ্রেস ও উদারপন্থী দলের বাধাদান সত্ত্বেও অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আইন সভাগুলি কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য ভারতে আসিয়া পেৌঁছাইলে সারা ভারতে 'হরতাল' অর্থাৎ বর্জন-আন্দোলনের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়; কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এই আন্দো-লন পরিচালনা করেন। সারা দেশে বিশেষত বাঙলায় বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। কংগ্রেসনেতাদের নিকট হইতে জনসাধারণ একটি স্পষ্ট নেতৃত্ব আশা করিয়াছিলেন, এই বর্জন আন্দোলন যাঁহাদের বিরুদ্ধে যাহাতে তাঁহারা উহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের সদর দপ্তর হইতে এরূপ কোনও নির্দেশ পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র বাঙলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

নিজ দায়িত্বে বোম্বাইয়ে কমিশন যেদিন পদার্পণ করে সেই দিন বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু করে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যদি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তাহা হইলে ১৯৩০ সালে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহা তাঁহারা দুই বৎসর পূর্বে সুরু করিতে পারিতেন এবং সাইমন কমিশনের নিয়োগই ঐ আন্দোলনের সূচনালগ্ন হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হইত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন ১৯২৮ সালের মে মাসে মহাত্মার সহিত সবরমতীতে তাঁহার আশ্রমে গিয়া দেখা করেন, তখন বিভিন্ন প্রদেশে জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে জানান এবং অবসরজীবন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেশকে নেতৃত্ব দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে মহাত্মা জবাব দেন যে, যদিও তাঁহার চোখের সামনে বারদোলীর কৃষকগণ কর-বন্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন তথাপি তাঁহারা যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এরূপ কোনও আলো তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। সারা ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল ধরিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এতই চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল যে ঐ সময়ে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু করা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইত। উপরন্তু, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে, পাঞ্জাব ও বাঙলার মত প্রদেশগুলিতে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন আন্দোলন সুরু করেন তখন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং কোনও কোনও প্রদেশে পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন সুরু করার পর মহাত্মা তাঁহার **ইয়ং ইন্ডিয়া** পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, দুই বৎসর পূর্বে তিনি আন্দোলন সুরু করিতে পারিতেন। ১৯২৮ সালের সুযোগ কাজে না লাগাইবার জন্য কেবলমাত্র মহাত্মাই যে দায়ী তাহা নয়, স্বরাজ্যপন্থী নেতাদেরও দায়িত্ব রহিয়াছে: তাঁহাদের হাতে তখন কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কর্মশক্তির আবেগ তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল। যদি সেই সময়ে দেশবন্ধু দাশের মত একজন নেতাকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত-ভ্রমণকে বর্জনের পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, ১৯২৮ সালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইত।

সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন উহাতে না দমিয়া তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। যেখানেই তাঁহারা গিয়াছেন সেখানেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং 'সাইমন ফিরিয়া যাও' ধ্বনি তোলা হয়। গভর্নমেন্ট এক শ্রেণীর মুসলমান ও অনুন্নত শ্রেণীগুলির একটি দল লইয়া পাল্টা আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। এই বর্জন আন্দো-

লনকে যদিও কড়াকড়িভাবে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তথাপি কমিশন যেখানেই গিয়াছে সেখানেই প্রচুর পুলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও অকারণে কঠোর দমন-ব্যবস্থার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নিরস্ত্র জনতা ও সশস্ত্র পুলিসের মধ্যে যে সকল সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল সেগুলিতে একটি স্থানে—লাহোরে ছাড়া সাধারণত কোনও গুরুতর পরিণাম ঘটে নাই। সেখানে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে কালো পতাকা লইয়া যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহার উপর পুলিস লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন লালা লাজপৎ রায়; এই আক্রমণে গুরুতরভাবে তিনি আহত হন এবং শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকেন। প্রথমে কিছুটা ভাল হইয়া উঠিলেও তাঁহার হৃৎপিণ্ডে এমন কিছু স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল যে তাঁহার অবস্থা পুনরায় খারাপ হইয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। লালাজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং যেহেতু তাঁহার মৃত্যুর জন্য সাইমন কমিশন পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল, সেজন্য পাঞ্জাবের জনগণের কাছে কমিশন অধিকতর অপ্রিয় হইয়া উঠে; তাঁহারা এই মহান্ নেতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন।

নেতিবাচক কমিশন বর্জনের মধ্যেই নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপ আবদ্ধ রহিল না। তাঁহাদের সম্মুখে বড় যে কাজ পড়িয়া ছিল তাহা হইল সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া লর্ড বার্কেনহেডের আহ্বানের সমুচিত জবাব দেওয়া। ঐ উদ্দেশ্যে, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন বসিল। সর্বাপেক্ষা জটিল যে সমস্যা লইয়া সম্মেলনকে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল তাহা হইল নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন সভাগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদিগের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। মে মাসে বোম্বাইয়ে যখন সম্মেলনের পুনরধিবেশন বসিল তখন কোনও অগ্রগতি সম্ভব না হওয়ায় কাহারও তেমন উৎফুল্ল মনোভাব দেখা গেল না। মহাত্মা গান্ধীর বিচক্ষণতার ফলস্বরূপ সম্মেলন ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পরিবর্তে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলি নির্ধারণ এবং ঐ সম্বন্ধে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিয়োগ করিল যাহার চেয়ারম্যান করা হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে। এলাহাবাদে ঘন ঘন বৈঠকের পর কমিটি শেষ পর্যন্ত আগস্টে ইহার সর্বসম্মত রিপোর্ট[১] প্রচার করিল; অবশ্য উহা মুখবন্ধে উল্লিখিত কয়েকটি শর্তাধীন ছিল এবং উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্যার আলি ইমাম, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত এম. এস. অ্যানে, সর্দার মঙ্গল সিং, শ্রীযুক্ত সাহেব কুরেশী, শ্রীযুক্ত

[১] ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলি নির্ধারণের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত, এলাহাবাদ, ১৯২৮।

জি. আর. প্রধান ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক। নেহরু কমিটি রূপে পরিচিত ঐ কমিটির রিপোর্ট দেশের সকল জাতীয়তাবাদীই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ ইহার দ্বারা সাইমন কমিশনের কাজ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন; তিনি ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে অত্যধিক পরিশ্রম করেন। ত প্রচেষ্টায় ইহা বিরাট সাফল্য অর্জন করে। আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে রিপোর্টটি পেশ ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পুনরায় ইহা পেশ করা হয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কলিকাতার সর্বদলীয় সভায় এবং ঐ সভায় মুশ্লিম লীগ, শিখ লীগ ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিদিগের পক্ষ হইতে বিভিন্ন আপত্তি তোলা হয়। মুশ্লিম লীগের বিরোধিতা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং উহার ফলে অন্য দুটি দলও বাধাদান করিতে আগাইয়া আসে।

নেহরু রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হইয়াছিল যে, শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কি হইবে এই প্রশ্নে কমিটি একমত হইতে পারেন নাই কারণ সংখ্যাল্প[১] কয়েকজন সদস্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে মানিয়া লইবেন না এবং শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিয়াছেন। যাহা হউক, নেহরু কমিটির সদস্যাদিগের মধ্যে অধিকাংশই 'যে সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য পূর্ণস্বরাজ তাহাদের কার্যকলাপের অধিকার খর্ব না করিয়া' শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইয়াছিলেন। রিপোর্টে শাসনতন্ত্রের যে খসড়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল তাহা ছিল কেবল বৃটিশ ভারতের জন্য। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যে অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারও চুক্তি বা অন্য কোন অধিকারবলে অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করিবেন। অবশ্য, ভবিষ্যতে যে পর্যন্ত না যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আবশ্যক অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি প্রস্তুত হয় ততদিন ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত ঐগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের মিলনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করার কথা রিপোর্টে বলা হইয়াছিল। প্রদেশগুলির জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছিল স্বায়ত্তশাসন এবং সিন্ধু ও কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে—উভয় স্থানেই কার্যনির্বাহকদিগকে আইনসভার নিকট দায়ী করা হইয়াছিল। সেনেট ও প্রতিনিধি সভা লইয়া গঠিত হইবে কেন্দ্রীয় আইনসভা—প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সেনেটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ

[১] বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে।

করিবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের অধিকার থাকিবে এবং হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে লইয়া যৌথ-নির্বাচন হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেলায় কেবল দশ বৎসর কালের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকিবে। বাঙলা ও পাঞ্জাবে আদৌ কোনও সংরক্ষিত আসন থাকিবে না। ভারতের একটি সুপ্রীম কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার ব্যাপারে মৌলিক বাধানিষেধ থাকিবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করিবেন সিভিল সার্ভিসকে। রিপোর্টে আরও ঊনিশটি মৌলিক অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ করা হইয়াছিল যেগুলিকে সংবিধানে রূপ দিতে হইবে। বাকী সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর।

নেহরু কমিটির সর্বাপেক্ষা বিরাটতম সাফল্য ছিল প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভাগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদিগের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা। অল্প কিছুদিন পূর্বে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিয়াছিল তাহার পর এত শীঘ্র এরূপ একটি বিরাট সাফল্য সম্ভব হইত না যদি না সাইমন কমিশনের নিয়োগের দ্বারা নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। রিপোর্টে সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুসারে আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের অধিকারী হইবেন; উপরন্তু, অন্যান্য আসনের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। অবশ্য, এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল দশ বৎসরকাল চলিবে। বাঙলা ও পাঞ্জাবের জন্য আদৌ কোনও সংরক্ষিত আসন না রাখাই কমিটি স্থির করিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা জাতীয়তাবাদের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কোনও সংরক্ষণব্যবস্থা দাবী করেন নাই—এবং, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদিগের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কমিটি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করিয়াছিল। শিখদের সম্বন্ধে বলা যায়, অন্য দুইটি সম্প্রদায় রাজী হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু তাহারা রাজী না হওয়ায় শিখেরা তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় বেশী আসন দাবী করিয়া বসিলেন। যে নীতির প্রশ্নটি নেহরু কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল উহা ছাড়াও, বাস্তব দিক হইতে বিচার করিয়াও দেখা গিয়াছিল যে, বাঙলা ও পাঞ্জাবের সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হইবে ঐ দুইটি প্রদেশে কোনও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখা। বাঙলায়, যেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫৪ জন ও হিন্দু শতকরা প্রায় ৪৬ জন,—প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত আসনগুলির শতকরা ৪০টি মুসলমানগণ ও শতকরা ৬০টি হিন্দুরা পাইয়া থাকেন। বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাঞ্জাবে নির্বাচিত আসনগুলির মধ্যে

মুসলমানদের আছে শতকরা ৫০টি আসন, হিন্দুদের শতকরা ৩১টি এবং শিখদের শতকরা ১৯টি—অথচ সেখানে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন, হিন্দু শতকরা ৩৪ জন এবং শিখ শতকরা ১১ জন। এখন হিন্দু, মুসলমান ও শিখদিগের যে প্রতিনিধিত্ব চালু আছে উহা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার' উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে—যাহা ১৯২৬ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের মধ্যে আপোষ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা' অনুযায়ী হ্রাস পাইয়াছিল, কারণ অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানগণ তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের বিন্যাস করা হইয়াছিল। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনানুযায়ী মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, বাঙলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-দিগের নিকট উহা আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোনও অনুপাত স্থির করাও প্রায় অসম্ভব বলিয়া নেহরু কমিটি বুঝিয়াছিলেন। অতএব, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও, বাঙলা ও পাঞ্জাবে কোনও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া কমিটি মনে করিয়াছিলেন।

নেহরু কমিটি যখন নূতন শাসনতন্ত্রের নীতি নির্ধারণের আলোচনায় ব্যস্ত তখন অন্যত্র বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসে পুণাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে যে উদ্দীপনা দেখিয়াছিলাম তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল কারাবাসের সময় কংগ্রেসসেবকদিগের জন্য কয়েকটি নূতন যে কর্মধারা তৈয়ারী করিয়াছিলাম সেগুলি আমার বক্তৃতায় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। যেমন, আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের উচিত সরাসরি শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ গ্রহণ করা এবং যুবক ও ছাত্রদিগের তাহাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা—সেই সঙ্গে স্বদেশসেবার জন্যও পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করা ছাড়াও মহিলাদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের উপরও আমি জোর দিয়াছিলাম। পুণা হইতে বোম্বাইয়ে গিয়া দেখিলাম যে, সেখানকার যুব সমাজ ইতিমধ্যেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং কংগ্রেস কমিটির নিকট হইতে যখন প্রত্যাশিত নেতৃত্ব পাওয়া যাইতেছে না তখন তাহারা জাতির সেবায় উদ্যোগী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দেখিলাম ১৯২২ সালে গুজরাটে যে বারদোলী মহকুমায় মহাত্মা পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়াছিলেন সেখানে জুন মাসে পূর্ণোদ্যমে কর-বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছে। জমির খাজনা নির্ধারণে গভর্নমেন্ট

শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধির আদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের (প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠতর) নেতৃত্বে কৃষকগণ উহা দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া সত্যাগ্রহের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে. ইহার পর পুলিসের অত্যাচার চলিল; সম্পত্তি এবং জমি বাজেয়াপ্তকরণও তাহার মধ্যে ছিল। বারদোলীর কৃষকগণের পক্ষ হইতে কয়েক মাস ধরিয়া বীরত্বপূর্ণ অহিংস সংগ্রাম চালানো হইল এবং শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্টকে নতি স্বীকার করিতে হইল। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী—বিশেষতঃ বোম্বাই শহর—বারদোলীর কৃষকদের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছিল এবং আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে বিরাটতর যে সংগ্রাম বোম্বাইকে চালাইতে হইয়াছিল বারদোলীর এই আন্দোলন ছিল তাহারই সূচনা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল বিপুল খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন। ইঁহার পূর্বে তিনি অবশ্য মহাত্মার সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও বিশ্বাসী অনুগামীদের অন্যতমরূপে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বারদোলীর জয়ের ফলেই ভারতীয় নেতাদের পুরোভাগে তাঁহার স্থান হইল। তাঁহার এই বীরোচিত কার্যের প্রশংসাস্বরূপ মহাত্মা তাঁহাকে 'সর্দার' (অর্থাৎ নেতা) উপাধি দেন; ঐ নামেই তিনি এখন সাধারণতঃ পরিচিত।

আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে যখন সর্বদলীয় সম্মেলন হয় তখন নূতন একটি ঘটনা ঘটিল। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত তরুণ' তাঁহারা নেহরু কমিটির সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবের পর যে ঔপনিবেশিক ধরনের গভর্নমেন্টের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল উহা তাঁহাদের নিকট একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাজেই, লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐ রিপোর্ট গ্রহণে বাধা দান করাই ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। এরূপ কার্যধারার দ্বারা কংগ্রেসের শত্রুরাই পরমানন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিত, জাতীয় ঐক্যের জন্য কার্যরত শক্তিগুলিকে দুর্বল করা হইত এবং সাইমন কমিশনের মর্যাদা নষ্ট না হইয়া বৃদ্ধি পাইত। সুতরাং আমাদের কার্যধারা স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদিগের একটি ঘরোয়া সভা লক্ষ্ণৌতে ডাকা হইল এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আমি এই প্রস্তাব দিলাম যে, সভার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা সর্বদলীয় সম্মেলনকে পণ্ড না করিয়া সেখানে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সন্তুষ্ট থাকা এবং তাহার পর স্বাধীনতার অনুকূলে দেশে সক্রিয় প্রচার চালাইবার উদ্দেশ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন করায় উদ্যোগী হওয়াই আমাদের কর্তব্য। বামপন্থীদের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সেই অনুযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আমি সর্বদলীয় সম্মেলনে বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া

ধরিলাম। সম্মেলনের পর, সারা দেশে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের শাখা গড়িয়া তুলিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এবং নভেম্বর মাসে দিল্লীতে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের উদ্বোধন হইল।

লক্ষ্ণৌতে যে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' সুরু হয় উহা আর একটি আন্দোলন —যথা ছাত্র আন্দোলনের সমসাময়িক ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনকে বর্জনের আন্দোলন সুরু হইলে সারা বাঙগলার বিশেষতঃ কলিকাতার ছাত্রগণ ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকের বিরুদ্ধেই কলেজের কর্তৃপক্ষগণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তখনই ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বার্থের জন্য লড়াই করিবার মত নিজেদের একটি সংগঠনের অভাব অনুভব করিতে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা হইতেই বাঙগলায় ছাত্র আন্দোলনের জন্ম[১] হয়। আগস্ট মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ছাত্রদিগের প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের পর সারা বাঙগলা জুড়িয়া বহু ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠে এবং কিছুদিন পরে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র মহলে এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দেয়। আগের বৎসরে, কলিকাতা হইতে অনতিদূরে খড়্গপুরে রেলকর্মীদের ধর্মঘট হইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সালে কলিকাতার প্রায় ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস[২]-এ ধর্মঘট হইল, যাহার মধ্যে ছিলেন ১৮,০০০ কর্মী। এই ধর্মঘট কয়েক মাস ধরিয়া চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি মীমাংসা হইল; উহা কর্মীদিগের খুবই অনুকূল হইয়াছিল। টাটার ধর্মঘট অপেক্ষাও যাহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা হইল বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদিগের ধর্মঘট—উহাতে অন্ততঃ ৬০,০০০ শ্রমিক লিপ্ত ছিলেন। প্রথম দিকে এই ধর্মঘটের সাফল্য ছিল বিস্ময়কর এবং ইহার দ্বারা কেবল মিল-মালিকদেরই নয়, গভর্নমেন্টেরও গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর, কলিকাতার নিকটে লিলুয়া ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের কারখানায় ১০,০০০, জামসেদপুরে টিনপ্লেট কোম্পানীর ৪,০০০ এবং কলিকাতা হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে বজবজে তেল ও পেট্রোল ওয়ার্কস-এর ৬,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট

[১] যে অল্প কয়েক জন দেশকর্মী ছাত্রদিগকে সেই সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ ..., পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

[২] এই ধর্মঘট যখন প্রায় ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল তখন শ্রমিকদের চাপেই বর্তমান গ্রন্থের লেখক ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর ধর্মঘট পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী হয় এবং ইহার ফলে একটা সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, মীমাংসার পর শ্রমিকদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায় মারাত্মক ফল হয়। টাটার ধর্মঘট ছিল লেখকের শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম দীক্ষাস্বরূপ, যাহার সহিত বরাবর তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছেন।

করিল। শেষে উল্লেখ করিলেও, কলিকাতায় ও উহার নিকটবর্তী পাটকলগুলিতে ২০০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় কারণ ইহা একটি সঙ্ঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল দলের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল যাঁহারা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল: এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জন পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় নিজেদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্গত চরমপন্থীদের দ্বারাই উপরোক্ত ধর্মঘটগুলির অধিকাংশ পরিচালিত হয় এবং সেজন্যই দিন দিন তাঁহাদের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে। বৎসরের শেষের দিকে খনি অঞ্চল ঝরিয়ায় যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইল তখন দেখা গেল যে, বামপন্থীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কমিউনিস্টদের দলই হইতেছে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে লীগ এগেন্স্ট্ ইম্পিরিয়ালিজ্মের[১] সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার একটি নূতন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

সাধারণতঃ, ডিসেম্বর মাস হইয়া উঠিয়াছিল সভা ও সম্মেলনের মাস, যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস (যাহার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল), সর্ব-দলীয় সম্মেলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। যুব কংগ্রেসের সভাপতি হন বোম্বাইয়ের পার্সী নেতা শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরীম্যান–যিনি কংগ্রেসের বামপন্থী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আইন ব্যবসায়ী এবং প্রথমে একজন স্বরাজ্যপন্থী সদস্য হিসাবে বোম্বাই আইন পরিষদে যোগ্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য, বোম্বাই গভর্নমেন্টের ব্যাক বে রিক্লামেশন পরিকল্পনার ফলে অর্থের যে বিরাট অপচয় হইয়াছিল উহা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার প্রয়াসের দ্বারাই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে আদালতে মানহানির মামলার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; ইহাতে অবশ্য তিনি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরীম্যান বিখ্যাত হইয়া উঠার পর হইতে যতদিন না মহাত্মার অনুরোধে তাঁহাকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য করা হয় ততদিন চরমপন্থী মত পোষণ ও প্রকাশ করিয়া চলিয়াছিলেন। যুব কংগ্রেসের গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহা দেশের জনজীবনে একটি নূতন ধারার সৃষ্টি

[১] সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লীগকে প্রথমে একটা অ-কমিউনিস্ট সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইহার সভ্য ছিল। পরে লীগ যখন কার্যতঃ একটা কমিউনিস্ট সংস্থা হইয়া তখন জাতীয় কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আর ইহার সভ্য রহিল না।

করিয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের[১] মনোভাব হইতে কিছুটা ভিন্ন একটি মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

কংগ্রেস সপ্তাহে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের দুর্ভাগ্য-জনক পরিণাম হইয়াছিল। নেহরু রিপোর্টের খসড়া রচনায় যাঁহাদের হাত ছিল না তাঁহারা সকলে এখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিলেন। শ্রীযুক্ত এম. এ. জিন্না—যিনি এক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় মুস্লিম লীগের সম্মেলনে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মত প্রচার করিয়াছিলেন—তিনি এখন নেহরু রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের যে মীমাংসাকে রূপ দেওয়া হইয়াছিল উহার সংশোধনের জন্য তাঁহার সেই বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' দাবী লইয়া আগাইয়া আসিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ভারতীয় আইন সভার উভয় কক্ষে মুসল-মানদের জন্য নির্বাচিত আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ, অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলি প্রদেশগুলির উপর ন্যস্তকরণ ইত্যাদি ছিল তাঁহার দাবী। এই মনোভাব অবলম্বন করায় প্রতিক্রিয়াশীল স্বধর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠা শ্রীযুক্ত জিন্নার পক্ষে সম্ভব হইল কিন্তু নেহরু রিপোর্টের মূল্য ও গুরুত্ব কমিয়া গেল। মুসলমানদের অনুসরণে, শিখেরাও কতকগুলি চরম দাবী উত্থাপন করিলেন; এবং হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিগণ নেহরু রিপোর্টে ইতিপূর্বেই যাহা গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার বেশী আর কোনও সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন; এমন কি, মুসলমানদের নেহরু কমিটি কর্তৃক যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেও তাঁহারা ছাড়িলেন না। নেহরু রিপোর্টের পক্ষে মুস্লিম লীগের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এই কারণে যে ঐ সংগঠনের মধ্যে যেসব দল ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তি করিয়া ঐগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বর্গতঃ স্যার মহম্মদ সফীর নেতৃত্বে পরিচালিত দলটি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে বিরূপতার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতাকে সমর্থন জানাইয়াছিল। নেহরু রিপোর্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনের পক্ষে ছিল জাতীয়তাবাদী দল। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে শ্রীযুক্ত জিন্না কর্তৃক পরিচালিত দলটি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল অথচ সাইমন কমিশন বর্জনের প্রতি তাহাদের সমর্থন ছিল। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে মুস্লিম

---

[১] মহাত্মার সবরমতী আশ্রম ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পন্ডিচেরী আশ্রম হইতে যে নিষ্ক্রিয়তাবাদ প্রচার করা হইতেছিল উহার বিরুদ্ধে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে এই গ্রন্থের লেখক কর্মবাদের কথা প্রচার করেন। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্যও তিনি বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা মহাত্মা ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ভক্তদিগের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল।

লীগের একটা সভা আহূত হয়; কিন্তু বিবদমান দলগুলির মধ্যে দারুণ মত-বিরোধের ফলে হট্টগোলের মধ্যে ঐ সভা শেষ হইয়া যায়।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেস যখন একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল তখন মনে হইয়াছিল যে, ঐ সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছে। নেহরু কমিটির পক্ষে একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হইলে এবং ১৯২৮ সালের আগস্টে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক ইহা গৃহীত হইবার পর এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কংগ্রেসের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হইয়াছিল, যেমন ভুল হইয়াছিল গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান করা যেখানে অন্যান্য এমন অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন যাঁহাদের সেখানে থাকিবার কোনও অধিকার ছিল না। যে দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ও একচেটিয়াভাবে উহারই। সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্ট দেশের সকল দল অনুমোদন করিলেই কেবল ইহার মূল্য হইতে পারে। কিন্তু যে দেশ কিছুকাল যাবৎ বিদেশী শাসনাধীন রহিয়াছে সে দেশে এরূপ অনুমোদন লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। এরূপ কোন দেশে কিছু দল গভর্নমেন্টের মুঠার মধ্যে থাকিতে বাধ্য এবং এই দলগুলি সব সময়েই নেহরু রিপোর্টের ন্যায় দলিলের অনুমোদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। উপরন্তু, অন্যান্য দলগুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হইলে এরূপ অনুমোদনের সার্থকতাই বা কি আছে? কাজেই, যে দল সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য উহার আর কোনও দলের মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নয় যাহার জন্য উহা একাই লড়িতেছে।

ঐ বৎসরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহা হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়ার পর কলিকাতা অধিবেশনেই লোক-সমাগম হইয়াছিল সর্বাধিক এবং সমস্ত আয়োজনই বিরাটভাবে করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দল ছিল—অপেক্ষাকৃত প্রবীণদিগের যে দল তাহারা ঔপনিবেশিক ধরনের গভর্নমেন্ট পাইলেই সন্তুষ্ট হইত এবং সেজন্যই নেহরু রিপোর্টকে পুরাপুরি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল এবং বামপন্থীদের দল যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে জিদ ধরিয়া বসিয়া ছিল এবং জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করিতে চাহিয়া-ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অনুরোধে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভায় এই দুইটি দলের মধ্যে একটি আপোষ হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মহাত্মা এই কারণে দিল্লীচুক্তি মানিয়া লইতে আপত্তি জানাইলেন যে, ইহা স্ব-বিরোধী এবং ফলে দল দুইটির মধ্যে

পুনরায় ফাটল দেখা দিল। মহাত্মা ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আপোষের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সর্বাধিক যে সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল তাহা বামপন্থীদের ন্যূনতম দাবী পূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। ইহা ঠিক যে, প্রকাশ্য বিরোধ এড়াইয়া চলার ইচ্ছা বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল কিন্তু ঐ দলের সাধারণ কর্মীদের নিকট আপোষের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ফলে বামপন্থীরা সকলেই মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলেন; তাঁহারা লেখক কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানাইলেন। মহাত্মার প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল: "১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে কংগ্রেস সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে নেহরু কমিটি কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রকে পুরাপুরিভাবেই গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে ইহাকে গ্রহণ করা না হয় কিংবা তাহার পূর্বেই ইহা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে কর-দান হইতে বিরত থাকিবার জন্য 'এবং এই ধরনের আর যে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে সেইভাবে' দেশকে নির্দেশ দিয়া কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।" লেখক এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে কংগ্রেস স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না যদ্দ্বারা বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইবে; এবং অন্যান্য-দিগের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ইহা সমর্থন করিলেন। এই প্রস্তাবটি ৯৭৩--১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়: অবশ্য স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া যে সকলের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না; কেন না, মহাত্মার ভক্তগণ ইহার সহিত মর্যাদার প্রশ্নকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং জানাইয়া দিয়া-ছিলেন যে, যদি তিনি পরাজিত হন তাহা হইলে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। সুতরাং, দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই যে বহু লোক তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন এমন নয়—পরন্তু তাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন এই কারণে যে, তাঁহারা সেই দলে পড়িতে চাহেন নাই যে দলের দ্বারা মহাত্মা কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। তথাপি, এই ভোটের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছিল যে, বামপন্থীরা শক্তিশালী এবং তাঁহাদের প্রভাবও কম নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের যে ফল হইয়াছিল, তাহার পর কলিকাতা কংগ্রেসের ফল হইল একেবারে উল্টা রকমের। নির্বাচিত সভাপতি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন সেদিন তাঁহাকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয় তাহা রাজা মহারাজাদেরও ঈর্ষার উদ্রেক করিত; কিন্তু যখন তিনি প্রস্থান করিলেন তখন প্রত্যেকের মুখে হতাশা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী দারুণ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস সাহসের সহিত কাজ করিবে। কিন্তু দেশ যখন প্রস্তুত তখন নেতারা প্রস্তুত

ছিলেন না। মহাত্মার স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে, তিনি কোনও আলো দেখিতে পান নাই। এজন্যই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত দায়-সারা প্রস্তাবটি কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট করিল। কেবল উন্মাদ বা মূর্খ না হইলে ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্নমেন্ট বিনা বাধায় মানিয়া লইবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলিবার সময় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সংহতি প্রদর্শন ও ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের বিষয় বিবেচনার জন্য আবেদন জানাইবার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু অভ্যুত্থানের এই সকল লক্ষণ নেতাদের মনে কোনও রেখাপাত করিল না। সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে—এবং নিশ্চয়ই কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্বেই—যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল উহা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত গৃহীত হইল না। কিন্তু ততদিনে অবস্থার অনেক অবনতি ঘটিয়াছে।

৯

আসন্ন অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত (১৯২৯)

ইতিপূর্বে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, কলিকাতা কংগ্রেসের মোট ফলাফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে, কালের গতিকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মহাত্মার ন্যায় একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ কালের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে বামপন্থীরা সত্য সত্যই তীব্র বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নেতৃপদ রাখিতে হইলে কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধিতার মোকাবিলা না করিলে তাঁহার চলিত না। পরবর্তী বারো মাসে যে সকল কৌশলের সাহায্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি ছিল সত্য সত্যই অপূর্ব। এখনই আমরা দেখিব, কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে তিনি নিজে স্বাধীনতার কথা প্রচার করিয়া চরমপন্থীদের[১] অসুবিধায় ফেলেন এবং বামপন্থী কোনও কোনও নেতাকে স্বপক্ষে টানিয়া লইয়া বিরোধীদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কি স্বরাজ্যপন্থী কি 'সংস্কার-বিরোধী', অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদিগের সকল শ্রেণীর কাছেই বামপন্থীদের এই বিরোধিতা সমান বিপদ হইয়া দেখা দিয়াছিল, এবং কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ্যপন্থী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে 'সংস্কার-বিরোধী' মহাত্মা গান্ধীর পাশাপাশি দাঁড়াইয়া একই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে দেখা গিয়াছিল। পরবর্তী কয়েক মাসে এই সাময়িক ঐক্য আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং এক শ্রেণীর বামপন্থী নেতাদের সাহায্যে কংগ্রেসের পরিচালনায় তাঁহার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা এবং কলিকাতা কংগ্রেসের কার্যধারার ফলে দেশে তাঁহার মর্যাদা যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল উহা ফিরাইয়া আনা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হইল।

কংগ্রেস একটি লিখিত চরমপত্র দিয়াছে, কেবলমাত্র এজন্যই গভর্নমেন্ট নতি স্বীকার করিয়া বিনা বাধায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইবেন-- মহাত্মার ন্যায় একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সত্য সত্যই ইহা মনে করিতেন বলিয়া কাহারও পক্ষে সত্য সত্যই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সেজন্য, এই ধারণাই

[১] কলিকাতা কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই তিনি প্রকাশ্যে প্রচার সুরু করেন যে, যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে গভর্নমেন্ট ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী মানিয়া না লন তাহা হইলে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি একজন 'স্বাধীনতাওয়ালা' হইয়া যাইবেন। এই এক বৎসরের সময়-সীমা ১৯২১ সালে তাঁহার এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

করিতে হয় যে, কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা কেবল সময় লইতেছিলেন, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি অদূর ভবিষ্যতে লড়াই শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসেও কোনও প্রকারের গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন সুরু করার কোনও পরিকল্পনা মহাত্মার ছিল না—অথচ সেখানে তাঁহার দ্বারা আনীত স্বাধীনতার প্রস্তাবটিই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যথেষ্ট আত্মানুসন্ধানের পরেও তিনি দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই—লবণ তৈয়ারীর আন্দোলনের মধ্য দিয়া যাহার সূচনা হইতে পারিত। কিন্তু, সারা ১৯২৯ সাল ধরিয়া কংগ্রেস দেশকে দৃঢ় ও কৌশলপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইলেও দেশবাসীর অস্থিরতা কোনও প্রকারেই হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, বৈপ্লবিক শক্তিগুলি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, যদিও সমন্বয়ের অভাবে শক্তির বিরাট অপচয় হইয়াছিল। এই সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান ধারাটি ছাড়াও আরও তিনটি ধারায় তৎপরতা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল। বিপ্লবিগণ গোপনে কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছিলেন যাহা উত্তর ভারতেও কতকটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেশের প্রতিটি প্রান্তে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং সর্বত্রই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল মধ্যবিত্ত যুব সমাজের জাগরণ।

এই বৈপ্লবিক আন্দোলন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে লাহোর ও দিল্লীর দুইটি ঘটনার মধ্যে। লাহোরে মিঃ স্যান্ডার্স নামে একজন পুলিস ইন্সপেক্টরকে হত্যা করা হয়; তিনি ইংরাজ ছিলেন। বলা হইয়াছিল যে, ১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমন-বিরোধী আন্দোলনের সময় লালা লাজপৎ রায়ের উপর আক্রমণের ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হয়, মিঃ স্যান্ডার্স তজ্জন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া বিপ্লবীরা বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। অপর ঘটনাটি হইল দিল্লীতে অধিবেশন চলিবার সময় আইন সভার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ; সর্দার ভগৎ সিং ও শ্রীযুক্ত বটুকেশ্বর দত্ত নামে দুইজন যুবককে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল ঘটনার পর, সমস্ত দেশ জুড়িয়া বহু সংখ্যক যুবকের গ্রেপ্তার চলে এবং ১৯২৯ সালের প্রায় মাঝামাঝি লাহোরে সারা ভারত ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। যে কোনও কারণে হউক না কেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কেবল সাড়াই জাগে নাই, তাঁহাদের সহানুভূতিরও উদ্রেক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল এই যে, সর্দার ভগৎ সিং তাঁহার গ্রেপ্তারের পূর্বে পাঞ্জাবের যুব আন্দোলনের (যাহাকে নওজোয়ান ভারত সভা বলা হইত) নেতারূপে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর এবং বিচার চলিবার সময় যে নির্ভীক ও অনমনীয়

মনোভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। উপরন্তু, একটি সুপরিচিত দেশপ্রেমিক পরিবারে সর্দার ভগৎ সিং জন্মিয়াছিলেন; যে সর্দার অজিত সিং ১৯০৯ সালে লালা লাজপৎ রায়ের সহিত একত্রে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন, ভগৎ সিং ছিলেন তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উন্মত্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরূপে নওজোয়ান ভারত সভা প্রথম শুরু হয়। যদি সরকারী অভিযোগসমূহ বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ঐ সভা একটি বিপ্লবী সংগঠন হইয়া উঠে এবং ইহার কোন কোন সদস্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও রত হন। এই সকল অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, সমাজবাদের প্রতি ঝোঁক যে সভার মধ্যে স্পষ্টতঃই দেখা গিয়াছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা উল্লেখ করাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাঞ্জাবের সকল যুব সংগঠনেরই সমাজবাদের প্রতি তীব্র ঝোঁক রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচীতে যখন নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশন হয় তখন ইহার পাঞ্জাব শাখার সদস্যগণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের বিরোধী এবং সমাজবাদী ধারায় গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিগণ তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর অনতিবিলম্বেই এই দাবী জানাইলেন যে, সাধারণ অপরাধীদের অপেক্ষা তাঁহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে কারণ তাঁহারা বিচারাধীন রাজবন্দী—যতক্ষণ না তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দণ্ডিত হইতেছেন তাঁহাদের ততক্ষণ নির্দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে: এই ব্যাপারে সর্দার ভগৎ সিং তাঁহাদের নেতা ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক যে সকল উপায় প্রচলিত ছিল সেগুলির সাহায্যে চেষ্টা করিবার পর তাঁহারা যখন দেখিলেন যে কোনও প্রতিকার সম্ভব হইল না তখন তাঁহারা অনশন-ধর্মঘটের আশ্রয় লইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার এক যুবক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস: তিনি প্রথমত এই অনশন-ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই ছিলেন, কেন না একটি মারাত্মক খেলা বলিয়া তিনি ইহাকে মনে করিয়াছিলেন। বাকী সকলের উৎসাহের ফলেই তিনি এই ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হন—কিন্তু এরূপ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, পরিণাম যাহাই হউক না কেন—তাঁহাদের দাবীগুলি পুরাপুরি মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই অনশন-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে ব্যাপক একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিল এবং জনসাধারণ দাবী জানাইলেন যে, তাঁহাদের ন্যায্য অভিযোগগুলির প্রতিকার করিয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষা করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য। বন্দীদিগের অবস্থা যখন গুরুতর হইয়া উঠিল, গভর্নমেন্ট তখন অনিচ্ছার সহিত মিটমাটের জন্য চেষ্টা চালাইলেন। যথা, স্বাস্থ্যের কারণে

অনশন-ধর্মঘটীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কেবল নিজেদের জন্যই ভাল ব্যবহার তাঁহারা দাবী করেন নাই, পরন্তু যে সকল বন্দীর ঐ একই দশা তাঁহাদের জন্যও তাহা চাহিয়াছিলেন এবং এই কারণে যে তাঁহারা রাজবন্দী। গভর্নমেন্ট এই দাবী মানিবেন না, সুতরাং ধর্মঘট চলিতেই লাগিল। পত্রিকাগুলির মাধ্যমে প্রচণ্ড এক আলোড়ন সৃষ্টি করা ছাড়াও, রাজবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার দাবী করিয়া সারা দেশে সভা ও বিক্ষোভ চলিল। সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় এই জাতীয় একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যাপারে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারার্থ হাজির করা হয়; বর্তমান গ্রন্থের লেখকও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

কিছু দিন অতিক্রান্ত হইবার পর অনশন-ধর্মঘটীরা একে একে অনশন ত্যাগ করিতে শুরু করিলেন কিন্তু তরুণ যতীন দমিবার পাত্র ছিলেন না। ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার মধ্যে দ্বিধা, দোদুল্যমানতা দেখা গেল না—সদর্পে তিনি আগাইয়া চলিলেন মৃত্যু ও মুক্তির পথে। প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয় ইহাতে নড়িয়া উঠিল কিন্তু আমলাতন্ত্রের হৃদয় নড়িল না। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীনের মৃত্যু হইল। কিন্তু তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা জানায়, ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই তাহা জুটিয়াছে। অন্ত্যেষ্টির জন্য তাঁহার মৃতদেহ লাহোর হইতে কলিকাতায় আনয়ন কালে সহস্র সহস্র লোক প্রতিটি স্টেশনে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা জানান। তাঁহার এই শহীদের মৃত্যুবরণ ভারতীয় যুবকদিগের নিকট গভীর প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিয়াছিল এবং সর্বত্র যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত বহু বার্তার মধ্যে একটি প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ইহা হইল কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবারের বার্তা—আয়ার্ল্যান্ডে যিনি অনুরূপ অবস্থার মধ্যে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। বার্তাটিতে বলা হইয়াছিল: 'টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার বেদনা ও গর্বের সহিত যতীন দাসের মৃত্যুর কথা শুনিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবেই।'

মৃত্যুকালে যতীন দাসের বয়স হইয়াছিল পঁচিশ। ১৯২১ সালে ছাত্র অবস্থাতেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কয়েক বৎসর তিনি জেলে কাটান। অনেকগুলি বৎসর নষ্ট হইবার পর, পুনরায় কলিকাতার একটি কলেজে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং তাহার পরে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে এবং বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তিনি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ বাহিনীতে বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন চীফ অফিসার বা জি. ও. সি—যতীনের পদ ছিল মেজরের। কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই বঙ্গীয়

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস ও ইহার সহিত যুক্ত জাতীয় প্রদর্শনীর জন্য বিরাট একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ বাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদানের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত করা হয়। যদিও ঐ বাহিনী ছিল শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র একটি দল, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা, তৎসহ আধা-সামরিক পোশাকও দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে ভাঙিগয়া না দিয়া সারা প্রদেশ জুড়িয়াই উহার শাখা গড়িয়া তোলা হইল। এই শ্রমসাধ্য কাজে যতীনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার ও স্বেচ্ছাসেবকেরা শবযাত্রায় প্রধান একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে মহাত্মার মনোভাব ছিল দুর্বোধ্য। যতীন দাসের এই শহীদের মৃত্যুবরণ, যাহা দেশবাসীর হৃদয়কে নাড়া দিয়াছিল, স্পষ্টতঃই তাঁহার মনে কোনও রেখাপাত করে নাই। সাধারণতঃ রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং স্বাস্থ্য, পথ্য ইত্যাদির ন্যায় বিষয়ে মন্তব্যে **ইয়ং ইন্ডিয়ার** পাতাগুলি পূর্ণ থাকিত কিন্তু এই ঘটনাটি সম্বন্ধে উহার কোন বক্তব্যই ছিল না। মহাত্মার এক ভক্ত, যিনি শহীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন, এই ঘটনার বিষয়ে তাঁহার নীরবতার কারণ জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। মহাত্মা এই মর্মে উত্তর দেন যে, মন্তব্য প্রকাশ করা হইতে তিনি ইচ্ছা করিয়াই বিরত রহিয়াছেন, কারণ যদি তিনি উহা করিতেন তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে কিছু লিখিতেই তিনি বাধ্য হইতেন।

দিল্লীতে যখন আইন সভার অধিবেশন চলিতেছে তখন যতীন দাসের এই আত্মোৎসর্গের সংবাদ সেখানে পৌঁছিল। ক্ষণিকের জন্য মনে হইয়াছিল যেন গভর্নমেন্টের হৃদয়টি নড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বিচলিত ভাবটি ছিল সাময়িক। সেই সময়ে যে ভাবাবেগ জাগ্রত হইয়াছিল উহা শীঘ্রই সরকারী কূটনীতি ও কপটতার নীচে চাপা পড়িয়া গেল। গভর্নমেন্ট রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্নটি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু যথেষ্ট বিবেচনা ও বিলম্বের পর, যখন জনগণের উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিলেন। তখন দেখা গেল যে, যে প্রতিকারের কথা বলা হইয়াছে উহা ব্যাধির তুলনায় আরও খারাপ। প্রথমতঃ গভর্নমেন্ট কাহাকেও রাজবন্দী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করিতে স্বীকৃত হন নাই—ফলে লাহোরের অনশন-ধর্মঘটীদের মূল দাবীটাই একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তাহার পরিবর্তে গভর্নমেন্ট প্রস্তাব করিলেন যে, ভবিষ্যতে বন্দীদিগকে হয় যথাক্রমে ক, খ ও গ—এই তিনটি শ্রেণী নতুবা ১, ২ ও ৩নং বিভাগের কোনও একটিতে রাখা হইবে। গ শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি ঠিক সাধারণ অপরাধীদের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে; খাদ্য, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য

সুবিধাদির ব্যাপারে গ শ্রেণী অপেক্ষা কিছু ভাল ব্যবহার করা হইবে খ-শ্রেণীর বন্দীদের সহিত—আবার ক শ্রেণীর বন্দীরা খ শ্রেণীর বন্দীদের অপেক্ষা কিছু ভাল ব্যবহার পাইবেন। এই শ্রেণী বিভাগের সময় পার্থক্য করা হইবে বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে। এই সকল নিয়ম যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হইল তখন দেখা গেল যে, রাজবন্দীদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জনকে গ শ্রেণী-ভুক্ত করা হইয়াছে; শতকরা প্রায় ৩ বা ৪ জনকে রাখা হইয়াছে খ শ্রেণীতে এবং শতকরা ১ জনেরও কম ক শ্রেণীতে পড়িয়াছেন। সুতরাং, নূতন এই সকল বিধানের উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দীদের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য একেবারে নগণ্য সংখ্যাল্প কয়েক জনের প্রতি কতকটা ভাল ব্যবহার করা। এইরূপে, কারা-পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল 'বিভেদের' নীতি। নূতন নিয়মের একমাত্র যে বৈশিষ্ট্যটি স্বাগত ছিল তাহা হইল, কোনও কোনও বন্দীকে 'ইউরোপীয়' বলিয়া শ্রেণীবিন্যাস করার ব্যবস্থাটি নীতিগতভাবে ইহার দ্বারা রদ হইয়াছিল: তাঁহারা সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়গণ অপেক্ষা ভাল খাদ্য, পোশাক ও থাকিবার স্থান পাইতেন। যাহা হউক, লেখক কার্যতঃ ব্যক্তিগতভাবে বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের ন্যায় বহু প্রদেশে দেখিয়াছেন যে, 'ইউরোপীয়' বন্দিগণ পূর্বে যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেন সেগুলি তাঁহারা এখনও ভোগ করিতেছেন। উপরন্তু মাদ্রাজ জেলে—যেখানে লেখক ১৯৩২ সালে দুই মাস বন্দী ছিলেন—'ইউরোপীয়' বন্দিগণ যে ওয়ার্ডে থাকিতেন তাহার সম্মুখে 'ইউরোপীয় ওয়ার্ড' এরূপ প্ল্যাকার্ডও তাঁহার চোখে পড়িয়াছে এবং ইহাতে তিনি আপত্তি করায় উহা সরাইয়া লওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যখন নূতন বিধানগুলির খসড়া তৈয়ারী হয় তখন স্বরাজ্যপন্থিগণ সহ আইন সভার সদস্যরা আশানুরূপ বাধা দান করেন নাই; এবং শ্রীযুক্ত জিন্নার ন্যায় কোনও কোনও সদস্য, যাঁহাদের কারাজীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নূতন বিধানগুলি আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।

ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে যুব সমাজের[১] মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের ইতস্তত ভাব এবং আইন সভাগুলিতে স্বরাজ্যপন্থীদের পুরানো কৌশল যুবকদিগকে তাহাদের কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতায় যুব কংগ্রেসের প্রথম

---

[১] ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ একই রকমের নারী জাগরণ ঘটে। ১৯২১ সালে বাঙলার মহিলাদিগকে জাতীয় কার্যে শিক্ষাদানের জন্য 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেশবন্ধু। তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হইয়া যায়। ১৯২৮ সালে লেখক যখন পুনরায় জনসেবামূলক কার্য সুরু করেন তখন কলিকাতায় 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ' নামে নারীদিগের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার পর সারা দেশে আরও বহু সংগঠন গড়িয়া উঠে।

অধিবেশনের সাফল্য ইহাতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল এবং শহীদের ন্যায় মৃত্যু-বরণ করিয়া যে অবিনশ্বর কীর্তি যতীন্দ্রনাথ দাস স্থাপন করিয়া যান তাহাতে আরও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সারা ১৯২৯ সাল ধরিয়া সমগ্র বাঙলা দেশ-ব্যাপী প্রাদেশিক যুব সম্মেলন ও প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের শাখা হিসাবে বহু যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথকভাবে ছাত্র ও যুবকদিগের বহু সম্মেলনও এখন হইতে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ চিত্র দেখা গেল। পুণাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী যুব সম্মেলন হইল; উহাতে সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, যিনি অল্প দিনের মধ্যেই যুব সমাজে একজন জনপ্রিয় নেত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বরে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত হইল পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ইহার পরে, নাগপুরে নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে অমরাবতীতে বেরার ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল; ঐ দুইটি সম্মেলনেই সভাপতিত্ব করেন লেখক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও ঐ একই ধরনের বহু সম্মেলন হয়। বৎসরের শেষাশেষি লাহোরে যখন কংগ্রেস সপ্তাহ চলিতেছিল তখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সেখানে ছাত্রদের একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

এই যুব জাগরণের সংগে সংগে শ্রমিক সমাজে সর্বব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল এবং সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল। কিন্তু যে ধর্মঘটটি গভর্নমেন্টকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল তাহা হইল বস্ত্রকল শ্রমিকদিগের ধর্মঘট; কারণ সাম্যবাদী ভাবাপন্ন সুশিক্ষিত নরনারীর একটি সংঘবদ্ধ দলের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ে এই ধর্মঘট শুরু হইয়াছিল। মালিক পক্ষ ও গভর্নমেন্ট ইহাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য এক-জোট হইয়া চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে বহু গুণ্ডা দালাল বাহির হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। যখন এরূপ লক্ষণ দেখা গেল যে ধর্ম-ঘটের জোর কমিয়া আসিতেছে তখন গভর্নমেন্ট প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। সেই সংগে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত জুড়িয়া প্রগতিশীল মতাবলম্বী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদিগকে একাধারে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাদের মধ্যে একত্রিশ জনকে সারা ভারত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারার্থ দিল্লীর কাছাকাছি মীরাটে লইয়া আসা হইল। মীরাট ছোট শহর হওয়ার দরুন সেখানে কোনও গণবিক্ষোভ হইবে না এবং জুরীর বিচারও সেখানে চালু নাই, সম্ভবতঃ

এই কারণেই বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন স্থান হইতে মীরাটে আনা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ইংরাজ ছিলেন আর সম্ভবত ইহার জন্যই বৃটিশ শ্রমিক মহলে, মতনির্বিশেষে সকলের মধ্যেই, মামলায় বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রায় চার বৎসর ধরিয়া এই বিচার চলিয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে বার বার জামীন প্রার্থনা করা হইলেও অভিযুক্তদিগকে তাহা দেওয়া হয় নাই। মামলায় এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, ভারতের উপর সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার জন্য অভিযুক্তগণ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সাহায্যে সোভিয়েট ধাঁচের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রায় বাহির হইল। অভিযুক্তদের মধ্যে তিন জন অব্যাহতি পাইলেন এবং অন্যান্যেরা (বিচার চলিবার সময় একজন মারা গিয়াছিলেন, তিনি ছাড়া) তিন বৎসরের কারাদণ্ড হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মীরাটের গ্রেপ্তারের সময় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিলে ভারত সচিবরূপে ক্যাপ্টেন ওয়েজউড-বেন নিযুক্ত হন। মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক দল কিছু করিবে ইহা আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হইল না। অপরপক্ষে ভারতীয় শ্রমিক মহলকে শান্ত করিবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রিসভা অন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সাইমন কমিশনের শ্রমিক দলের অংশ হিসাবে মিঃ হুইটলিকে চেয়ারম্যান করিয়া শ্রমিকদের বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটা রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হইল। ঐ কমিশন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা ও তাহার উন্নতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিবে। সাইমন কমিশন বর্জনের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ—শ্রীযুক্ত এন. এম. যোশী (বোম্বাই) ও শ্রীযুক্ত চমনলালকে (লাহোর) দুটি আসন দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা দুজনেই ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী দলভুক্ত; তাঁহারা প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সিদ্ধান্তের ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদিগের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। নভেম্বর মাসে নাগপুরে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল তখন দেখা গেল যে, অধিকাংশই লেবার কমিশনের (যাহাকে হুইটলি কমিশন বলা হইত) বর্জনের পক্ষে। ইহার কয়েকটি কারণ ছিল। সেই সময়ে বর্জনই চালু হইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু, মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক মন্ত্রিসভা কোনও কিছু করিতে না পারায় তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত কমিশনের দ্বারা ভারতের কোনও কল্যাণ সাধিত হইবে না বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তৃতীয়ত, গত মার্চ মাসে সারা ভারতব্যাপী ব্যাপক

গ্রেপ্তারের ফলে বামপন্থীদের প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন মহলে সহানুভূতির সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন বর্জনের প্রস্তাবটি গৃহীত হইল তখন 'চমনলাল নিপাত যাও', 'যোশী নিপাত যাও' ইত্যাদি ধ্বনি শুনা গিয়াছিল এবং ঐ মর্মে প্ল্যাকার্ডও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোশী, যিনি ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন এবং যাঁহাকে ঐ আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টারূপে মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না, তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের ফলে দক্ষিণপন্থীরা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যান। অতঃপর, তাঁহারা 'অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে তাঁহাদের নিজেদের সংগঠন স্থাপন করেন। এই বাহির হইয়া যাওয়ার কারণ সাধারণতঃ যাহা দেখানো হইত তাহা হইল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস লীগ এগেন্স্ট ইম্পিরিয়ালিজমের অনুমোদিত সংস্থায় পরিণত হইয়াছিল এবং প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটেরও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল—ঐ দুইটিই ছিল কমিউনিস্ট সংগঠন। কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল হুইট্‌লি কমিশনের বর্জন—যাহা কার্যকর হইলে শ্রীযুক্ত যোশী ও শ্রীযুক্ত চমনলালকে ঐ কমিশন হইতে পদত্যাগ করিতে হইত। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে ইহা লক্ষণীয় যে, ১৯২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঝরিয়া অধিবেশনে প্রস্তাবটি করা হইয়াছিল—কিন্তু সেই সময়ে দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মিবৃন্দের পক্ষে ইহা গলাধঃকরণ করা সম্ভব হইয়াছিল কারণ পরিচালন-ক্ষমতা দখলে রাখিবার মত তখনও তাঁহারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, হুইট্‌লি কমিশনের প্রশ্নেই দক্ষিণপন্থীরা পরাজিত হন: কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন এমন নয়, বরং তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল অ-কমিউনিস্ট সেন্টার পার্টি ঐ প্রশ্নে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া। সুতরাং, দক্ষিণপন্থিগণ যদি নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া না আসিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের তখনও একটি প্রধান ভূমিকা থাকিত। অবশ্য, তাঁহাদের একটি অসুবিধা ভোগ করিতে হইত—সম্ভবতঃ যাহার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না—অর্থাৎ, বৎসরে একবার জেনেভাতে তাঁহারা যে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যোগদান করিতেন তাহা তাঁহাদের বন্ধ করিতে হইত। জেনেভার ঐ আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন ভারতীয় শ্রমিকদের তেমন সাহায্য করিতে পারে নাই এবং যে সকল ভারতীয় প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠানো হইত তাঁহাদের অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয়, ভারত গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করিতেন বলিয়া উহাকে বর্জন করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব পাস করিয়াছিল। হুইট্‌লি কমিশনকে বর্জনের প্রস্তাবটির মত এই প্রস্তাবটিও দক্ষিণপন্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং প্রবাদের সেই বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই ইহা মনে হইয়াছিল।

১৯২৯ সালে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিলে অবস্থাগত বিচারে ইহা ঠিকই হইত। এরূপ করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহার সহিত উহা এক হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাঙ্গলায় মন্ত্রিগণ কংগ্রেস দলের নিকট বার বার পরাস্ত হইতে লাগিলেন। ঐ দলের নীতিতে বিরক্ত হইয়া মে মাসে গভর্নর আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া অবিলম্বে নূতন করিয়া নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, কংগ্রেস দল আরও বেশী সংখ্যায় সদস্য লইয়া পুনরায় আইন সভায় ঢুকিল এবং গত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যে সমস্ত আসন হারাইয়াছিলেন সেগুলির কয়েকটি পুনরায় তাঁহারা ফিরিয়া পাইলেন। কলিকাতার নিকটে রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের[১] পক্ষে ক্ষতিকর সংবাদাদি প্রকাশ করায় ঐ কোম্পানীর পক্ষ হইতে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা **ফরওয়ার্ডের** বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের মামলা আনা হইয়াছিল. নির্বাচনের ঠিক পূর্বে উহার রায় বাহির হইল। আদালত ১৫০,০০০ (মোটা-মুটি হিসাবে ১৩½ টাকা = ১ পাউন্ড) টাকা পরিমাণ যে ক্ষতিপূরণের রায় দিয়াছিল উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, এবং ইহার ফলে পত্রিকাটি বাধ্য হইয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন **ফরওয়ার্ড** আর বাহির হইল না বটে, কিন্তু ইহার স্থলে জন্ম হইল **লিবার্টি** নামে আর একটি দৈনিক পত্রিকার। সেজন্য কংগ্রেস দলকে মুখপত্রের অভাবজনিত কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

জুন মাসে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিল এবং বড়লাট লর্ড আরুইনকে আলোচনার জন্য লন্ডনে ডাকিয়া পাঠানো হইল; সেখানে তিনি কয়েক মাস থাকিয়া গেলেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ মহাত্মার একটি পরিবর্তন দেখা গেল। জুলাই মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় আইন সভাগুলি হইতে কংগ্রেসীদিগকে পদত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া একটি প্রস্তাব পাস হইল। বিভিন্ন আইন সভার কংগ্রেস দলগুলিকে না দেওয়া হইয়াছিল কোনও নোটিশ, না তাহাদের মত চাওয়া হইয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সম্মতি। মে মাসে পণ্ডিতজী বাঙ্গলার কংগ্রেস দলকে নির্বাচনী লড়াই চালাইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান আসনগুলির মধ্যে কয়েকটি পুনরায় দখল করিয়া লইবার জন্য তাহাদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই মাসেই এলাহাবাদে নিখিল ভারত

[১] ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সরকারের মালিকানাধীন রেলওয়ে এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান রেলপথ।

কংগ্রেস কমিটির[১] এক সভায় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন স্বর্গত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক; তাঁহারা উভয়েই ছিলেন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। এই বিরোধিতা ও বিভিন্ন আইন সভায় কংগ্রেস দলগুলির পক্ষ হইতে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছিল উহার ফলেও আইন সভাগুলি হইতে পদত্যাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দিয়া সমগ্র বিষয়টিই ডিসেম্বরের লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইল। এখনও পর্যন্ত অনেকের নিকট ব্যাপারটি ধাঁধার মত বোধ হয় যে, মে ও জুলাই মাসের মধ্যে এমন কি ঘটিয়াছিল যাহার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। আইন সভাগুলিতে কংগ্রেস দলের কাজে অকস্মাৎ কি তিনি নৈরাশ্য বোধ করিয়াছিলেন? অথবা তিনি কি আইন সভায় নিজ দলের মধ্যে বিদ্রোহ কিংবা দলাদলির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং সেজন্য ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন? অথবা তাঁহার কি এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, যে বামপন্থিগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত একটি দল গড়িয়া তুলিবেন, এবং সেই কারণেই মহাত্মার কাউন্সিল-বর্জনের সযত্নলালিত মতবাদে সম্মতি দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন? যাহাই হউক, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সমর্থন না পাইলে মহাত্মা কোনও ক্রমেই যে তাঁহার মতামত কংগ্রেসের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিতেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই সঙ্গে, খুবই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হয় যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত একমাত্র যে ব্যক্তি সেই সময়ে দুই দিক হইতেই মহাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তিনি আইন সভা বর্জনকে পুনরায় চালু করার ব্যাপারে মহাত্মার নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাইয়া স্বদেশের পুরাদস্তুর ক্ষতি করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর এই বর্জনের অনিষ্টকর ফল স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ততঃ, নূতন শাসনতন্ত্র যখন বিবেচনাধীন ছিল—বিশেষত আগের বৎসর যখন দেখা গিয়াছিল যে, আইন সভায় কংগ্রেসীদের উপস্থিতির ফলেই সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন ঐ সভার পক্ষে নীতির দিক হইতে আইন সভাগুলিকে বর্জন করা একটি বিরাট ভুল হইয়াছিল। প্রস্তাবিত বর্জনের বিরুদ্ধে একেবারে শেষ পর্যন্ত যে অল্প কয়েক জন লোক লড়িয়াছিলেন লেখক তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ও পরে স্বর্গত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থনে মহাত্মা সহজেই কংগ্রেসকে তাঁহার পক্ষে টানিতে পারিয়াছিলেন; এমন কি বাঙ্গলায়ও ঐক্যবন্ধ

[১] নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতেছে একটি সংস্থা যাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি প্রায় ৩৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। প্রতি বছর ইহার ১৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরিষদ নির্বাচিত হয়; উহাকে বলা হয় কার্যনির্বাহক সমিতি।

কোনও বিরোধিতা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও লেখকের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে জুলাই মাসে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আসন্ন কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন উহা স্থির করিবার জন্য আগস্ট মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ সভা ডাকা হইল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক বিরাট অংশ মহাত্মা গান্ধীকে মনোনয়ন দিয়াছিল কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। কংগ্রেসী মহলে সাধারণত এরূপ মনোভাব দেখা গিয়াছিল যে, ঐ সম্মান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য। কিন্তু মহাত্মা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রার্থিপদ সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত লইলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা ছিল একটি সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীদের নিকট ইহা দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, কারণ ঐ ঘটনার দ্বারা মহাত্মার সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক মিলন ও ইহার ফলস্বরূপ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সহিত বিচ্ছেদের সূচনা দেখা গিয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাত্মা কর্তৃক প্রচারিত নীতির একান্ত সমর্থক হইয়া উঠিয়াছেন এবং মহাত্মার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কও সর্বদাই সৌহার্দ্যপূর্ণ আছে। তথাপি, ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তিনি নিজেকে একজন সমাজবাদী বলিয়া দাবী করিয়া এরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে শুরু করেন যেগুলি মহাত্মা গান্ধী ও অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদিগের মতবিরুদ্ধ ছিল এবং জনসেবামূলক কাজে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী বামপন্থী দলের সহিত হাত মিলাইয়া তিনি চলিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় সমর্থন না থাকিলে, ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পক্ষে তাহার অর্জিত গুরুত্ব লাভ করা সম্ভব হইত না। কাজেই, বিরোধী বামপন্থী দলকে পরাস্ত করিয়া কংগ্রেসের উপর পূর্বেকার অবিসম্বাদী আধিপত্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে মহাত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁহার দলে টানিয়া লওয়া। তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নেতাদিগের মধ্যে কেহ যে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন, এই প্রস্তাবটি বামপন্থিগণ ভাল চোখে দেখেন নাই; কারণ ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রাধান্য ঘটিবে এবং সভাপতি শুধু সাক্ষী গোপাল থাকিবেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, বামপন্থী নেতার তখনই শুধু সভাপতির পদ গ্রহণ করা উচিত যখন কংগ্রেসে তিনি তাঁহার কর্মসূচী চালাইতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রার্থিপদকে সমর্থন করিয়া মহাত্মা একটি কৌশলের সাহায্য লইলেন এবং সভাপতিরূপে জওহরলালের নির্বাচনের দ্বারা তাঁহার জনজীবনে নূতন একটি অধ্যায়ের উন্মোচন হইল। সেই

অবধি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাত্মার একজন দৃঢ় ও অবিচল সমর্থক রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিল এবং যে উপায়-গুলির দ্বারা ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সম্ভব তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাহাতে তিনি সমর্থ হন তজ্জন্য পূর্ব হইতে কোনও ব্যবস্থানুসারে কমিশনের কার্য-কাল বৃদ্ধির প্রার্থনা জানাইয়া স্যার জন সাইমন ১৯২৯ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট এক পত্র দেন। তিনি এই প্রস্তাবও দেন যে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর মহামান্য সরকার এবং বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুইটি প্রস্তাবেই মন্ত্রিসভা সম্মত হন। ঐ মাসেই লর্ড আরুইন ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার আগমনের অনতিকাল মধ্যেই ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এই মর্মে তিনি এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, 'মহামান্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি স্পষ্টভাবে জানাইতে-ছেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যাহা নিহিত রহিয়াছে—ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ।' তিনি আরও জানান যে, স্যার জন সাইমনের প্রস্তাবমত, তাঁহার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হওয়ার পর লন্ডনে ঐরূপ একটি গোল টেবিল বৈঠক হইবে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং বড়লাটের এই নূতন মনোভাবের ফলে যে পরি-স্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল উহা দৃষ্টি এড়াইয়া গেল কিংবা কাজে লাগানো হইল না এমন নয়। দেশবন্ধু দাশের অবর্তমানে অন্তত এমন একজন লোক ছিলেন যিনি তৎক্ষণাৎ এই সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন এবং সৌভাগ্যবশতঃ তিনি তখন বড়লাট ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যস্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তিনি হইলেন শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল: যদিও তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ কংগ্রেসী, ১৯২৫ সালে আইনসভার অধ্যক্ষের পদে তিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অধ্যক্ষ প্যাটেলের জনজীবনটি ছিল উল্লেখযোগ্য। পেশাগত ভাবে এডভোকেট, রাজনীতি ছিল তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। দীর্ঘকাল তিনি বহু ঝড় ঝাপ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন এবং এক সময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকও হইয়াছিলেন। ঐ পদে থাকাকালীন ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের পূর্বে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলন্ড সফরে গিয়াছিল উহার সদস্যও তিনি ছিলেন। তিনি ছিলেন শাসনতান্ত্রিক আইনের এক মনোযোগী ছাত্র এবং সংসদীয় কার্যধারা, বিশেষতঃ প্রতিরোধের কৌশলে দক্ষ। লোকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিত: 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিখুঁত শাসনতন্ত্রও

বীঠলভাই টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারেন।' বৃটিশ হাউস অব কমন্সের কার্যধারা অনুসরণ করিয়া অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি এরূপ বিরাট সাফল্য অর্জন করেন যে, ১৯২৭ সালে বিনা বাধায় পুনরায় তিনি নির্বাচিত হন। গভর্নমেন্টের অকারণ বিরক্তি না ঘটাইয়া এমনভাবে তিনি আইনসভার কাজ পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, যাহা কোনও জনপ্রিয় অধ্যক্ষের পক্ষে প্রশংসাযোগ্য। ১৯২৯ সালে আইনসভায় যখন বোমা নিক্ষিপ্ত হইল তখন আইনসভা ভবনের প্রহরীদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার লইবার সুযোগ গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং গভর্নমেন্টকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহাকে তীব্র লড়াই চালাইতে হইয়াছিল। আইনসভার দপ্তরকে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্যও তাঁহাকে ভীষণভাবে লড়িতে হইয়াছিল; পূর্বে উহা ছিল ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে। কিন্তু এই সকল লড়াই তিনি এরূপ কৌশলের দ্বারা চালিত করিয়াছেন এবং শাসনতান্ত্রিক কার্যধারা এরূপ সতর্কতার সহিত মানিয়া চলিয়াছেন যে, বড়লাট লর্ড আরুইনের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে তিনি সমর্থ হন।

শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে বুঝাইলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সহিত একটি বুঝাপড়ার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে বড়লাট সম্মত হইলেন এবং ডিসেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকার ঘটিল। কিন্তু তাহার পূর্বে, নেতাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটি আভাষ দিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এইরূপে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সকল দলের নেতাদের একটি বৈঠক বসিল। ঐ বৈঠকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে যে আন্তরিকতা রহিয়াছে তাহা তারিফ করিয়া এবং ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াসে মহামান্য সরকার বাহাদুরের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করা হইবে। স্বাক্ষরকারিগণ এই আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিতে হইবে তখন ঐ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য গোল টেবিল বৈঠক প্রস্তাব করিবে। ঐ বৈঠক বসিবার পূর্বে সকল রাজনৈতিক অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষভাবে তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, নেহরু মহোদয়গণ (পিতা ও পুত্র), পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ মুঞ্জে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, এবং মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্তা বেসান্ত, শ্রীযুক্তা নাইডু ও আরও অনেকে এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথমতঃ অন্যান্য নেতাদিগের সহিত একমত হন নাই এবং লেখকের সহিত একত্রে ইহার বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সভার শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী নেতাদের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিতে তাঁহাকে এই যুক্তিতে রাজী করাইলেন যে, তিনি লাহোর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, এবং ইস্তাহারে তাঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে ইহার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পাইবে। অতঃপর ডাঃ এস. কিচলু (লাহোর), শ্রীযুক্ত আব্দুল বারি (পাটনা) ও লেখক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ, সেই সঙ্গে তথাকথিত গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করিয়া পৃথক একটা ইস্তাহার প্রচার করিলেন। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছিল যে, প্রকৃত গোল-টেবিল বৈঠকে কেবল সংগ্রামরত দলগুলিরই প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে নির্বাচিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা না করিয়া ভারতবাসীদের দ্বারা উহা করিতে হইবে। বড়লাটের ঘোষণার দ্বারা বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটি ফাঁদ পাতা হইয়াছে বলিয়া ঐ ইস্তাহারটিতে ভারতবাসীদের সতর্কও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই একই প্রকারের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সে-কথাই মনে করাইয়া দিয়াছিল; সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আয়ার্ল্যান্ডের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সে-দেশের সকল দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে—কিন্তু সিন ফিন দল তাঁহাদের মতলবে না ভুলিয়া সম্মেলন বর্জন করিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। নেতৃবৃন্দের ইস্তাহারের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল—সেই সঙ্গে তাঁহারা বেশ জন-সমর্থনও লাভ করিলেন। অপর পক্ষে, কেবল মাত্র বামপন্থী কংগ্রেসীগণ ও সাধারণভাবে যুব সমাজ বিরুদ্ধ ইস্তাহারটিকে স্বাগত জানাইলেন।

সেই নভেম্বর মাসেই কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বাঙলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইল। ঐ সভায় দেখা গেল যে, কমিটির মধ্যে দুইটি দল হইয়া গিয়াছে—স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি ও অপরটি লেখকের নেতৃত্বে। দুইটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত খুব সামান্য ভোটের ব্যবধানে লেখকের দল জয়লাভ করে। বাঙলায় ইহাই হইল বিরোধের সূত্রপাত এবং কংগ্রেস কমিটির মধ্যে এই বিরোধের ফলে ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। কলিকাতা কংগ্রেসে যখন স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাত্মাকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং লেখকও যাহাতে ঐরূপ করেন তাহা চাহিয়াছিলেন তখন হইতেই এই ভাঙনের সুরু। সেই হইতেই স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বাঙলায় গড়িয়া উঠিল পৃথক একটি দল—যাহা নিঃসংশয় আনুগত্যের সহিত মহাত্মা ও তাঁহার নীতিকে মানিয়া চলিয়াছিল। বাঙলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মহাত্মার দলের সহিত ঐভাবে যোগ দেয় নাই এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীর

দিক হইতে ইহারা কংগ্রেসের ভিতরে মহাত্মার বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

ডিসেম্বরে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এরূপ স্থির হইয়াছিল। ঐ সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটিল। বড়লাটের ট্রেনটিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুরুতর কিছু ঘটে নাই এবং লর্ড আরুইন দৈবক্রমে রক্ষা পান। তাহার পর সেই প্রার্থিত সাক্ষাৎকার ঘটিলেও উহা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। ভারতকে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট কিংবা অন্ততঃ বড়লাটের নিকট হইতে কংগ্রেস নেতাগণ এরূপ একটি আশ্বাস চাহিয়াছিলেন কিন্তু ঐ আশ্বাসের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাজেই, তাঁহাদিগকে নিরাশ হইয়া বড়লাটের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শূন্য হস্তে[১] লাহোর কংগ্রেসে যোগ দিতে হইল। সাধারণভাবে দেশের আবহাওয়া চরমপন্থী নীতির অনুকূলে ছিল—সারা বৎসর ধরিয়াই রাজনৈতিক চাঞ্চল্য বিদ্যমান ছিল। পাঞ্জাবে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের পর নওজোয়ান ভারত সভার পক্ষ হইতে যথেষ্ট প্রচার চালানো হয়; যতীন দাসের আত্মত্যাগ ঐ আবহাওয়ায় আরও উত্তেজনার সঞ্চার করে। অপর পক্ষে, কলিকাতা কংগ্রেসে যে সকল নেতৃবৃন্দ ইতস্ততঃ ভাব দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে কিছু লাভ করা সম্ভব হইল না। উপরন্তু, মহাত্মা এই মর্মে বিবৃতি দিয়া নিজেই একটি আপোষ করিয়া লইয়াছিলেন যে, যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি 'ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়ালা' হইয়া যাইবেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার গোঁড়া ভক্তেরাও বরাবর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ মনোভাব ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন যে, দেশে তখন যে আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে তাহাতে তাঁহার বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইবেই এবং সেজন্য তাঁহার পক্ষে খুবই সঙ্গত হইবে উহা নিজেই উত্থাপন করা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, সভাপতি ছিলেন কেবল নামে মাত্র সভাপতি এবং কার্যধারার মধ্যেই আগাগোড়া মহাত্মা গান্ধীর প্রাধান্য দেখা

[১] সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বড়লাটের ঘোষণার অনতিকাল পরে ইংলন্ডে মিঃ চার্চিল, লর্ড বার্কেনহেড, লর্ড রেডিং ও অন্যান্য অনেকে যে বাধাদান করেন তাহার ফলেই মহাত্মা গান্ধীকে কোনও আশ্বাস দেওয়া কি বৃটিশ গভর্নমেন্ট কি লর্ড আরুইন কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই।

গেল। তিনি স্বাধীনতাকে সমর্থন করিয়া বামপন্থীদের কাহাকেও কাহাকেও স্বপক্ষে টানিয়া লইতেও সমর্থ হন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করিলেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল উহা পরিবর্তন করে নাই এবং লাহোরে ইহা করা হইল। বড়লাটের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ করিলে দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া মহাত্মা কর্তৃক যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় উহার একটি ধারা লইয়া খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল। কংগ্রেসের ভিতরে এই মনোভাব দেখা গিয়াছিল যে, রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঐ ধারাটি অবান্তর কিন্তু ইহা রাখিয়া দিবার জন্য মহাত্মা জেদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ এই কারণে যে, লর্ড আরুইনকে শান্ত করিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় সৌহার্দ্য স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি ইহাকে তাঁহার নিজের উপর আস্থার প্রশ্ন করিয়া তোলেন এবং খুব সামান্য ভোটে জয়লাভ করেন। তাহার পর দেখা দিল পরবর্তী বৎসরের আন্দোলন সম্বন্ধে পরিকল্পনার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে মহাত্মা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। আইনসভাগুলি হইতে পদত্যাগ করিবার জন্য কংগ্রেসীদিগকে নির্দেশ দিয়া কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাস করিল এবং এতদ্দ্বারা ১৯২৩ সালে স্বরাজ্যপন্থীদের যে জয় হইয়াছিল, ১৯২৯ সালে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। মহাত্মার পরিকল্পনার বাস্তব অংশ হিসাবে কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহার অনুরোধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল--যাহাতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সংযম অভ্যাস এবং মদ্য পান ও বিক্রয় বন্ধ করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রচার চালাইবার জন্য অল-ইন্ডিয়া স্পিনারস্ এ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছিল। ফলে, দেশে কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেসীগণ কি কাজ করিবেন এ বিষয়ে প্রত্যেকেই প্রশ্ন তুলিলেন। যখন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বিষয় নির্বাচনী কমিটির সম্মুখে পেশ করা হইল তখন যথেষ্ট বাধা দেওয়া হইয়াছিল, যে মনোভাব হইতে উহা করা হইয়াছিল তাহা এই যে, এড্ হক সংস্থাগুলির দ্বারা ঐ কাজ করাইতে হইবে বলিয়া মহাত্মা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা না করিয়া কংগ্রেস সংগঠনগুলিরই উহা করা কর্তব্য। তাহার পর ঐ প্রস্তাবটি ভোটে হারিয়া গেল। বামপন্থীদের পক্ষ হইতে লেখক কর্তৃক এই মর্মে এক প্রস্তাব আনা হইল যে, দেশে সমরূপ একটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং ঐ উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদিগকে সংগঠিত করার কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটিও ভোটে হারিয়া যায়, যাহার ফলে পূর্ণ স্বরাজ কংগ্রেস লক্ষ্য হিসাবে মানিয়া লইলেও ঐ লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্য না কোনও পরিকল্পনা স্থির করিয়া দেওয়া হইল—না গ্রহণ করা হইল পরবর্তী বৎসরের জন্য কোনও কর্মসূচী। ইহাপেক্ষা অধিকতর হাস্যকর অবস্থা কল্পনা করা

কঠিন কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও কেবলমাত্র বাস্তবতাবোধই নয় কাণ্ডজ্ঞানও বিসর্জন দিবার ঝোঁক দেখা যায়। পরবর্তী বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচনের সময় মহাত্মা পনের জনের নামের একটি তালিকা উত্থাপন করিলেন; ঐ তালিকা হইতে ইচ্ছা করিয়াই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, লেখক ও অন্যান্য বামপন্থীদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে একটি শক্তিশালী মত গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অন্ততঃ শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও লেখকের নাম থাকা উচিত। কিন্তু মহাত্মা শুনিবেন না। তিনি খোলাখুলিই বলিলেন যে, এমন একটি কমিটি তিনি চান যাহা সম্পূর্ণ একমত হইয়া কাজ করিবে এবং তাঁহার পুরা তালিকাটিই গৃহীত হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আবার একবার মহাত্মার উপর আস্থা স্থাপনের প্রশ্ন দেখা দিল এবং যেহেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করার কোনও ইচ্ছা সভার ছিল না, তাঁহার দাবী মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মার সত্যই বিরাট একটি সাফল্য হইল। বামপন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট মুখপাত্রদিগের অন্যতম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি তাঁহার দলে টানিয়া লইলেন এবং অন্যান্য সকলকে ওয়ার্কিং কমিটি হইতে বাদ দেওয়া হইল। তাঁহার কমিটির মধ্যে বাধাদানের কোনও ভয় না থাকায় এখন হইতে মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হইল তাঁহার নিজের পরিকল্পনাসমূহ লইয়া অগ্রসর হওয়া, এবং কমিটির বাহিরে যখনই কোনও বিরোধিতা দেখা গিয়াছে তিনি সর্বদাই কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ অথবা আমৃত্যু অনশনের ভয় দেখাইয়া জনসাধারণকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা। এরূপ একটি বাধ্য কর্মপরিষদ পাইয়া ১৯৩১ সালের মার্চে লর্ড আরুইনের সহিত পাকাপাকিভাবে চুক্তি সম্পাদন করা, গোল-টেবিল বৈঠকে একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হওয়া, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুণা চুক্তি সম্পন্ন করা—এবং জাতির স্বার্থের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক অন্যান্য কাজগুলি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

সাধারণ দেশবাসী, যাঁহারা রাজনৈতিক জটিলতা বা কংগ্রেসের ভিতরের মতবিরোধের কোনও খোঁজখবর রাখিতেন না তাঁহারা লাহোর কংগ্রেস হইতে প্রভূত প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিতে আসিলেন। শীতকালে লাহোরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল এবং যখন পতাকা উত্তোলিত হইল তখন বিপুল জনমণ্ডলীর মধ্যে এক শিহরণ বহিয়া গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইলে দিগন্তে আলোকের রেখা দেখা দিল এবং নূতন এক আশা—এবং নূতন ঘোষণার আলোকবর্তিকা লইয়া ঐ মহাসভার সদস্যগণ ঘরে ফিরিলেন।

১০

ঝটিকাক্ষুব্ধ ১৯৩০

নূতন বৎসর সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। সত্বর স্বাধীনতা লাভের জন্য কর্তব্য নির্দেশের আশায় দেশবাসী অধীর আগ্রহে কার্যনির্বাহক সমিতির মুখ চাহিয়া ছিল। মহাত্মা এই অবস্থা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিলেন এবং বলিলেন : 'যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যাহারা বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সম্মেলনাদিতে কর্ণপাত করিবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী—একমাত্র আইন অমান্যের দ্বারাই আসন্ন অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে'। অতএব জাতীয় সংগ্রামকে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে প্রথম নির্দেশ প্রচার করা হইল -২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকে সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করার জন্য। ঐদিন প্রতিটি সভায় জনগণকে মহাত্মা কর্তৃক রচিত ও কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত একটি ইস্তাহার পাঠ এবং গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নে যে ইস্তাহারটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে উহা ছিল একাধারে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার।

> 'আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোনও জাতির ন্যায় বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবার এবং জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন সে সকল অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ভারতবাসীর আছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্ণমেন্ট জাতিকে এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাদের উপর নির্যাতন চালায় তাহা হইলে ইহাকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করিবার অধিকারও সে জাতির রহিয়াছে। ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কেবল যে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাই নয়, জনগণের শোষণের উপর ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে ভারতকে ধ্বংস করিয়াছে। অতএব, আমাদের বিশ্বাস, ভারতকে অবশ্যই বৃটিশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।
>
> 'ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক হইতে ধ্বংস করা হইয়াছে। আমাদের জাতির নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় উহা আমাদের আয়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন। আমাদের দৈনিক গড় আয় সাত পয়সা (দু' পেন্সের কম), এবং আমরা যে বিপুল পরিমাণ কর দিয়া থাকি তাহার শতকরা ২০ ভাগ আদায় হয় কৃষকদের নিকট হইতে

প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব হইতে, এবং শতকরা ৩ ভাগ লবণ কর হইতে যাহার ভার দরিদ্র-দিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'চরকার ন্যায় গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ধ্বংস করায় বছরে অন্ততঃ চারি মাস গ্রামবাসিগণকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়, এবং হস্তশিল্পের অভাবে তাঁহাদের দক্ষতাও হ্রাস পায়; এবং এইরূপে যে হস্তশিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হইয়াছে সেগুলির পরিকল্প হিসাবে অন্যান্য দেশগুলির ন্যায় আর কোনও ব্যবস্থাও করা হয় নাই।

'শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা এরূপ কৌশলের সাহায্যে করা হইয়াছে যে গ্রামবাসিগণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়াছে। আমাদের আমদানী পণ্যের বিরাট অংশই হইতেছে বৃটিশগণ কর্তৃক উৎপাদিত। বহির্বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপারে বৃটিশ পণ্যের প্রতি স্পষ্টতঃই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহাতে জনগণের বোঝা লাঘব ত হয়ই না বরং অত্যধিক অমিতব্যয়ী একটি শাসনব্যবস্থার পোষকতা করা হইয়া থাকে। এমন কি, যে বিনিময়-হার স্থির করা হইয়াছে তাহা আরও স্বেচ্ছাচারমূলক, যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

'রাজনৈতিক দিক হইতে, বৃটিশ শাসনে ভারতের মর্যাদা যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে এরূপ কখনও পায় নাই। কোনও শাসন সংস্কারের দ্বারাই জনগণ প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে নাই। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে বিদেশী প্রভুত্বের কাছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও অবাধ মেলামেশার অধিকারগুলি আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই. এবং আমাদের দেশবাসী-দিগের মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া বিদেশে নির্বাসনে কাটাইতেছেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না। প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হইয়াছে, এবং জনগণকে গ্রামের সামান্য চাকরি ও কেরানীগিরিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

'সাংস্কৃতিক দিক হইতে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে দেশীয় কৃষ্টির সহিত আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং যে শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হয় উহা আমাদিগকে দাসত্বের শৃঙ্খলকেই বরণ করিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে।

'আধ্যাত্মিক দিক হইতে, বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদিগকে হীনবীর্য করিয়াছে, এবং আমাদের মধ্যে প্রতিরোধশক্তিকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিবার সাংঘাতিক কাজে নিযুক্ত বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী আমাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, নিজদিগকে দেখাশুনা করিতে বা বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে কিংবা এমন কি চোর, ডাকাত ও দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণ হইতে আমাদের বাড়ীঘর ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

'যে শাসন আমাদের দেশে এই চতুর্বিধ বিপর্যয় ঘটাইয়াছে উহাকে আর মানিয়া চলা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা নয়। অতএব, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল যোগাযোগ রাখা হইয়াছে, যত দূর সম্ভব তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমরা নিজদিগকে প্রস্তুত করিব, এবং কর-বন্ধ সহ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের কোনও সন্দেহ নাই যে, প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমরা যদি কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়া করপ্রদান বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে এই বর্বর শাসনের অবসান ঘটিবেই। অতএব, এতদ্দ্বারা আমরা ভাব গম্ভীরভাবে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কর্তৃক সময়োচিত যে সকল নির্দেশ প্রচারিত হইয়া থাকে সেগুলি আমরা কাযে রূপদান করিব।'

দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ হইতে দেখা গেল যে, বিরাট সাফল্যের সহিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়াছে। সর্বত্র অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল এবং মহাত্মা বুঝিলেন যে, তিনি একটি সক্রিয় কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁহার মধ্যে। আইন অমান্য অভিযান সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আপোষের দরজা তিনি খোলা রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি একটা বাধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধনী সমর্থকদিগের মধ্যে কেহ কেহ—ভারতীয় পুঁজিপতিগণ—লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতে ভয় পাইয়া গিয়াছেন। সেজন্য কোনও এক প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষতঃ এই কারণে যে, 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইয়াছিল। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি তাঁহার **ইয়ং ইন্ডিয়া** পত্রিকায় এই বলিয়া বিবৃতি দিলেন যে, যাহা 'স্বাধীনতার মর্ম' উহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং ঐ কথার অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি এগারটি দফার উল্লেখ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ কার্যতঃ বর্জন করিয়া ইহার স্থলে ব্যবহার করিলেন অধিকতর নমনীয় ভাষা —'স্বাধীনতার মর্ম' কিংবা অন্য আর একটি ভাষা, যথা—'পূর্ণ স্বরাজ' যাহা বিশেষ করিয়া তিনিই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং নিজের মত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। যাঁহারা স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে এগারটি দফার নির্দেশ করিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিল এবং পরবর্তী কয়েক মাস দীর্ঘ আলোচনার পথ প্রস্তুত করিল। এগারটি দফা ছিল এইরূপ:

১। সামগ্রিকভাবে মাদক-দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ।

২। আনুপাতিক হার (পাউন্ড স্টার্লিং-এর সহিত টাকার) ১ শিঃ ৬ পেঃ হইতে ১ শিঃ ৪ পেঃ-তে হ্রাস।

৩। ভূমি রাজস্ব অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস এবং ইহাকে আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন করণ।

৪। লবণ-কর রদ।

৫। শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ হইতে সুরু করিয়া সামরিক ব্যয় হ্রাস।

৬। হ্রাসপ্রাপ্ত করের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের বেতন অর্ধেক বা তাহারও বেশী পরিমাণে হ্রাস।

৭। দেশী বস্ত্রশিল্পের প্রতি রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিদেশী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক ধার্যকরণ।

৮। উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন (ভারতীয় জাহাজগুলির জন্য ভারতের উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত রাখিয়া) প্রবর্তন।

৯। হত্যা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য সাধারণ বিচার, বিভাগীয় সালিসীর দ্বারা যাহারা দোষী সাব্যস্ত তাহারা ব্যতীত সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি; সকল রাজনৈতিক মামলার প্রত্যাহার; ১২৪ক ধারা (ভারতীয় দণ্ডবিধি), ১৮১৮-র রেগুলেশন ও ঐ জাতীয় আইনগুলির বাতিল-করণ; এবং ভারতীয় নির্বাসিতদিগের সকলকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান।

১০। সি. আই. ডি (ক্রিমিনাল ইন্‌ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)-এর বিলোপ-সাধন বা ইহাকে জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন।

১১। জনগণের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স্ প্রদান।

ফেব্রুয়ারীর সুরুতে পরিস্থিতি মহাত্মার পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছিল। স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর নিকট হইতে যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল উহা ছাড়াও, বিভিন্ন আইনসভার কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণ লাহোর কংগ্রেসের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন। অবশ্য মুসলমানদিগের এক বিরাট অংশ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া না দিবার জন্য তাঁহাদের স্বধর্মীদিগের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তথাপি, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যাঁহারা সংখ্যায় কোন ক্রমেই তুচ্ছ ছিলেন না, তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আসন্ন অভিযানে দৃঢ় সমর্থন জানাইল। যথেষ্ট আত্মানুসন্ধানের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা তাঁহার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিলেন। ইহার পর তিনি যে কয়েকটি কাজ করিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহার নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হিসাবে চিরকাল গণ্য হইবে এবং ঐগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্কটমুহূর্তে তিনি কিরূপ উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন। ১৯৩০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে **'ইয়ং ইন্ডিয়া'য়** তিনি লিখিলেন :

'এবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হইলে নীরব নিষ্ক্রিয় অহিংসা নয় বরং সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ধরনের অহিংসাকে কাজে লাগানো হইবে যাহাতে ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মুক্ত বা জীবিত না থাকেন......আমার নিজের সম্বন্ধে যতদূর বলিতে পারি,

আশ্রমবাসী (তাঁহার নিজের আশ্রম) ও যাঁহারা ইহার শৃঙ্খলাবিধি মানিয়া লইয়াছেন এবং কার্যপ্রণালীর মর্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লইয়াই শুধু আন্দোলন সুরু করা আমার অভিপ্রায়।' ১৯২২ সালের মত হিংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটিলে আইন অমান্য স্থগিত রাখার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মহাত্মা লিখিলেন ঃ 'হিংসাত্মক শক্তিগুলিকে সংযত রাখিবার জন্য যদিও ধারণাযোগ্য ও সম্ভাব্য সর্ব প্রকারের চেষ্টা করা হইবে, তথাপি এবার আইন অমান্য একবার সুরু হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মুক্ত কিংবা জীবিত থাকিবেন ততক্ষণ উহা বন্ধ করা যাইবে না এবং হইবে না।' চৌরিচৌরাতে জনতার হিংসা প্রদর্শনের পর ১৯২২ সালে বারদোলীতে পশ্চাদপসরণ করায় যাঁহারা তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলেন, শেষ বিবৃতিটি হইতে তাঁহারা দৃঢ় আশ্বাস লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মহাত্মা তাঁহারই মনোনীত আশ্রমবাসী ভক্তদের মধ্যে আটাত্তর জনকে সঙ্গে লইয়া লবণ আইন অমান্যের অভিপ্রায়ও ঘোষণা করিলেন। ১২ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত তিনি এক অভিযান সুরু করিবেন—সাগরাভিমুখে তাঁহার তীর্থযাত্রা—এবং সেখানে পেঁৗছিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। উহাই হইবে সমগ্র দেশের পক্ষে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত। এই বিশেষ আন্দোলনটি সুরু করার সিদ্ধান্ত তিনি করিয়াছিলেন এই কারণে যে, ইহা সমগ্র দেশ, এবং বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের মধ্যে সাড়া জাগাইবে। স্মরণাতীত কাল হইতে লোকে সমুদ্রবারি অথবা মৃত্তিকা হইতে লবণ তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের সে অধিকার বৃটিশ গভর্নমেন্ট কাড়িয়া লইয়াছেন। বর্তমানে যে লবণ আইন চালু করা হইয়াছে উহা দুই দিক হইতে অন্যায়। ইহার দ্বারা যে লবণ প্রকৃতির দান উহা ব্যবহার করিতে লোককে নিষেধ করা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ইহা আমদানী করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। উপরন্তু, লবণ-কর ধার্য করার ফলে লবণের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ক্রয় না করিলে চলে না। ২রা মার্চ তারিখে বড়লাটের নিকট এক পত্রে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি লিখিলেন ঃ

'যদি আপনি এই সকল অকল্যাণের কোনও প্রতিকার না করিতে পারেন এবং আমার পত্র আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে তাহা হইলে এই মাসের বারো তারিখে আশ্রমের সহকর্মীদের মধ্যে যাঁহাদের লওয়া সম্ভব তাঁহাদিগকে লইয়া লবণ আইনের বিধানগুলি অমান্য করিতে আমি অগ্রসর হইব। এই (লবণ) আইনকে আমি দরিদ্র ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সর্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়া মনে করি। যেহেতু মূলতঃ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের জন্যই স্বাধীনতা আন্দোলন, এই অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতেই ইঁহার সূচনা হইবে।

আশ্চর্য, আমরা এতদিন এই নির্মম এব ়িয়া (লবণ) ব্যবসাকে মানিয়া আসিয়াছি।'

ঐ পত্রটি ছিল একটি দীর্ঘ দলিল—উহাতেই মহাত্মা আইন অমান্যের পথ কেন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন তাহা বড়লাটের নিকট ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভীতি প্রদর্শন করা যে উহার অভিপ্রেত ছিল না বরং একজন আইন অমান্যকারীর পক্ষে এই সরল ও পবিত্র কর্তব্যটি যে অবশ্যপালনীয়—ইহা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া লিখিয়াছিলেন: 'আমার দেশবাসীর অনেকের ন্যায় আমি এই আশা একান্তভাবে পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে একটি সমাধান হইতে পারে। কিন্তু যখন আপনি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলেন যে, আপনি অথবা বৃটিশ মন্ত্রিসভা পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবেন, এরূপ কোনও আশ্বাস দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তখন গোল টেবিল বৈঠকে সম্ভবতঃ কোনও সমাধান হইবে না, যাহার জন্য ভারতের নেতাগণ জ্ঞাতসারে, এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অজ্ঞাতসারে নীরব ভাষায় আকুল আগ্রহ জানাইয়া আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পার্লামেন্টের সম্মতি লাভ করা যাইবে এরূপ প্রত্যাশার কোনও প্রশ্ন কখনও দেখা দেয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, পার্লামেন্টের মত পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাসে বৃটিশ মন্ত্রিসভা বিশেষ কোনও নীতি অনুসরণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন। দিল্লীর সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হওয়ায়, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত গুরুত্ব-পূর্ণ প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোনও উপায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও আমার ছিল না।' আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা সত্ত্বেও, আপোষের দ্বার উন্মুক্ত রাখার জন্য মহাত্মা আরও লিখিয়াছিলেন: 'কিন্তু যদি আপনার ঘোষণায় উল্লিখিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাটি ইহার স্বীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বাধীনতার প্রস্তাবটিতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। কারণ দায়িত্বশীল বৃটিশ কূটনীতিকগণ কর্তৃক ইহা কি স্বীকৃত হয় নাই যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা কার্যতঃ স্বাধীনতাই বুঝায়?'

বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর এই পত্রের—অথবা চরমপত্রের—একটি সংক্ষিপ্ত জবাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, আইন লঙ্ঘন করা শ্রীযুক্ত গান্ধীর অভিপ্রায়। সুতরাং, তাঁহার ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রাম ডাণ্ডী অভিমুখে তিনি তিন সপ্তাহব্যাপী অভিযান সুরু করিলেন; সেখানে লবণ আইন অমান্য সুরু করার কথা ছিল। সেই সময়ে অভিযানের পরিণাম সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সন্দেহ ছিল এবং তাঁহাকে গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলি বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিল

এবং কলিকাতার 'স্টেটসম্যান' এই মর্মে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিল যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ না করা পর্যন্ত মহাত্মা সমুদ্রের জল ফুটাইয়া যাইতে পারেন। এক শ্রেণীর কংগ্রেসীদের মধ্যেও এই সন্দেহের ভাব দেখা গিয়াছিল। তথাপি, ডান্ডী অভিযান ছিল একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যাহা নেপোলিয়নের এল্বা হইতে ফিরিবার সময় প্যারী অভিযান কিংবা মুসোলিনী যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি যে রোম অভিযান চালাইয়াছিলেন উহার সহিত একই সারিতে স্থান পাইবে। মহাত্মার সৌভাগ্য যে, ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি তাঁহার পক্ষে ভাল ভাল পত্রিকার আশাতীত সমর্থন পাইয়াছিলেন। ভারতে দিনের পর দিন অভিযানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই পদযাত্রায় তিনি যে সকল গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন ঐ সকল স্থানে জনগণকে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার দ্বারা সমগ্র দেশের মানসিক প্রস্তুতির সময়ও তিনি পাইয়াছিলেন। অপরপক্ষে, যদি তিনি আমেদাবাদ হইতে রেলে চড়িয়া পরদিনই দিল্লীতে পেঁৗছিতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে না সম্ভব হইত গুজরাটের অধিবাসীদিগকে জাগাইয়া তোলা, না তিনি সমগ্র জাতিকে উদ্দীপিত করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেন। তিনি যখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন তখন আশপাশের অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্রই যে কর-বন্ধ আন্দোলন সুরু হইবে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে আহবান জানাইয়া ব্যাপক প্রচার চালানো হইয়াছিল। প্রতি পদক্ষেপে তিনি সাদর ও আশাতীত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন এবং ফলে গভর্নমেন্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রথমে যেরূপ মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা আসন্ন অভিযান অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার হইবে।

৬ই এপ্রিল তারিখে সমুদ্রে পুণ্যস্নানের পর মহাত্মা তীরে পড়িয়া থাকা লবণ খন্ডগুলি দখল করিয়া আইন অমান্য সুরু করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়িয়া বে-আইনী লবণ উৎপাদন আরম্ভ হইল। যেখানে এরূপ কোনও আন্দোলনের পক্ষে প্রাকৃতিক বাধা ছিল সেখানে অন্যান্য আইন অমান্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা,—কলিকাতায় মেয়র স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত জনসভায় প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করিয়া রাজদ্রোহ আইন অমান্য সুরু করিলেন। ব্যাপকভাবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকারের বৃটিশ পণ্য বর্জনের আর একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। মদ্য ও মাদক দ্রব্যাদি বর্জনের জন্য তীব্র আন্দোলনও চলিল। এই বর্জন আন্দোলন চালু রাখিবার জন্য সারা ভারত-ব্যাপী কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকগণ পিকেটিং-এর আয়োজন করিয়াছিলেন। অভিযান সুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর মহাত্মা ভারতীয় নারীদিগের (ইয়ং ইন্ডিয়া—১০ই এপ্রিল, ১৯৩০)

প্রতি বিশেষ একটি আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন : 'এই পবিত্র সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য কোনও কোনও ভগ্নী যেরূপ অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন উহা আমার নিকট একটি শুভ লক্ষণ...........এই অহিংস সংগ্রামে তাঁহাদের অবদান হইবে পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। নারীদিগকে অবলা বলিলে মিথ্যা বলা হয়...........যদি শক্তি বলিতে নৈতিক শক্তিকে বুঝায় তাহা হইলে পুরুষ অপেক্ষা নারী যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।' উপরন্তু, মদ ও বিদেশী-বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং-এর ভার গ্রহণ করিবার জন্যও তিনি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। মদ ও মাদক দ্রব্যের নিষিদ্ধকরণের দ্বারা গভর্নমেন্টের রাজস্ব ২৫ কোটি টাকা (মোটামুটি হিসাবে ১৩ই টাকা =১ পাউন্ড) হ্রাস পাইবে—এবং, বৎসরে যে ৬০ কোটি টাকার মত বিদেশে চলিয়া যায় তাহা বন্ধ হইবে বিদেশী বস্ত্রের বর্জন হইতে। খাদির উৎপাদনে জোর দিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় চরকা কাটিবার জন্য নারীদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধও তিনি জানাইলেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন : 'অবশ্য কোনও কোনও ভগ্নী এরূপ বলিতে পারেন, মদ ও বিদেশী-বস্ত্রের বিরুদ্ধে পিকেটিং-এ কোনও উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ নাই। বেশ, যদি তাঁহারা সমস্ত অন্তর দিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন তাহা হইলে প্রভূত উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তাঁহারা ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন। এমন কি, আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বেই তাঁহারা কারারুদ্ধ হইতে পারেন। ইহাও অসম্ভব নয় যে, তাঁহাদিগকে অপমানিত, এমন কি দৈহিক দিক হইতে নিপীড়নও করা হইতে পারে। এই অপমান ও নির্যাতন ভোগ করাই হইবে তাঁহাদের গর্ব। যদি তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা হয় তাহা হইলে ইহার ফলেই অচিরে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হইবে।'

সারা দেশে এই আবেদন প্রচারিত হইল এবং যাদুর মত কাজ করিল। এমন কি সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও অভিজাত পরিবারের নারীদের হৃদয়েও ইহাতে সাড়া[১] জাগিয়াছিল। সর্বত্র হাজার হাজার নারী কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। আন্দোলনের এই প্রকাশে কেবল গভর্নমেন্টই নহেন, দেশবাসিগণও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মিস মেরী ক্যাম্বেল[২]—যিনি চল্লিশ বৎসর ভারতে কাজ করিয়াছেন—তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মচর্যের প্রচারকগণ এই অদ্ভুত ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত হইয়া যান। মিঃ এইচ. এন. ব্রেলস্‌ফোর্ড ও মিঃ জর্জ স্লোকম্বের ন্যায় বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ বলিতে পারিয়াছিলেন যে, আইন

[১] যথা—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত একজন গোঁড়া ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিবারের মেয়েরাও নির্ভয়ে বা নির্দ্বিধায় কারাবরণ করেন।

[২] ১৯৩১ সালের ২২শে জুন তারিখের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে দিল্লীতে নারী জাগরণ সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ আছে; একমাত্র সেখানেই ১,৬০০ নারী কারারুদ্ধ হন।

অমান্য আন্দোলনের দ্বারা আর কিছু না হইলেও ভারতীয় নারীজাতির মুক্তি সম্ভব হইয়া থাকিলেও ইহা সার্থক। নারীদিগের মধ্যে এরূপ শক্তি ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল যে, উহা পুরুষদিগকে অধিকতর কর্মপ্রয়াস ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আন্দোলন সুরু হওয়ার পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই গভর্নমেন্ট ইহাকে আঘাত হানিতে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। ২৭শে এপ্রিল তারিখে প্রেস অর্ডিন্যান্স্ নামে প্রথম জরুরী আইনটি ঘোষণা করা হইল যাহার ফলে পত্রিকাগুলি সরকারী কর্মচারীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল। প্রতিবাদ-স্বরূপ, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই প্রকাশ দীর্ঘকাল বন্ধ রহিল। কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পর আসিল অন্যান্য আইন। সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল এবং এরূপ একটি আইন জারী করা হইল যাহার দ্বারা ইহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়। এই সকল আইনের ফলে কংগ্রেসের পক্ষে আর প্রকাশ্যে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না এবং চাঁদা তোলা, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ইত্যাদির ন্যায় অনেক কাজই গোপনে চালাইতে হইয়াছিল। কিন্তু, এই সকল আইনের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যকলাপ বন্ধ না হইয়া আরও জোরদার হইল। যেহেতু সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠিত হইয়া চলিল। ঐ নিষেধাদেশ থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্র, ইস্তাহার, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলি ছাপাইয়া বিতরণ করিল। কোনও কোনও স্থানে, যেমন বোম্বাইয়ে রেডিওর সাহায্যে কংগ্রেসের প্রচার চালানো হইয়াছিল এবং কোথা হইতে ঐ বাণী প্রচার করা হইতেছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পুলিস অসমর্থ হয়।

এই অহিংস বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া গভর্নমেন্ট প্রথমেই গ্রেপ্তার চালাইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু উহাতে কোনও কাজ হইল না। সরকারী হিসাব[১] অনুসারে, ষাট হাজারেরও অধিক আইন অমান্যকারীকে জেলে পাঠানো হয়। অল্প সময়ের নোটিশে বিশেষ জেলের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল কিন্তু এইগুলি অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া যায়। উপরে বর্ণিত কার্যকলাপ—যাহা কমবেশী সারা ভারতেই দেখা গিয়াছিল—ছাড়াও কোনও কোনও প্রদেশে বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ চালানো হয়। যথা, মধ্যপ্রদেশে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি অংশে বন-জঙ্গল সম্বন্ধীয় আইন অমান্য সুরু করা হইল এবং লোকে ইচ্ছামত গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার কোনও কোনও

[১] সরকারী হিসাব কম করিয়া দেখানো হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লেখকের জানা আছে যে, চুরি, ভীতিপ্রদর্শন, দাঙ্গা ইত্যাদি সকল অভিযোগে বহু লোককে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, যদিও তাঁহারা ছিলেন পুরাপুরি সত্যাগ্রহী। আদালতের কাজে সত্যাগ্রহীরা যেহেতু কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই, এই সকল অভিযোগে, কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করা হয় নাই। নিছক রাজনৈতিক অপরাধের বিবরণী হইতেই তৈয়ারী করা হয় সরকারী হিসাব।

জেলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে কর ও ভূমিরাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যে খান আব্দুল গফুর খান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধীরূপে অধিকতর পরিচিত—তাঁহার প্রচেষ্টায় সেখানে কর-বন্ধ সহ ব্যাপক একটি গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন চলিয়াছিল। ঐ স্থানের অধিবাসীদের সামরিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অহিংস। সীমান্ত গান্ধী একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন যাঁহাদের পোষাক ছিল লাল; তাঁহাদিগকে 'খোদাইখিদমৎগার' বা 'ঈশ্বরের সেবক' বলা হইত। এই লাল-কোর্তা স্বেচ্ছাসেবকগণ ছিলেন গভর্নমেন্টের চক্ষুশূল, কেন না তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে যে জনগণের মধ্য হইতে পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনীগুলির কয়েকটি গঠন করা হইয়াছে তাঁহাদের আনুগত্য নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। উপরন্তু, সামরিক দিক হইতে সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্যও দেশের ঐ অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোনও ক্রমেই গভর্নমেন্ট স্বাগত জানাইতে পারেন নাই।

এই আন্দোলন যে গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে দমনের চেষ্টায় গভর্নমেন্ট একেবারে নির্মম ও পাশবিক হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপারে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী—উভয় দিক হইতেই রাজশক্তি যে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। ইহা বলা কঠিন, কোন্ প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতন ভোগ করিয়াছে কারণ প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী ছিল। বাঙলা দেশে মেদিনীপুর জেলাই সর্বাধিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছে এবং জনগণের নিগ্রহ হইতেই সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জন্ম হয় একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। যুক্তপ্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কর-বন্ধ আন্দোলন খুব তীব্র হইয়াছিল এবং সেখানেও ভীষণ অত্যাচার চলে। গুজরাটে কৃষকদিগের উপর অত্যাচার যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া প্রতিবেশী বরোদারাজ্যে চলিয়া গেলেন। মোটের উপর, সম্পূর্ণ অহিংস জনতার বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধিগণ যে সকল 'অবৈধ' ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল—নির্বিচার ও বর্বরভাবে শক্তি প্রয়োগ, নারীদের উপর আক্রমণ এবং যথেচ্ছ সম্পত্তিনাশ। সাধারণতঃ লোহা-বাঁধানো বা চামড়া-ঢাকা শক্ত লাঠির সাহায্যে সত্যাগ্রহী ও নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর আক্রমণ চালানো হইত যাহার ফলে লোকের মাথার খুলি অনায়াসেই[১] ফাটিয়া যাইতে

[১] অধিকাংশ প্রদেশে আহত সত্যাগ্রহীদের শুশ্রূষার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলিকে বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অ্যাম্বুলেন্স্ বাহিনী গঠন করিতে হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতালগুলি ছিল বোম্বাই শহরে—যেখানে আহত সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল ভারতের সমস্ত শহর অপেক্ষা বেশী।

পারিত; নারীদিগকেও এই আক্রমণ হইতে বাদ দেওয়া হইত না। অসহায় সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপরও[১] আক্রমণ চলিত। যেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পক্ষে ইহা যথেষ্ট ছিল না সেখানে কখনও কখনও গুলিচালনার আশ্রয় লওয়া হইত। অধিকাংশ প্রদেশে এরূপ গুলিচালনার ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা নারকীয় ঘটনা ঘটে ২৩শে এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী); সেখানে একদিনেই যত লোককে গুলি করিয়া হত্যা করা হয় তাহাদের সংখ্যা কয়েক শত হইয়া দাঁড়ায়। মোটামুটিভাবে ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—স্থানীয় কয়েক জন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর শান্তি-পূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছিল। ইহাতে কর্তৃপক্ষের মাথা বিগড়াইয়া গেল এবং তাঁহারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বর্ম-ঢাকা কিছু গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। জনতা তখন বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। পূর্ব হইতে সতর্ক না করিয়া দিয়াই সৈন্য ভর্তি বর্ম-ঢাকা গাড়ীগুলি পিছন দিক হইতে সবেগে জনতার উপর গিয়া পড়িল; ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন লোকের মৃত্যু হইল এবং বহু আহত হইলেন। এরূপ বলা হইয়া থাকে যে, তাহার পর জনতা ঐ গাড়ীগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা ঐস্থানে ছুটিয়া যায় এবং তাহাদিগকে গুলি ছুঁড়িতে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জনতা দৌড়াইয়া পালাইলেন না; তাঁহাদের মধ্যে শত শত লোক নির্বিচলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গুলির সম্মুখীন হইলেন। যখন এই সকল ঘটনা জানা গেল তখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি তদন্তের দাবী উঠিল যাহা গভর্নমেন্ট মানিয়া লইলেন না। তখন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে এই সকল বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটা কমিটি নিয়োগ করা হইল; শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল (যিনি ইতিমধ্যে আইনসভার অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন) ঐ কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটিকে সীমান্ত প্রদেশে যাইতে দেওয়া হয় নাই। কাজেই, ইহাকে সীমান্ত প্রদেশের খুব কাছাকাছি পাঞ্জাবের কোনও স্থানে মিলিত হইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়া

[১] ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এরূপ একটি আক্রমণ চালানো হয়। যাঁহাদের উপর আক্রমণ চালানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, বাংলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, লিবার্টির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও বহু সহ-বন্দী। লেখক ছিলেন সম্মুখের সারিতে; আক্রমণকালে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং এক ঘণ্টারও উপর তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে তদন্তের দাবী করা হইয়াছিল উহাতে গভর্নমেন্ট অস্বীকৃত হন। শেষে ডাঃ বি. সি. রায় ও লেঃ কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটকে লইয়া গভর্নমেন্ট একটি মেডিকেল বোর্ড নিয়োগ করেন যাঁহারা আহত বন্দীদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রচার করেন।

দেন। তথাপি, কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায় ইহা ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

পেশোয়ারের ঘটনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাহা ছিল একমাত্র আশার আলোক তাহা হইল নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি ছুঁড়িতে গাড়োয়ালী[১] সৈন্যবাহিনীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। তাহারা অস্বীকৃতি জানাইলে পর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় এবং সামরিক আদালতে হাজির করিয়া দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

যেখানে যেখানে অত্যাচার চলিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক স্থানীয় কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করিতে হইলে বিরাট আর একটি পুস্তক লেখা প্রয়োজন এবং ঐগুলি এই পুস্তকের বিষয়ান্তর্গতও হইবে না। যাহা হউক, ১৯৩০ সালের ৮ই মে তারিখে **ইয়ং ইন্ডিয়া**-তে বড়লাটকে লিখিত মহাত্মার যে দ্বিতীয় পত্রটি[২] প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা তিনি মে মাসের গোড়ার দিকে গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে লিখিয়াছিলেন, উহা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

'আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আইন অমান্যকারীদের সহিত গভর্নমেন্ট ভদ্রভাবে লড়িবেন। তাঁহাদের সহিত মোকাবিলা করিতে গিয়া সাধারণ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই যদি গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হইতেন তাহা হইলে আমার বলার কিছু থাকিত না। তাহা না করিয়া, পরিচিত নেতাদের প্রতি যখন কমবেশী আইনসম্মত রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হইয়াছে তখন সর্বসাধারণকে প্রায়শঃই বর্বরভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি অশোভনভাবেও আক্রমণ করা হইয়াছে। যদি এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইত তাহা হইলে এগুলিকে উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু বাঙ্গলা, বিহার, উৎকল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও বোম্বাই হইতে গুজরাটের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করিয়া আমার নিকট বহু সংবাদ আসিয়াছে, যাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমার আছে। করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজে যে গুলি চালানো হইয়াছে তাহা বিনা প্ররোচনায় চালানো হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে এবং উহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। গভর্নমেন্টের নিকট যে লবণের কোনও মূল্য নাই অথচ স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিকট যাহা মূল্যবান উহা যাহাতে তাঁহারা দিয়া দিতে বাধ্য হন সেজন্য তাঁহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিষ্পেষিত করা হইয়াছে। মথুরায় একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট

[১] হিমালয় সন্নিহিত যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল হইতে গাড়োয়ালীদিগকে সংগ্রহ করা হয়। নেপালের গুর্খা, পাঞ্জাবের শিখ ও সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের সহিত তাহাদের লইয়াও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বাহিনী গঠন করা হইয়া থাকে।

[২] এই পত্রটি প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল কিনা একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়।

দশ বছরের একটি বালকের নিকট হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে। প্রকাশ, এরূপ বে-আইনীভাবে অধিকৃত পতাকাটি ফিরাইয়া দিবার জন্য জনতা দাবী জানাইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। কাজটি যে খুবই অন্যায় হইয়াছে, পতাকাটি পরে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলায় লবণের ব্যাপারে কয়েকটি মাত্র অভিযোগ ও আক্রমণ হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিকট হইতে পতাকা ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা চিন্তাও করা যায় না। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ধানক্ষেত পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বলপূর্বক খাদ্যবস্তু কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গুজরাটে একটি শাকসব্জীর বাজারে হানা দেওয়া হয় কেন না বিক্রেতাগণ ঐ সকল শাকসব্জী সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন না। যে জনতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে প্রতিশোধপরায়ণ না হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে। অথচ, এখন মাত্র সংগ্রামের পঞ্চম সপ্তাহ!'

ধর্ষণায় লবণের ডিপোতে যে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণ অহিংস অভিযান চালাইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি পুলিস কিরূপ ব্যবহার করিতেছে উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর একজন ইংরাজ শিষ্যা কুমারী ম্যাডেলিন স্লেড ৬ই জুন গুজরাটের বুলসর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের **ইয়ং ইন্ডিয়ার** ১২ই জুন তারিখের সংখ্যায় তিনি তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের শরীরে তিনি নিম্নরূপ আঘাতের প্রমাণগুলি দেখিয়াছেন :

১। মাথায়, বুকে, পেটে ও শরীরের গ্রন্থিসমূহে লাঠির[১] দ্বারা প্রহার।
২। গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পেটের কাছে লাঠি দিয়া খোঁচা মারা।
৩। প্রহারের পূর্বে লোকদিগকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া ফেলা।
৪। পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গুহ্যদ্বারে লাঠির সাহায্যে খোঁচা মারা।
৫। যতক্ষণ না কোনও লোক অচৈতন্য হইয়া পড়েন ততক্ষণ অণ্ডকোষ চাপিয়া ধরিয়া পীড়ন করা।
৬। আহত লোকদিগকে মারিতে মারিতে হাত-পা ধরিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

---
[১] লাঠির অর্থ লোহা-বাঁধানো ভারী ছড়ি।

৭। আহত লোকদিগকে কাঁটাঝোপে অথবা লবণ জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া।

৮। মাটিতে শায়িত কিংবা উপবিষ্ট লোকদের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দেওয়া।

৯। শরীরে, কখনও কখনও অজ্ঞান অবস্থাতেও, আলপিন ও কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া।

১০। অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার পরে প্রহার, এবং সত্যাগ্রহীদের সর্বাধিক পবিত্র বিশ্বাসগুলিকে যথাসম্ভব আঘাত দেওয়ার জন্য গালাগালি ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা ছাড়াও আরও বহু জঘন্য কাজ যেগুলির আর বর্ণনা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

এবার অন্যান্য ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৩০ সালের এপ্রিল ছিল চাঞ্চল্যকর ঘটনা ও উত্তেজনাপূর্ণ একটি মাস। প্রতিদিনই মনে হইত নূতন কোনও ঘটনা ঘটিবে এবং দেশের কোনও অংশই ইহা হইতে মুক্ত ছিল না। কংগ্রেসী সদস্যগণ ভারতীয় আইন সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেও সভা চুপ করিয়া ছিল না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আইনসভায় স্বতন্ত্র দলকে পরিচালনা করিতেছিলেন; তিনি বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে, গভর্নমেন্ট যেভাবে তুলা শুল্ক আইনের ব্যাপারে রাজকীয় পক্ষপাতের নীতি জোর করিয়া আইন সভার উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন উহার প্রতিবাদে আইন সভা হইতে তিনি তাঁহার অনুগামীদের লইয়া বাহির হইয়া আসেন। দুই দিন পরে দলের অন্যান্য কিছু সদস্যের সঙ্গে একত্রে আইন সভা হইতে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার পর আইন সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেল পদত্যাগ করেন। বড়লাটকে তিনি দুইটি পত্রও লেখেন যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস দল ও পণ্ডিত মালব্যের স্বতন্ত্র দলের পদত্যাগের পর আইন সভা ইহার প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার স্থান জাতির পার্শ্বে। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গভর্নমেন্টের দিক হইতে নীতির যে পরিবর্তন হইয়াছিল উহার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

এপ্রিলে দেশের পূর্বতম প্রান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটে। উহা হইল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে স্থানীয় একটি বিপ্লবী দলের কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন। তাঁহারা গুলি করিয়া কর্তব্যরত সান্ত্রীদিগকে হত্যা করেন, অস্ত্রাগার ভবনটি দখল করিয়া লন, এবং অস্ত্রাদি যথাসম্ভব লইয়া বাকী সব নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাহার পর পাহাড়ের দিকে সরিয়া গিয়া কয়েক দিন

ধরিয়া গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যান। শেষ পর্যন্ত হারিয়া যান তাঁহারা; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃত্যু হয় এবং বাকী সকলে তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য পালাইয়া যাইতে বাধ্য হন। এই দলের যে সকল সদস্য মুক্ত ছিলেন তাঁহারা দীর্ঘ দিন[১] ধরিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যান। প্রায় এই সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চাঞ্চল্য দেখা যায় আফ্রিদি উপজাতিদের মধ্যে এবং তাহারা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকে।

মে মাসের গোড়ার দিকে মহাত্মা বড়লাটের নিকট তাঁহার দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন (যাহার কিছু অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে), যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :

> প্রিয় বন্ধু,
>
> ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমার সঙ্গীদিগকে লইয়া সেখানে গিয়া পেঁছানো......এবং লবণ উৎপাদনের অধিকার দাবী করাই আমার অভিপ্রায়......যাহাকে কৌতুকচ্ছলে ও অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া "অভিযান" বলা হইয়াছে. তিনটি উপায়ে ইহাকে বন্ধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব :
>
> ১। লবণ কর তুলিয়া দিয়া।
>
> ২। আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করিয়া, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক গ্রেপ্তার বরণ করিতে আগাইয়া আসেন, যাহা আমি আশা করি তাঁহারা করিবেন।
>
> ৩। গুন্ডাবাজি (অর্থাৎ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ) চালাইয়া, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক, একজনের মাথা ফাটাইয়া দিলে, মাথা পাতিয়া দিতে আগাইয়া আসেন যাহা আমি আশা করি তাঁহারা করিবেন।
>
> ইয়ং ইন্ডিয়া, ৮ই মে. ১৯৩০।

কিন্তু মহাত্মা তাঁহার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ১৯৩০ সালের ৫ই মে তারিখে আইনের রক্ষকগণ কর্তৃক ধৃত হন এবং ১৮২৭ সালের ২৫নং বোম্বাই বিধান নামে পুরানো একটি বিধানানুসারে বিনা বিচারে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

---

[১] অভিযানের পর যুবকদের প্রথম দলটিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থে চালান দেওয়া হয় যাহা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলারূপে পরিচিত; এবং দীর্ঘদিন বিচার চলিবার পর তাঁহাদের অধিকাংশেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তাঁহাদিগকে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দলের নেতা সূর্যকুমার সেন অনেক দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। ১৯৩০ হইতে চট্টগ্রামে এক প্রকার সামরিক আইনই চলিয়া আসিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সারা ভারতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু একটি শহর অর্থাৎ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরে ছাড়া আর কোথাও হিংসার প্রকাশ দেখা যায় নাই। ঐ শহরে বহু কলকারখানার শ্রমিকের বাস, তাঁহারা বিদ্রোহ করিয়া স্থানীয় পুলিসকে পরাভূত করেন। শহরটি তাঁহারা দখল করিয়া লন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শহরটিকে কিছুকাল তাঁহারা দখলে রাখিয়াছিলেন কিন্তু বোম্বাই হইতে সৈন্যবাহিনী ছুটিয়া যায় এবং সেখানে পুনরায় বৃটিশ রাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর সামরিক আইন জারী করার ফলে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব দেখা দেয়। এই সামরিক শাসনকালে জনগণের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও অবমাননাকর ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হয়। যথা,—লোককে প্রকাশ্যে গান্ধী টুপী[১] পরিতে দেওয়া হইত না, যেখানেই চোখে পড়িত জাতীয় পতাকাকে টানিয়া নামাইয়া দেওয়া হইত ইত্যাদি। হাঙ্গামায় প্রধান অংশগ্রহণকারী বলিয়া যাঁহাদিগকে সন্দেহ করা হইত তাঁহাদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইত। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ফাঁসি হইয়াছে এবং আর সকলকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

যখন এই সকল উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটিতেছিল এবং স্বাধীনতা ভিন্ন জনমানসে আর কোনও চিন্তা ছিল না তখন গভর্নমেন্টের ১৯২৭ সালের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা হইতেছিল। সাইমন কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল প্রাদেশিক কমিটি ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ১৯২৯ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে সাইমন কমিশনের যে সহায়ক কমিটির উপর ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছিল, ইহার রিপোর্টও প্রচারিত হয় ১৯২৯ সালের অক্টোবরে। শুধু সাইমন কমিশনের রিপোর্টটিই চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, সম্ভবত ১৯২৯ সালের জুনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া। যাহাই হউক, ১৯৩০ সালের ৭ই জুন তারিখে কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হইল। ইহার সুপারিশগুলি এমনই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে সকল প্রান্ত হইতেই তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। এমন কি, ভারতীয় উদারপন্থিগণও দাবী জানাইলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে সাইমনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া কোনও আলোচনা করা চলিবে না। এবং যেহেতু জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় আইন সভা রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া দেয়—ঐ দাবীতে সম্মত হওয়া ভিন্ন গভর্নমেন্টের গত্যন্তর রহিল না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের

[১] খাদির তৈয়ারী সাদা টুপীকে গান্ধী টুপী বলা হয়। সাধারণতঃ কংগ্রেস দলের সদস্যগণ ঐ টুপী পরিয়া থাকেন।

মীমাংসা যখন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল সেই সময়ে ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটিল একজন উৎসাহী বৃটিশ সাংবাদিকের—যিনি তাঁহার বুদ্ধি খাটাইতে সচেষ্ট হইলেন। ডেইলী হেরাল্ডের প্রতিনিধি মিঃ জর্জ স্লোকম্বে কৌশলপূর্ণ উপায়ে ১৯৩০ সালের ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে পুণাতে যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি লাভে সমর্থ হইলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কি কি শর্তে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে সুনিশ্চিত হওয়া। মহাত্মা বলিলেন যে, 'স্বাধীনতার মর্ম' সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না মিলিলে আন্দোলন বন্ধ হইতে পারে না। আইন অমান্য বন্ধ করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্বে চারটি দফার তিনি উল্লেখ করিলেন :

১। ভারতকে স্বাধীনতার সারমর্ম দিয়া শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিবার শর্তগুলি স্থিরকরণ।
২। লবণ কর রদ, মদ ও আফিং নিষিদ্ধকরণ ও বিদেশী বস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার দাবী পূরণ।
৩। আইন অমান্য আন্দোলন তুলিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান।
৪। বড়লাটকে লিখিত মহাত্মার পত্রে আর যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলি ভবিষ্যতে আলোচনার সুযোগ দান।

২০শে জুন তারিখে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে মিঃ স্লোকম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিতজী উহাই সমর্থন করিলেন। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তি খাড়া করিয়া ২৫শে জুন তারিখে একটা বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করিলেন মিঃ স্লোকম্বে এবং এই বিবৃতিটি পণ্ডিতজীর অনুমোদন লাভ করিল। বিবৃতিটি ছিল এইরূপ :

'যদিও বৃটিশ ও ভারতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে, গোল টেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে সমস্ত সুপারিশ করা হইতে পারে সেগুলি কিংবা এই সমস্ত সুপারিশের প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের যে মনোভাব হইতে পারে তাহা পূর্বাহ্ণে অনুমান করা কোনমতেই সম্ভব নয় তথাপি তাঁহারা বেসরকারীভাবে এই আশ্বাস দিতে ইচ্ছুক থাকিবেন যে, ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের দাবী তাঁহারা সমর্থন করিবেন, যাহা ভারতের বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত তাহার

দীর্ঘকালের সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও হস্তান্তরের শর্তাবলীর উপর এবং গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তের নির্ভরশীল থাকিবে; পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে এই মর্মে একটি আশ্বাস—কিংবা দায়িত্বশীল কোনও তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইঙ্গিত শ্রীযুক্ত গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট পেঁছাইয়া দিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইবেন। যদি এরূপ কোন আশ্বাস প্রদত্ত ও গৃহীত হয় তাহা হইলে সাধারণভাবে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে, যাহার ফলে যুগপৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গভর্নমেন্টের বর্তমান দমনমূলক নীতির অবসান এবং রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দানের একটি উদার নীতি গ্রহণ করা যাইবে, এবং কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রচিত শর্তাবলীতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা।'

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকরকে শান্তির কার্যে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ স্লোকম্বে এই বিবৃতিটি তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা দুজনেই উৎসাহের সহিত বিষয়টির ভার লন এবং ঐ উদ্দেশ্যে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাতের অনুমতিও তাঁহারা পান। ২৩শে ও ২৪শে জুলাই যারবেদা জেলে মহাত্মার সহিত তাঁহারা দেখা করেন এবং তাঁহার স্মারকলিপি লইয়া ২৮শে জুলাই তারিখে পণ্ডিতদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হন এলাহাবাদের নিকটে নৈনি জেলে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পণ্ডিতজীরা বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোনও পাকা কথা দিতে পারেন না। নেহরুদের স্মারকলিপিসহ শ্রীযুক্ত জয়াকর পুনরায় মহাত্মার সহিত ৩১শে জুলাই তারিখে দেখা করেন। তখন পণ্ডিতজীদের নৈনি জেল হইতে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। আগস্ট মাসে ১৩, ১৪, ১৫ই তারিখে যারবেদা জেলে এই আলোচনা চলে যাহাতে উপস্থিত ছিলেন ঐ দুজন আপোষকারী, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এই মর্মে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয় যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত আশ্বাস না দিলে তাঁহাদের কিংবা কংগ্রেসের নিকট কোনও সমাধানই গ্রহণযোগ্য হইবে না :

১। স্বেচ্ছায় ভারতের সাম্রাজ্যের বাহির হইয়া আসার অধিকার।

২। জনগণের প্রতিনিধিমূলক একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের অধিকার দান যাহার অধিকারে দেশরক্ষা ও অর্থদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।
৩। তথাকথিত সরকারী ঋণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত বসাইবার ভারতের অধিকার।

এই বিবৃতির কথা বড়লাটকে যথারীতি জানাইয়া দেওয়া হইল এবং ১৯৩০ সালের ২৮শে আগস্ট দুইজন আপোষকারীর নিকট এই মর্মে একটি জবাব লর্ড আরুইন পাঠাইলেন যে, ১৫ই আগস্টের যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে কোনও আলোচনা চালানো সম্ভব নয় বলিয়া তিনি মনে করেন। এইরূপে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হইল। আপোষকারিগণ নৈনি ও যারবেদা জেলে নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আরও চেষ্টা চালাইলেন কিন্তু নেতৃবৃন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে দুস্তর একটি ব্যবধান রহিয়াছে।

আলাপ আলোচনা একেবারে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অল্প কালের মধ্যেই গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ৮ই সেপ্টেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু জেল হইতে অকস্মাৎ মুক্তি পান। ইহার পর পাঁচ মাস মাত্র তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিদারুণ ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও সারা দেশে আন্দোলনকে জোরদার করিবার চেষ্টায় তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ সময় ও শক্তি ব্যয় করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে বাঙ্গলায় বিরোধের মীমাংসার জন্যও তিনি অনেকটা সময় দেন। স্বর্গত শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তের দল কর্তৃক বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটির (যাহার সভাপতি ছিলেন লেখক) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছিল উহার তদন্ত করিবার জন্য তিনি লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসেন। পরোল্লিখিতদের অনুকূলেই তিনি তাঁহার রায় দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রস্থানের পর আবার মতবিরোধ দেখা দিল যাহার ফলে কলিকাতার পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের দুইটি দলই প্রার্থীদের দুইটি পৃথক তালিকা পেশ করিল। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইলে বাঙ্গলায় ঐ আন্দোলন চালাইবার জন্য জন্ম হইল দুইটি কমিটির। কয়েক মাস পরে যখন কলিকাতার মেয়র নির্বাচনের সময় আসিল তখন একটি দল বিদায়ী মেয়র স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে দাঁড় করাইল, এবং অপর দলটির পক্ষ হইতে দাঁড় করানো হইল লেখককে—এবং আমারই জয় হইল। এই সকল বিরোধের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা হউক, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রভাবে এই দুইটি আইন অমান্য কমিটিকে এক করা এবং অন্যান্য বিরোধগুলিরও কোনও রকমের একটি মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল—

ফলে ডিসেম্বরে যখন তিনি বাঙলাদেশ হইতে চলিয়া গেলেন তখন কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি অংশতঃ ফিরিয়া আসিয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাপারগুলি যখন ঘটিতেছিল তখন আমলাতান্ত্রিকগণ তাঁহাদের নিজেদের পরিকল্পনা মত কাজ করিয়া চলিয়াছিলেন। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল এবং গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার সূচনা হিসাবে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের পত্র লন্ডনে পাঠাইলেন। কমিশন কর্তৃক যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির কয়েকটি ছিল এইরূপ :

১। যতদূর সম্ভব নূতন শাসনতন্ত্রের মধ্যেই ইহার স্বীয় বিকাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

২। ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে।

৩। ব্রহ্মদেশকে নূতন শাসনতন্ত্র হইতে বাদ দিতে হইবে।

৪। প্রদেশগুলিতে আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় দপ্তর সহ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন থাকিবে—কিন্তু প্রশাসনিক দিকে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদির ন্যায় কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরকে নাকচ করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে।

৫। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ অফিসারদের উপস্থিতি বহু বৎসর প্রয়োজন হইবে। প্রধান সেনাপতি বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য হইবেন না এবং আইন সভায় যোগদান করিবেন না।

৬। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে বাড়াইতে হইবে।

৭। কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নতর সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভারূপে অভিহিত হইবে। ইহাকে বাড়াইতে হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ-গুলি কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হইবে। উচ্চতর সভা—রাজ্যসভা, বর্তমানে যেরূপ আছে সেরূপই থাকিবে।

৮। প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে বিনা হস্তক্ষেপেই যাহাতে প্রয়োজনানুরূপ আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় তজ্জন্য প্রাদেশিক তহবিল গঠন করিতে হইবে।

৯। গভর্নর-জেনারেল তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যাদিগকে মনোনীত ও নিয়োগ করিবেন। কার্যতঃ এবং সক্রিয়ভাবে তিনিই হইবেন গভর্ন-মেন্টের প্রধান এবং কোনও কোনও ব্যাপারে তাঁহাকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হইবে। (কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রবর্তনের সুপারিশ কমিশন করেন নাই।)

১০। প্রশাসনিক দিক হইতে হাইকোর্টসমূহ ভারত গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।
১১। ভারত সচিবের মন্ত্রণা-সভার কাজকর্ম ও সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে।

ভারত গভর্নমেন্ট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন উহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলির কয়েকটি হইল এইরূপ :

১। বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি: প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আর্থিক বাধ্যবাধকতা, আর্থিক স্থিরতা, সংখ্যালঘুদের ও ভারত সচিবের পক্ষ হইতে যে সমস্ত চাকুরী দেওয়া হইবে ঐগুলি করার অধিকার-রক্ষা, অর্থনীতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে অন্যায় বৈষম্য দূরীকরণ।
২। দ্বৈতশাসনের বিলোপ ও প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট (আইন ও শৃঙখলা বিভাগ সহ) চালু করার যে প্রস্তাব স্ট্যাটিউটরি কমিশন করিয়াছিল উহা অনুমোদিত হইয়াছিল।
৩। পদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা গভর্নরকে দিতে হইবে।
৪। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে আইন সভা হইবে একটি মাত্র কক্ষবিশিষ্ট। বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় দুইটি কক্ষ থাকিবে।
৫। ব্রহ্মদেশকে পৃথক করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল।
৬। গভর্নর-জেনারেল নিজে তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য-দিগকে নিয়োগ করিবেন। তাঁহার মন্ত্রিসভা হইবে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ধরনের এবং আইন সভার নিকট দায়ী থাকিবে না—উহাতে আইন সভার কয়েক জন নির্বাচিত সদস্য থাকিবেন যাহার ফলে ঐ সভার কিছু সমর্থন লাভ করা যাইবে।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে লন্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসিল। ইহাতে ছিলেন ঊননব্বই জন সদস্য—বৃটিশ দলগুলির পক্ষ হইতে ষোল, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির ষোল এবং সাতান্ন জন বৃটিশ ভারত হইতে। কংগ্রেস দলের কোনও প্রতিনিধি অবশ্য ছিলেন না। সম্মেলনের প্রাথমিক বৈঠকগুলির পর,

সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য কয়েকটি কমিটি নিয়োগ করা হইল। লর্ড স্যাংকীকে সভাপতি করিয়া সম্মিলিত আকারের একটি কমিটি, স্যার উইলিয়াম জোউইটকে সভাপতি করিয়া ভোটাধিকার ও চাকুরী কমিটি, আর্ল রাসেলের সভাপতিত্বে বর্মা কমিটি, মিঃ জে. এইচ. টমাসের সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা কমিটি, মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে সংখ্যালঘু কমিটি ইত্যাদি গঠন করা হইয়াছিল। সম্মেলনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদিগকে আমন্ত্রণ করার বিষয়টি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আনার জন্য সুরুতেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত উহার পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা স্যার জন সাইমনের পত্রই ছিল ঐ সম্বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ। সাইমন কমিশন আরও জানাইয়াছিল যে, ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র হইবে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। একমাত্র যে প্রশ্নটির কোনও মীমাংসা হয় নাই উহা হইল,—বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া কবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইবে। এমতাবস্থায়, ১৭ই নভেম্বর গোল-টেবিল বৈঠকের একটি অধিবেশনে যখন মহামান্য বিকানীরের মহারাজা এরূপ একটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাগত জানাইলেন তখন বিস্ময়ের কিছু ছিল না। গোল-টেবিল বৈঠক বসার কয়েক মাস পূর্বেই সমগ্র বিষয়টি লইয়া কথাবার্তা ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি ছিল বৃটিশ গভর্নমেন্টের সর্বাপেক্ষা কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির অন্যতম, এবং দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্নার মধ্যে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথমেই সন্দেহের উদ্রেক হইলেও স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকরের মত প্রবীণ রাজনীতিবিদ্গণ সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মতলব বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাদের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে রক্ষাকবচগুলির কথাই কেবল উল্লেখ করিয়াছিলেন —অর্থাৎ, মহামান্য সরকার বাহাদুর ও বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে যে যে বিষয়গুলি থাকিবে। কিন্তু ভারতীয় আইনসভার অধিকারে যে যে বিষয় থাকিবে সেগুলির কি হইবে? বৃটিশেরা স্বার্থে ঐ সভায় এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান রাখিতে চাহিয়াছিল, বৃটিশ ভারতের চরমপন্থী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য যাহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। এবং দেশীয় নৃপতিগণ যাহাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে ভিতরে ঢুকানো ছাড়া আর কি উত্তম উপায় আছে? ইতিপূর্বেই ২য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, মহামান্য প্রিন্স্ অব ওয়েলসের ভারত

ভ্রমণের পর ১৯২২ সাল হইতেই প্রথমে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে এই মিলন সুরু হইয়াছিল। বৃটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হওয়ায় সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য দেশীয় রাজাদের দিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট দৃষ্টি দেন। রাজন্যবর্গের দিক হইতেও বলা যায়, তাঁহারাও তাঁহাদের রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখীন হন যাহাকে বৃটিশ ভারতের অধিবাসিগণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং ঐ গণআন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাহায্য তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট ভারতীয় আইনসভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য আইন উপস্থাপিত করেন, এবং আইনসভা যখন ইহাকে নাকচ করিয়া দেয় তখন বড়লাটের সুপারিশবলে ইহা আইনে পরিণত হয়। এই মৈত্রীরই চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের মধ্যে—ভারতে গণজাগরণকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য যাহা ছিল বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি হীন যোগসাজস।

গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের মোট ফল যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা হইল,—রক্ষাকবচ ও যুক্তরাষ্ট্র—ভারতকে দুইটি তিক্ত বটিকার প্রস্তাব দেওয়া। এই বটিকাগুলি যাহাতে গলাধঃকরণযোগ্য হয় সেজন্য এগুলিতে 'দায়িত্ব'-রূপ চিনির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে ঘোষণা করিলেন যে, রক্ষাকবচ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠন করা হইবে এবং ঐগুলি মানিয়া লওয়ার পর প্রকৃত 'দায়িত্বের' আর কি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তাঁহারা তলাইয়া দেখার জন্য কোনও মতেই বিরত হইবেন না তখন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণ খুবই খুশী হইলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে যে সকল জাতীয়তাবাদবিরোধী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যখন ঘোষণা করিলেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সন্তোষজনক একটি মীমাংসা হইলেই তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগুলি সহ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গোল-টেবিল বৈঠক স্থগিত হইয়া গেল। উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণ লন্ডনে তাঁহাদের নিজেদের কার্যে এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে উৎফুল্ল দেখাইল। সাধারণ মানুষের চক্ষে, সমুদ্রপার হইতে একমাত্র যাহা তাঁহারা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইল 'বৈঠকের প্রতি জনমতের যে অংশগুলি উদাসীন ছিল তাহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ' সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস।

১১

গান্ধী-আরুইন চুক্তি ও তাহার পর (১৯৩১)

১৯৩০ সালের শেষ এবং ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে গভর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বুঝাপড়ার পক্ষে আবহাওয়া পুনরায় অনুকূল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এবং ইন্ডিয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনুপস্থিতির দ্বারাই গোল-টেবিল বৈঠকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় দলটি যখন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে নিরত তখন এই সকল অখ্যাত ও স্ব-নিযুক্ত নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের অবাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খুব বেশী কিছু দাবী করা না হইলেই তাঁহাদের সঙ্গে একটা আপোষ করার সংকল্প শ্রমিক দলের রাজনীতিবিদ্‌গণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ভারতের বড়লাট ও গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড আরুইন এবং একথা বুঝিবার মত যথেষ্ট দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল যে, গভর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন বুঝাপড়ায় পেঁাছাইতে হয় তাহা হইলে পরোক্ত দলের নেতা মহাত্মার সহিতই ইহা করা বাঞ্ছনীয়; কারণ বিচারবোধসম্পন্ন বৃটিশদের মতে, 'ভারতে[১] ইংরাজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।' তৃতীয় কারণটি ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জরুরী। ভারতের ঐ পরিস্থিতিতে তখন যদি কর্ণধাররূপে একজন দুর্দম প্রকৃতির বড়লাট থাকিতেন তাহা হইলে হোয়াইট হলের মনোভাব যত সহানুভূতিশীলই হউক না কেন, কংগ্রেসের সহিত কোনও বুঝাপড়া করাই সম্ভব হইত না।

কিন্তু কংগ্রেসের সহিত বুঝাপড়ায় কেন এত রাজী ছিলেন লর্ড আরুইন? সাধারণ বৃটিশ রাজনীতিকদের অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী যে উদার ছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক একটি ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল, অন্যদের মধ্যে যাহার খুব বেশী অভাবই ছিল একটি বৈশিষ্ট্য।

ভূতপূর্ব সদস্য মিস্ এলেন উইলকিনসন ইন্ডিয়া লীগের প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসাবে ১৯৩২ সালে তাঁহার ভারত ভ্রমণের পর এই অভিমতটিই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

স্বর্গতঃ মৌলানা মহম্মদ আলি একবার তাঁহাকে 'ঐ দীর্ঘকায় ও শীর্ণ খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী'-রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি খৃস্টান। তথাপি, ভারতে গুরুতর ঘটনাগুলি না ঘটিলে, কি এ দেশে 'সুদৃঢ় প্রশাসনকে' কি ইংলন্ডে মিঃ বল্ডউইন ও রক্ষণশীল নেতাদের স্বপক্ষে লাভ করিতে তিনি কখনও সমর্থ হইতেন না। বোম্বাই ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র যাহা কিনা ভারতের প্রবেশদ্বার। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙলার কোনও কোনও অংশে কর-বন্ধ আন্দোলন খুবই তীব্র হইয়াছিল। সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ পণ্য বর্জন কার্যকর করা হইয়াছিল এবং প্রতিটি প্রদেশে কোনও না কোনওভাবে আইন অমান্য চলিতেছিল। বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ একটি ভীষণ আতঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও অনস্বীকার্য যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতিও ছিল উদ্বেগজনক—এবং ঐ প্রদেশের পরিস্থিতি সীমান্তবর্তী সেই সব উপজাতিদের মনোভাবকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিতেছিল, ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সাধারণতঃ যাহারা একেবারে উদাসীন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উপজাতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, তাঁহারা যদি ঐ নগ্ন ফকির (অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী) ও খান আব্দুল গফুর খানকে (সীমান্ত প্রদেশের নেতা) ছাড়িয়া দেন এবং ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লন তাহা হইলেই তাঁহাদের সহিত তাহারা আপোষ করিবে। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা সিংহাসন ত্যাগ করার পর গ্রেট বৃটেনের প্রতি অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন একটি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অবস্থা সহজ হইয়া আসিলেও ১৯১৯ সালে আফগান রাজা কিরূপে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুবিধামত একটি চুক্তি করাইয়া লইতে সফল হইয়াছিলেন উহা গভর্নমেন্ট ভুলিয়া যান নাই। সেজন্য ভারতের ঘটনাবলীর প্রতি সীমান্তের উপজাতিদের মনোভাবে তাঁহারা অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন।

গোল-টেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যেদিন তাঁহার সমাপ্তি ভাষণ দিলেন, ঐদিন ভারতীয় আইনসভায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্যে বড়লাট আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনের এক সপ্তাহের মধ্যেই গোল-টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি বিবেচনা করিয়া দেখার একটি সুযোগ দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যাদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইল। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগুলি সহ দায়িত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিবার পর এই কথাগুলি বলিয়া তাঁহার ভাষণ শেষ করিয়াছিলেন : 'সর্বশেষে আমি এই আশা ও বিশ্বাস এবং প্রার্থনা করি যে, বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হইলে এখন ভারতের একমাত্র যে

অভাব আছে, আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সে উহার অধিকারী হইবে—এবং উহার জন্য যাহা এখন তাহার নাই যথা দায়িত্ব ও ভাবনা, দায় ও অসুবিধা এবং উপরন্তু দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের গৌরব ও সম্মান লাভ করিবে।' ভারতের যে উদারপন্থী নেতাগণ ভারতাভিমুখে রওনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সহিত আলোচনা না করিয়াই গভর্নমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ জানাইয়া এক তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই আশংকা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, কার্য-নির্বাহক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিবে। তাঁহাদের আশংকা অমূলক ছিল না। কারামুক্তির পর শীঘ্রই এলাহাবাদে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ মিলিত হইলেন: সেখানে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গুরুতর অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া আর যাহাই হউক অনুকূল ছিল না। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদারপন্থী নেতাগণ —স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর দেশে পৌঁছিয়াই সোজা এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু উদারপন্থী নেতাগণ মহাত্মাকে বুঝাইলেন যে, বড়লাট যখন উদার ভাব দেখাইয়াছেন তখন তাঁহার সহিত আলোচনা না করিয়া তিনি যেন চূড়ান্তভাবে ঐ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করেন। সেই সময়ে আপোষকারী ও উত্তেজনা-সৃষ্টিকারীদের দ্বারা এলাহাবাদ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের কাহারও কাহারও এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষে গুজব ছড়ানো ভিন্ন আর কোনও কাজ ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাতের জন্য মহাত্মা এক আবেদন পাঠাইলেন এবং তাহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার সংগে গিয়াছিলেন কিন্তু খুবই অসুস্থ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যাইতে পারেন নাই। ইহা ছিল নিতান্তই বিরাট একটি দুর্ভাগ্য।

দিল্লীতে মহাত্মাকে ঘিরিয়া ছিলেন ধনী অভিজাতগণ ও সেই সমস্ত রাজনীতিবিদ্ যাঁহারা একটি মীমাংসার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির দিক হইতে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন কেহ ছিলেন না যিনি মহাত্মাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। এমন কি, যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পক্ষে উহা অসম্ভব ছিল না, তিনিও ঐ সময়ে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যদিগের সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁহাদের সকলে না হইলেও বেশীর ভাগই মীমাংসার জন্য মহাত্মা নিজে যতটা না ছিলেন তাহাপেক্ষাও অধিক ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিনের পর দিন ধরিয়া বড়লাট ও মহাত্মার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিল এবং কার্য-

নির্বাহক সমিতিকে মহাত্মা সকল ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত রাখিলেন। ৪ঠা মার্চ তারিখে এই আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি ঘটিল এবং মহাত্মা যখন কার্যনির্বাহক সমিতির সম্মুখে চুক্তির শর্তগুলি রাখিলেন তখন তিনি একেবারে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদের সর্বসম্মত সমর্থন না পাইলে এক পদক্ষেপও তিনি অগ্রসর হইবেন না। এই সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দায়িত্ব ছিল খুবই বিরাট। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন কার্য-নির্বাহক সমিতির একমাত্র সদস্য যিনি বামপন্থীদের বক্তব্য বুঝিবেন ও সমর্থন করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা যাইত এবং মহাত্মা ও কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক ঐ চুক্তিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণে বাধা দিতে তাঁহার আপত্তিই হইত যথেষ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজী হইয়া যাওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক চুক্তিটি অনুমোদিত হয় এবং পর দিবস, ৫ই মার্চ মহাত্মা ও লর্ড আরুইন ইহাতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি প্রকাশ হওয়ার পর দেশে যখন হৈ-চৈ সুরু হইয়া গেল তখন পণ্ডিত জওহরলাল এই বিবৃতি দিলেন যে, চুক্তির কতকগুলি শর্ত তিনি অনুমোদন করেন নাই—পরন্তু একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক হিসাবে তাঁহাকে নেতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে কেবল একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক নহেন, তাহার বেশী কিছু, দেশবাসীর ধারণা ঐরূপই ছিল।

ঐ চুক্তি—যাহা দিল্লী চুক্তি বা গান্ধী-আরুইন চুক্তিরূপে অভিহিত—পরদিন ভোরে সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হইল। ইহা একটি দীর্ঘ দলিল ছিল এবং কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহার খসড়াটি হইয়াছিল ত্রুটিপূর্ণ, কেননা কংগ্রেস যে জিতিয়াছে এরূপ কোনও ধারণা ইহার দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই। 'কংগ্রেসপন্থী' পাঠকগণ যখন চুক্তির ঐ সকল শর্ত বিচার করিয়া দেখিলেন তখন সকলের মধ্যে নিরুৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেই সময়ে লেখক কলিকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। দিনের পর দিন কাগজগুলিতে আসন্ন চুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে যে সকল পূর্বাভাস বাহির হইয়াছিল সেগুলি ছিল যথার্থই নির্ভুল। এমন কি, মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরাও যখন ঐগুলি পড়িয়া দেখিলেন তখন তাঁহারা একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, তাঁহাদের নেতা—অর্থাৎ মহাত্মা—ঐ সকল শর্তে রাজী হইবেন ইহা ভাবিতেই পারা যায় নাই। তথাপি, সেই অভাবনীয়টাই সত্যে পরিণত হইল। মহাত্মা বাস্তব অবস্থাটি যে উপলব্ধি করেন নাই এমন নয়, এবং ঐ চুক্তিটির সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে বিবৃতি প্রচার করিয়া তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিলেন যে, এই মীমাংসার দ্বারা কোনও পক্ষেরই জয় বুঝায় না এবং সাময়িক যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহাকে পাকাপাকি করার জন্য তিনি সর্বশক্তিতে চেষ্টা করিবেন—যাহাতে কংগ্রেস যে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এই চুক্তিটি উহার পূর্বলক্ষণ

বলিয়া প্রমাণিত হয়। চুক্তির শর্তগুলি ছিল সংক্ষেপে এইরূপ ঃ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী যে যে বিষয়ে রাজী হইয়াছিলেন ঃ

১। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা।

২। (ক) যুক্তরাষ্ট্র; (খ) দায়িত্ব ও (গ) সমন্বয়সাধন এবং ভারতের স্বার্থে যে সকল রক্ষাকবচের প্রয়োজন হইতে পারে তাহার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈয়ারীর জন্য আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করা।

৩। ভারতের বিভিন্ন অংশে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে ঐগুলির বিষয়ে তদন্তের দাবীকে রূপ দেওয়া।

গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বড়লাট যে যে বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন ঃ

১। অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারারুদ্ধ সকল রাজবন্দীকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়া।

২। যে সমস্ত সম্পত্তি ও জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে সেগুলি ইতি-মধ্যেই গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিক্রী বা নীলাম করা না হইয়া থাকিলে মালিকদিগকে প্রত্যর্পণ করা।

৩। জরুরী বিধিগুলি প্রত্যাহার করা।

৪। সমুদ্রতীর হইতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে বিনা-শুল্কে লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করিতে অনুমতি দেওয়া।

৫। মদ, আফিং ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করার অনুমতি দেওয়া; শেষের দফাটি কেবল মাত্র বৃটিশ পণ্যের ক্ষেত্রেই পার্থক্যমূলকভাবে করা হয় নাই, বরং উহা করা হইয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনকে (অর্থাৎ দেশীয় শিল্প) উৎসাহদান হিসাবে।

জনগণের মধ্যে যাঁহাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল তাঁহাদের পক্ষে চুক্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহারা খুব নিরাশ হইয়াছিলেন। সামগ্রিকভাবে দেশের যুব সংগঠনগুলিও খুশী হয় নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট ইহা কংগ্রেসের একটি বিরাট সাফল্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কেবল বাঙলায় জনগণের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই

এবং কেন তাহা এখনই বুঝাইয়া বলা হইবে। চুক্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে খুবই যোগ্যতা ও তৎপরতার সহিত কাজ করিতে কংগ্রেসের পরিচালন-যন্ত্র সুরু করিল। করাচীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিসর্জন দিয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হইল, যাঁহার অপেক্ষা মহাত্মার বিশ্বস্ততর ভক্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন ছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির প্রত্যেক সদস্যই তাঁহার ক্ষমতা নষ্ট হইতে বসিয়াছে বলিয়া অনুভব করিলেন এবং করাচী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নিজ নিজ প্রদেশ হইতে সর্বাধিক সংখ্যক সমর্থক জোগাড়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম চালাইলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ছাড়াও, দক্ষিণপন্থী সকল নেতাই ঐ চুক্তি করাচী কংগ্রেসে অনুমোদিত করাইয়া লওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। এই চুক্তির পরে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও সকলে ইহাই চাহিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহারা শান্তিপূর্ণ-ভাবে কাজ-কারবার চালাইয়া যাইতে পারেন। কাজেই মহাত্মাকে সমর্থন করিবার জন্য যাঁহারা করাচী যাইতে চাহিলেন তাঁহাদের কোনও অর্থাভাব হইল না। অপর পক্ষে, বিরোধিগণ খুব অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের সমর্থকদের অনেকেই তখনও জেলে ছিলেন এবং চুক্তিতে সকলকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তদনুসারে তাঁহারা মুক্তি পাইলেন না। তাঁহাদের নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ দলত্যাগ করায় দেশে তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল এবং করাচী কংগ্রেসে যাঁহারাও বা যাইতে পারিতেন যথেষ্ট অর্থের অভাবে তাঁহারা পারিলেন না। লাহোর কংগ্রেসের পর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার জনসেবার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন মাদ্রাজের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নেতা ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি তবু অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের মত তাঁহার প্রতিও লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ও মহাত্মা জঘন্য ব্যবহার করেন; কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে তাঁহাকে বিতাড়নের ব্যাপারে মহাত্মা সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই অপমানে তিনি এত বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধী যতদিন কংগ্রেসের নেতা থাকিবেন ততদিন উহার সহিত কোনও কাজই তিনি করিবেন না। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছাড়া, আর একজন ব্যক্তি দল হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন; তিনি হইতেছেন লাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম যিনি লাহোর কংগ্রেসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর মহাত্মার সমর্থক হইয়া উঠেন। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাঙলাই ছিল ঐ চুক্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী, কিন্তু সেখানেও মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে, বামপন্থীদের করণীয় কি ছিল? ৮ই মার্চ তারিখে কারামুক্তির পূর্বে, আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, রাজবন্দীরা সাধারণতঃ চুক্তি-বিরোধী, এবং স্বভাবতঃই আমার মনোভাবও ছিল সেইরূপ। কিন্তু বাহিরে আসার পর বুঝিলাম যে, ঐ চুক্তিটি একটি অবধারিত বিষয় এবং করাচী কংগ্রেসে উহার অনুমোদনকে বাধা দিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। একমাত্র যে প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা হইল এই যে, করাচীতে আমরা নিষ্ফল বিরোধিতা করিব—না ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া সভার ভিতরে মতভেদ সৃষ্টি হইতে বিরত থাকিব। সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে মহাত্মার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা সংগত বলিয়া আমার মনে হইল—সেজন্য বোম্বাই অভিমুখে আমি যাত্রা করিলাম। যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া আমি গিয়াছিলাম ঐ সকল স্থানের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করাও ইহার দ্বারা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে মহাত্মার সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হইল। চুক্তিটির সমালোচনা করিবার পর যে বিষয়টি আমি জোর দিয়া বুঝাইয়াছিলাম তাহা হইল এই যে, যতক্ষণ তিনি স্বরাজের পক্ষে থাকিবেন ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত থাকিব—কিন্তু যখনই তিনি উহা পরিত্যাগ করিবেন তন্মুহূর্তেই তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিব। শেষে মহাত্মা এইরূপ আশ্বাস[১] দিলেন ঃ

১। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া একটি নির্দেশ জারী করার জন্য তিনি করাচী কংগ্রেসকে বলিবেন।
২। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হইয়াছে উহার সহিত সামঞ্জস্য নাই এমন কিছুই ঐ নির্দেশে থাকিবে না।
৩। চুক্তিতে যাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন তাঁহাদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং সর্বশক্তিতে উদ্যোগী হইবেন।

বোম্বাই হইতে মহাত্মা দিল্লী রওনা হইলেন এবং ঐ একই ট্রেনে তাঁহার সঙ্গে আমি গেলাম। ফলে বোম্বাইয়ের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার আরও একটি সুযোগই কেবল নয়, উপরন্তু এই চুক্তিটির দ্বারা জনগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উহা লক্ষ্য করার সুযোগও আমি লাভ করিয়াছিলাম। সর্বত্র তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে,

[১] মহাত্মার নিকট হইতে ইহাও জানিয়াছিলাম যে, পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবী তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে। এমন কি ১৯২১ সালের ইতিহাসকেও ইহা অতিক্রম করিয়াছে। দিল্লীতে পৌঁছিয়াই আমরা নিদারুণ বিস্ময়ে এই সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে দুইজনকে গভর্নমেন্ট ফাঁসি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই যুবকদিগের প্রাণরক্ষার্থ চেষ্টা করিবার জন্য মহাত্মাকে চাপ দেওয়া হইল এবং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়েই আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে এই প্রশ্নটিতেই বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত কারণ এই ফাঁসি আক্ষরিক অর্থে দিল্লী চুক্তির বিরোধী না হইলেও ইহার উদ্দেশ্যবিরোধী। সিন ফিন দল ও বৃটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে চুক্তিকালে ঠিক এই ধরনের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল: সে সময়ে পূর্বোক্ত পক্ষের কঠোর মনোভাবের ফলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আয়ার্ল্যান্ডের একজন রাজবন্দীর মুক্তি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে চাহেন নাই এবং তিনি অতদূর অগ্রসর হইবেন না; বড়লাট যখন বুঝিলেন যে, ঐ প্রশ্নে মহাত্মা আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবেন না তখন স্বভাবতঃই অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার দাঁড়াইল। যাহা হউক, লর্ড আরউইন সে সময়ে মহাত্মাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহু লোকের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পাইয়াছেন যাহাতে লাহোরের ঐ তিনজন বন্দীকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে লঘু দণ্ড দিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি সাময়িকভাবে তাঁহাদের ফাঁসি স্থগিত রাখিয়া বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে উহার বেশী তাঁহাকে চাপ দেওয়া হউক ইহা তিনি চাহেন না। বড়লাটের এই মনোভাব হইতে মহাত্মা এবং প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসি রদ করা হইবে এবং সারা দেশব্যাপী, বিশেষতঃ যে বাঙলা দেশেও কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর ফাঁসি হইতে চলিয়াছিল সেখানেও আনন্দোল্লাস দেখা গেল।

এই ঘটনার প্রায় দশ দিন পরে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা। সকলেরই প্রত্যাশা ছিল যে, ফাঁসি রদ করা হইবে; সুতরাং ২৪শে মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে করাচী যাওয়ার পথে যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পূর্বদিন রাত্রে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে তখন ইহা অতীব বেদনাদায়ক ও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের মৃতদেহগুলি সৎকার সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সব সংবাদ পাঞ্জাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কি তীব্র শোকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এতদিন পরে তাহা বুঝা সম্ভব নয়। যাহাই হউক, ভগৎ সিং যুব সমাজে এক নবজাগরণের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার যে

অভিযোগ আনা হইয়াছিল, ঐ অপরাধে তিনি সত্য সত্যই অপরাধী কিনা উহা ভাবিয়া দেখার অবকাশও জনগণের ছিল না। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভার (যুব আন্দোলন) তিনি ছিলেন জনক—তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন, যতীন দাস, শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ বিচারের সময় নির্ভীক মনোভাব দেখাইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটি শোকের ছায়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। নির্বাচিত সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদেশ দেন যে কংগ্রেসের প্রথম দিনে সচরাচর যে সমস্ত উৎসব হইয়া থাকে ঐগুলি বন্ধ থাকিবে। তথাপি, মহাত্মা যখন করাচীর নিকটে অবতরণ করিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হইল এবং কয়েকজন যুবক কালো ফুল ও মালা লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। যুবকদিগের মধ্যে একটি বিরাট অংশের মনোভাব ছিল যে, ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের ব্যাপারে মহাত্মা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছেন।

মার্চ মাসের ২৬শে তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা ও ২৯শে তারিখে ইহার পূর্ণ অধিবেশনের কথা ছিল। ২৩শে মার্চ ফাঁসি হইয়া যাওয়ার ফলে চুক্তির সমর্থকগণ বেশ কিছুটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে প্রকাশ্য বিরোধের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত প্রদেশ হইতেই বিপুল সংখ্যায় চুক্তির সমর্থকগণ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইলেন। যে বামপন্থী দলভুক্ত আমি ছিলাম—পূর্বে উহা করাচীতে আসিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বোম্বাইতে মহাত্মা আমাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সতর্কতার সহিত অনুধাবন এবং তাহার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিল। করাচীতে একেবারে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষতঃ যুবকদের নিকট হইতে বিপুলতর সমর্থন পাইলেও—যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই কেবল কংগ্রেসে ভোটাধিকার ছিল তাঁহাদের যথেষ্ট সমর্থন তাঁহারা পাইবেন না। আর একটি কারণও বিবেচনা করিয়া দেখার ছিল। আমাদের সততা ও নিষ্ঠার খাতিরে কেবলমাত্র চুক্তির বিরোধিতা করিয়াই গৃহে প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন হইত না। আমরা গভর্নমেন্টকে নোটিশ দিতাম এবং পুনরায় আন্দোলন সুরু করিতাম। এরূপ করিলে কি সমর্থন পাওয়া যাইত? অর্থ ও লোকবলের সাহায্য যে আশাজনক হইত না ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং, যদি আমরা লড়াই চালাইয়া যাইতাম তাহা হইলে মহাত্মা যাহা করিয়াছেন তদপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাইবে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায়, সভার ভিতরে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া কি লাভ হইত? যদি আমাদের পরাজয় ঘটিত—যাহা আমরা নিশ্চিত-

ভাবে বুঝিয়াছিলাম—তাহা হইলে আমাদের বাধাদানই নিষ্ফল হইত। চুক্তিটিকে নাকচ করিয়া দিবার ব্যাপারে সফল হইলেও—যাহা ঐ অবস্থায় সম্ভব ছিল না —অধিকতর শক্তিশালী একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের এই বাধাদানের দ্বারা দেশের কি লাভ হইত? উপরন্তু, সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের ফাঁসির বিষয়টিও বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট অবহিত ছিলেন এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে এই ফাঁসির দ্বারা কংগ্রেসের ভিতরে একটি ভাঙ্গন ধরিবার সম্ভাবনা আছে এবং চুক্তি-বিরোধী দল খুবই শক্তিশালী হইবে। ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য গভর্নমেন্টের যখন দূরভিসন্ধি ছিল তখন ইহাকে এড়াইয়া যাওয়ার অনুকূলে যুক্তিও ছিল। সঙ্কটমুহূর্তে, নেতৃবৃন্দ ভুল করিতেছেন ইহা জানিয়াও দলকে কখনও কখনও তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও গভর্নমেন্টের মধ্যে মীমাংসার ইহাই ছিল প্রথম সুযোগ। তাঁহারা একটি চুক্তি করিয়া বসার পর দলের সাধারণ সদস্যগণ যদি তাঁহাদের না মানিতেন তাহা হইলে উহা কেবল নেতৃবৃন্দের পক্ষেই নয় দলের পক্ষেও মর্যাদাহানিকর হইত। পরে গভর্নমেন্টের পক্ষে বলা সম্ভব হইত যে, নেতাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই কারণ তাঁহাদের কথা তাঁহাদের অনুগামিগণ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিতেও পারেন। এই সকল বিষয় যথারীতি বিচার করিবার পর আমরা এরূপ একটা বিবৃতি দিব বলিয়া স্থির করিলাম যে, কংগ্রেসের বামপন্থী দল গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে অনুমোদন করে না কিন্তু ঐ সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁহারা সভার ভিতরে অনৈক্য সৃষ্টি হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সম্মুখে আমি এই বিবৃতিটি দিলে চুক্তির সমর্থকগণ দারুণ উল্লাসে ইহাকে অভ্যর্থনা জানান—অপর দিকে আমাদের অত্যুৎসাহী সমর্থকদের মনে উহা হতাশার সৃষ্টি করিল।

কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবটিকে এড়াইয়া গিয়া ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। তাঁহার বক্তৃতার বেশীর ভাগই ছিল কৃষি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ, এবং দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা। কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে একটিতে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিয়া হিংসাত্মক সমস্ত কার্যকলাপকে নিন্দা জানানো হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত 'গোপীনাথ সাহা প্রস্তাবের' মতই একইভাবে এই প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছিল, যাহাতে মহাত্মার একেবারেই অনুমোদন ছিল না। করাচীতে পরিস্থিতি এরূপ

দাঁড়াইয়াছিল যে, জনসাধারণকে এই প্রস্তাবটি মানিয়া লইতে হইয়াছিল— যাঁহারা সাধারণ অবস্থায় ইহার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষিতেন না। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, মনের দিক হইতে কিছুটা নমনীয়তা তাঁহাকে দেখাইতে হইয়াছিল। কিন্তু উহাই যথেষ্ট ছিল না। অবস্থা সামলাইবার জন্য স্বর্গতঃ সর্দার ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার কিষেণ সিংকে বক্তৃতামঞ্চে আনিয়া কংগ্রেস নেতাদের সমর্থনে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। দলের পদাধিকারীদের কৌশল ছিল চমৎকার। কংগ্রেসে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলির বিষয় ছিল :

১। গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুমোদন।
২। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ প্রদান; এবং
৩। ভারতীয় জনগণের যে মৌলিক অধিকারের জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা লেখককে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন উহার সহিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত নির্দেশের সামঞ্জস্য ছিল। 'মৌলিক অধিকারসমূহের প্রস্তাবটি' করা হইয়াছিল কংগ্রেসের ভিতরে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শান্ত করিবার জন্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলে কে কে থাকিবেন তাঁহাদের নির্বাচনের ক্ষমতা কার্যনির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হইয়াছিল। অধিবেশনের শেষ দিকে পরবর্তী বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হইল এবং, লাহোর কংগ্রেসে যেমন করা হইয়াছিল তেমনি সেই সকল ব্যক্তিদেরই কেবল নির্বাচিত করা হইল যাঁহারা অন্ধভাবে মহাত্মাকে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় ভোরবেলা মহাত্মা প্রার্থনাসভা করিতেন এবং ইহাতে যে ভীড় হইত উহা অভূতপূর্ব। জনগণের সমর্থন সংগ্রহে কোনও প্রচারই ইহাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইতে পারিত না।

কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময়ে চলিতেছিল ঠিক ঐ একই সময়ে করাচীতে নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার (নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের) অধিবেশনও হয়, উহাতে সভাপতিত্ব করার জন্য লেখককে আহ্বান জানানো হইয়াছিল। ঐ সময়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর যুবকদিগের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া পৃথক একটি সংগঠন গড়িয়া তোলার স্পষ্ট ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বলিয়াছিলাম এবং বর্জনের পরিবর্তে কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা দখলের উপর জোর দিয়াছিলাম। গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্বন্ধে আমি এইরূপ সমালোচনা করিয়াছিলাম :

১। চুক্তিতে অনেক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক খুঁটিনাটির বিষয়ে বলা হইয়াছে কিন্তু প্রধান বিষয় স্বরাজের কথাটি এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।

২। বৈঠকটি প্রকৃত পক্ষে কোনও গোল টেবিল বৈঠকই নয় কারণ বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি চূড়ান্ত নয় এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট নূতন করিয়া সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ও আয়ার্ল্যান্ডবাসিগণের ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ প্রকৃত গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদাই চূড়ান্ত হয় এবং উহা মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই বাধ্যবাধকতা থাকে। নির্বোধ ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দিগকে কেবল ধোঁকা দিবার জন্যই গোল টেবিল বৈঠক নামটি দেওয়া হইয়াছে।

৩। গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করিবেন, ভারতীয় জনগণ নহেন।

৪। দুইটি বিবদমান দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই বৈঠক হইবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহাদের কোনই দান নাই এমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সকল ব্যক্তিদিগকেও প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য রাখা হইবে।

৫। জাতীয়তাবাদী বৃটিশ ভারত ও স্বৈরাচারী ভারতীয় নৃপতিগণকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হাস্যকর। এই সব নৃপতি বা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিগণ জাতীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য কাজ করিবে।

৬। 'দায়িত্ব' হইতে যাহা পাওয়া যায় 'রক্ষাকবচগুলি'র দ্বারা তাহা হারাইতে হয়। ভারতের স্বার্থে 'রক্ষাকবচগুলি'র কথা বলা মহাত্মার দিক হইতে একটি মারাত্মক ভুল হইয়াছে। একমাত্র যে রক্ষাকবচটি ভারতবাসীরা চায় উহা হইতেছে স্বাধীনতা। বৃটিশদের পক্ষ হইতেই প্রকৃত পক্ষে 'রক্ষাকবচগুলি' দাবী করা হইতেছে এবং ঐগুলি ভারতবাসীদের স্বার্থবিরোধী। ঐগুলি ভারতের স্বার্থে করা হইতেছে ইহা বলিয়া এরূপ রক্ষাকবচগুলি গ্রহণে ভারতবাসীদিগকে রাজী করানো ভুল।

৭। চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদের মুক্তিদানের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয় কারণ নিম্নোল্লিখিত শ্রেণীর রাজবন্দিগণ বাদ পড়িয়া গিয়াছেন:

(ক) রাজবন্দী ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ 'আটক বন্দিগণ', যাঁহাদের মধ্যে কেবল বাঙলায়ই প্রায় এক হাজার আছেন।

(খ) বিপ্লবাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত বন্দিগণ।
(গ) বিপ্লবাত্মক অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন বন্দিগণ।
(ঘ) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দিগণ।
(ঙ) শ্রমিক ধর্মঘট ও অন্যান্য শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কারারুদ্ধ বন্দিগণ।
(চ) নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করায় সামরিক আদালতের বিচারে গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত গাড়োয়ালী সৈন্যগণ।
(ছ) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে যাঁহাদের কোনও না কোনও প্রকার হিংসামূলক কার্যের অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে সেই সকল বন্দিগণ।

৮। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রথমে যে দাবী করিয়াছিলেন উহা চুক্তি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

উপরোক্ত সমালোচনাটি যুব কংগ্রেস সাধারণভাবে অনুমোদন করে এবং দিল্লী চুক্তিকে নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

দিল্লী চুক্তিটি আশীর্বাদ নয় বরং একটি অভিশাপ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল, যাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব। যে সময়ে ঐ রকমের একটি বুঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করা হয় তাহা ঠিক উপযুক্ত সময় ছিল না। আরও কিছুকাল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া উচিত ছিল। চুক্তিটির খসড়া যেভাবে করা হইয়াছিল উহার মধ্যে মূল্যবান কিছু ছিল না। ১৯২৯ সালে আলাপ-আলোচনা সুরু হওয়ার পর হইতেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের একটি আশ্বাসের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বদা জেদ করিয়া আসিয়াছেন। শীঘ্রই ঐ আশ্বাস দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া ১৯৩০ সালে লড়াই সুরু করিতে হইয়াছিল। ঐ একই কারণে ১৯৩০ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের পূর্বে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ একটি আশ্বাস ব্যতীত কিরূপে লড়াই বন্ধ হইতে পারে ইহা কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। একমাত্র যে কারণটির কথা বলা যাইতে পারে তাহা এই যে, মহাত্মাকে ঠিক পথটি দেখাইয়া দিবার মত কার্যনির্বাহক সমিতিতে কেহ ছিলেন না এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অত্যন্ত শোকাবহ মৃত্যুর ফলে কংগ্রেসের ভিতরে জ্ঞানের দিক হইতে শেষ বিরাট পুরুষটিও অদৃশ্য হইয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর নেতার পক্ষে ভাবাবেগের যে আবেদন প্রয়োজন পণ্ডিতজীর মধ্যে যদিও উহা ছিল না তথাপি তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তাঁহার সমসাময়িক

ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মহাত্মার উপর ভাল প্রভাব খাটাইতে পারিতেন। কাজেই ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দিল্লী আলাপ-আলোচনার সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন; এবং ১৯৩১ সালের মার্চের গোড়ার দিকে তাঁহার পরলোকগমনকে একটি জাতীয় বিপর্যয় ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

চুক্তিটি যেরূপ ঠিক সময়ে হয় নাই, সেইরূপ ইহার কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কূটনীতির অভাবও দায়ী ছিল। যথা,—পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবীর ব্যাপারে মহাত্মাকে জানানো হইয়াছিল যে, যদি তিনি আলোচনার শেষ পর্যন্ত ইহা ধরিয়া থাকেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট নতিস্বীকার করিবেন। তথাপি, বড়লাটের এক আবেদনে স্বেচ্ছায় তিনি ঐ দাবী পরিত্যাগ করেন। এমন কি ১৯৩১ সালের মার্চেও, ভালভাবে দর-কষাকষি করিলে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে আরও বেশী কিছু আদায় করা সম্ভব হইত, কেননা তাঁহারা একটি মীমাংসার জন্য সত্য সত্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল তাঁহারা রাজনৈতিক দর-কষাকষি চালানোর পক্ষে যোগ্য নহেন। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, কখনও তিনি কঠোরতা দেখান, কখনও আবার নরম হইয়া যান; উপরন্তু, ব্যক্তিগত আবেদনে তিনি অত্যধিক অভিভূত হইয়া থাকেন এবং এইরূপ মানসিক গঠনের দ্বারা রাজনৈতিক দর-কষাকষিতে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা কঠিন। দিল্লীচুক্তি গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ইহা তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের কৌশলগুলি অধিকতর গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যতে ঐ দলের সহিত আঁটিয়া উঠার জন্য তাঁহাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার সময় দিয়াছিল। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ইহা ঘুমের ঔষধের কাজ করিয়াছিল। দেশবাসীর উদ্দীপনা উবিয়া যাইতে সুরু করিয়াছিল এবং জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা হইতেই ত অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্য অর্থ ও লোক সংগৃহীত হইয়া থাকে। যেহেতু গভর্নমেন্টের অর্থ বা লোকের অভাব ছিল না সেজন্য যে কোনও সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের কাজকর্ম পুনরায় সুরু করিতে পারিতেন অথচ আবার একবার জনগণের উৎসাহকে জাগাইয়া তুলিতে না পারা পর্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করিতে হইবে। দিল্লী চুক্তিকালে যখন লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন চলিতেছিল তখন গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে আঘাত হানিবার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করিতেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৩১ সালের অক্টোবর নাগাদ পরবর্তী বৎসরের জন্য জরুরী আইনগুলি ইতিমধ্যেই তৈয়ারী করা হইয়াছিল। দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারী ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছিলেন এবং ঐগুলি যথারীতি কংগ্রেস-

সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা ঘটিবে সেগুলি আগেই বুঝিতে পারা গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ ছিল কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে কিছুই দেওয়া হইবে না। কিন্তু আসন্ন লড়াইয়ের জন্য মহাত্মার সৎ ও সরল নীতির দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসের কোনও প্রস্তুতিই দেখা গেল না। বস্তুতঃ, লন্ডনে যাওয়ার পূর্বে তিনি লর্ড আরুইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, একটি মীমাংসার জন্য সেখানে তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; এবং যখন তিনি লন্ডন ত্যাগ করিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে বলিলেন যে, পুনর্বার যাহাতে বৈরিতার সূত্রপাত না হয় তাহার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিবেন এবং যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ যতদূর সম্ভব[১] তিক্ততা এড়াইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। উপরন্তু, বোম্বাইতে পৌঁছিবার পূর্বদিন মহাত্মা গান্ধী বেতারযোগে অতিশয় শান্তিমূলক এক বার্তা পাঠাইলেন যাহা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইল। কিন্তু উহাতে নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডনের উপর কোনও প্রতিক্রিয়া হইল না যিনি ইতিমধ্যেই তাঁহার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের সহিত চুক্তিতে সম্মত হইতে গিয়া যে সামান্য অপদস্থতার সম্মুখীন গভর্নমেন্টকে হইতে হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে লড়াইয়ের জন্য উৎসুক হইয়া ছিলেন। চুক্তির ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও, অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে যদি ইহাতে তদন্তের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে ভবিষ্যতে এরূপ দুষ্কার্য-সকল কার্যকরভাবে বন্ধ করা যাইত। ইহার পূর্বে এক বৎসর ধরিয়া পেশোয়ার, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় পুলিস ও সৈন্য-বাহিনী যে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল সে সম্বন্ধেই জনসাধারণ প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। পেশোয়ারে গুলিচালনা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও মেদিনীপুরে কর-বন্ধ আন্দোলনকে দমনের চেষ্টায় রাজশক্তি যথেচ্ছ আচরণ করিয়াছে এবং যুক্তপ্রদেশে নারীদের উপর বীভৎস ধরনের আক্রমণের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ঘটনা ছাড়াও, সাম্প্রতিক যে ঘটনাটি এখনও জনসাধারণের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই উহা হইল স্বাধীনতা দিবসে (১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী) কলিকাতায় শান্তি-পূর্ণ শোভাযাত্রার উপর পুলিসের আক্রমণ। এই শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করিতেছিলেন লেখক যিনি তখন কলিকাতার মেয়র ছিলেন; পূর্ব হইতে সতর্ক

[১] মহাত্মা তাঁহার কথামতই ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ১৮২৭-এর ২৫নং ধারানুযায়ী গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে এক আবেদন প্রচার করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের হৃদয় হইতে হিংসার সামান্যতম ভাবকেও দূর করুন; প্রত্যেক ইংরাজ নারী, পুরুষ ও শিশুকে রক্ষা করুন।'

না করিয়াই বৃটিশের অশ্বারোহী পুলিসেরা লাঠি (চামড়া-ঢাকা শক্ত লাঠি) লইয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নির্দয়ভাবে প্রহার চালাইয়াছিল। লেখক ও আরও অনেক শোভাযাত্রী, যাঁহাদের মধ্যে এডুকেশন অফিসার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা পৌরসভার ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত ঘোষালও ছিলেন, এই আক্রমণের ফলে গুরুতররূপে আহত হন, যদিও শোভাযাত্রাটি শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও অহিংস ছিল। পরদিন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দাঙ্গা-হাঙ্গামার[১] জন্য লেখককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারতের প্রথম মহানগরীর মেয়রের প্রতি পুলিসের এরূপ আচরণ ছিল এমনই একটি ব্যাপার যাহা ভারতীয় জনগণও সহ্য করিতে পারেন নাই। অপরপক্ষে, পুলিসের ধারণা ছিল যে, তাহারা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারে কারণ জনমতের বিচারের সম্মুখে তাহাদের কখনও উপস্থিত হইতে বলা হইবে না।

চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল উহার সীমাবদ্ধ সুযোগের দরুন কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বিপ্লবী ও ট্রেড ইউনিয়ন মহল হইতে মহাত্মাকে উহা আরও অধিক বিচ্ছিন্নও করিয়া ফেলিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে মীরাট বন্দীদের বন্ধু ও অনুগামীরাও ছিলেন। যদি মহাত্মা এরূপ সমস্ত শ্রেণীর বন্দীদের জন্যই মুক্তি আদায় করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি কেবল জাতীয়তাবাদীদেরই নহেন বরং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী ও বিপ্লবীদেরও প্রতিনিধি হইয়া উঠিতেন, এবং চিরকাল তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন। গভর্নমেন্টও যদি যথেষ্ট সাহসপূর্বক জেলের দরজা খুলিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহারা মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারিতেন যাহা সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিত। এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের কিছু লোকসান হইত না—কারণ কেহ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে আইনের ধারা ও জরুরী বিধানগুলির সাহায্যে তাঁহাকে পুনর্বার জেলে আটক করা যাইত। যেহেতু মহাত্মা সত্যাগ্রহীদের ব্যাপারেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই হেতু জেলে বন্দী বিপ্লবিগণ এই বলিয়া লর্ড আরুইনকে এক পত্র পাঠাইলেন যে, মহাত্মা

[১] এবার লেখককে লালবাজার সেন্ট্রাল পুলিস স্টেশনে খাদ্য ও পানীয় ছাড়া একভাবে ২৪ ঘণ্টা কাটাইতে হইয়াছিল। থানায় সামান্য পরিমাণ একটু টিনচার আয়োডিন কেবল পাওয়া গিয়াছিল তাঁহার ক্ষতস্থানে লাগাইবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহা ফুরাইয়া গেলে আর একটু চাহিয়া তিনি পাইলেন না। পরদিন রক্তমাখা কাপড়ে ও হাত ঝুলানো অবস্থায় তাঁহাকে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল। থানায় পুলিসের আচরণ সম্পর্কে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি বিবৃতি দেন; উহা যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জেলে লইয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় এবং তখন দেখা যায় যে, তাঁহার ডান হাতের দুইটি আঙুল ভাঙিয়া গিয়াছে।

গান্ধীর সহিত একটা মিটমাট করা হইলে উহা মানিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন না এবং মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি সত্য সত্যই ভারতীয় প্রশ্নের মীমাংসা চান তাহা হইলে বিপ্লবী দলের সহিত গভর্নমেন্টকে আলাদাভাবে একটা বুঝাপড়া করিতে হইবে। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদের[১] মারফৎ এই পত্রটি বড়লাটের হাতে পৌঁছিয়াছিল।

ইহাতে যে একেবারেই কোনও কাজ হয় নাই এমন নয়; কেননা কয়েক মাস পরে বাঙ্গলার গভর্নর, স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন বিপ্লবীদের সঙ্গে বুঝাপড়ার জন্য একটা চেষ্টা চালাইলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত উত্তর বাঙ্গলায় বকসার বন্দিশিবিরে গিয়া নেতাদের কয়েক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইহাতে ফল সন্তোষজনকই হইয়াছিল। যে সমস্ত বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইয়াছিল তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা শর্তগুলি লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন তবে তাঁহারা এই বিষয়টি লইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন যে, কোনও পুলিস অফিসারের মারফৎ নয় সরাসরি গভর্নমেন্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালানো হইবে। তাঁহারা শর্তগুলির একটা প্রাথমিক খসড়াও দিলেন এবং স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যথারীতি তাহা গভর্নরের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপর, বন্দিশিবিরের একজন পুলিস অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফৎ গভর্নর বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালানো না হয় তাহা হইলে তাঁহারা এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত জানাইলেন। যেহেতু গভর্নমেন্ট উহাতে রাজী ছিলেন না সেজন্য আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে ঐ সকল সত্ত্বেও, সরল প্রকৃতির জনসাধারণের কাছে দিল্লী চুক্তি মহাত্মার পক্ষে একটি সাফল্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল ধীরে ধীরে তাঁহাদের মোহমুক্তি ঘটিতে লাগিল। বহু বুদ্ধিমান লোকেই গুরুত্ব সহকারে বিশ্বাস করিতেন যে, চুক্তিতে যেগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে ঐগুলি ছাড়াও আরও অনেক অলিখিত শর্ত আছে যেগুলি পরে প্রকাশিত হইবে এবং চুক্তি বিরোধীরা এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত মহাত্মাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার চরমশিখরে পৌঁছিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলাম এবং সর্বত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে জনতার যেরূপ ভীড় হইয়াছিল উহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জানি না আর কোথাও কোন নেতাকে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানানো হইয়াছে

[১] ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর এই সকল বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।

কিনা। দেশবাসীর কাছে তিনি কেবল মহাত্মাই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের নায়ক। ঐ সময়ে যে প্রশ্নটি আমার মনকে নাড়া দিত তাহা হইল এই যে, যে অনন্য ক্ষমতা অধিকার করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন উহা তিনি কিরূপে কাজে লাগাইবেন। একের পর এক সাফল্য অর্জন করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে; না কি একেবারে উহার বিপরীত ঘটিবে? যখন এই সংবাদটি ঘোষিত হইল যে, ২রা এপ্রিল তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতি মহাত্মা গান্ধীকে গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন তখন প্রথম আঘাতটি আসিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ সিদ্ধান্তের পিছনে কি ছিল উহা বুঝিয়া উঠা কখনও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহা কি মহাত্মার দাম্ভিকতার জন্যই করা হইয়াছিল—তিনি কি পৃথিবীর কাছে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন? না কি ইহা কার্যনির্বাহক সমিতির আর একটি বিচারের ভুল মাত্র? অথবা ইহার পিছনে কি আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল? প্রথম ব্যাখ্যাটি মানিয়া লওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, এই সিদ্ধান্তটি একেবারেই ভ্রান্ত। যেখানে প্রায় এক শত জনের একটি সম্মেলনে বিচিত্র সব রকমের লোক, অনুচরবর্গ ও স্ব-নির্বাচিত নেতা-গণকে দৃঢ় একটি ব্যূহের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে একাকী তিনি খুবই অসুবিধায় পড়িবেন। উপরন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁহার যে লড়াই হইবে উহাতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে কেহই থাকিবেন না। কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না। মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরা তাঁহার সমালোচনা করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল না এবং যাঁহারা তাঁহার গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না—চরিত্র, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতানির্বিশেষে তাঁহাদের তাঁহার উপর কোনও প্রভাব ছিল না।

করাচী কংগ্রেসের পর মহাত্মা প্রথম যে কাজটি করেন তাহা যেমন বিজ্ঞজনোচিত ছিল না, তেমনি দ্বিতীয় কাজটি ছিল স্পষ্টতই একটি ভুল। ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং প্রকাশ্যেও তিনি বলিতে সুরু করেন যে, গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন পূর্বাহ্নে সমাধানে তাঁহার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিতে সুরু করেন যে, নূতন শাসনতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি প্রশ্নে মুসলমানগণ যদি যুক্তভাবে দাবী জানান তাহা হইলে তিনি ঐ দাবী মানিয়া লইবেন। এই সকল বিবৃতির ফল অত্যন্ত দুঃখজনক হইল। দিল্লী চুক্তির পর কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ও ক্ষমতায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানগণ কিছুটা ভীত ছিলেন এবং একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে ঐ দলের সহিত বুঝাপড়া করার মনোভাব তাঁহাদের ছিল। মহাত্মার প্রথম বিবৃতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই মনোভাবের পরিবর্তন

ঘটিল এবং তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ যদি তাঁহারা মহাত্মার সহিত বুঝাপড়ায় আসিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহার গোল-টেবিল বৈঠকে যাওয়া তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন। মহাত্মার দ্বিতীয় বিবৃতির পর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানগণ বুঝিলেন যে, শুধু যদি তাঁহারা কঠোর থাকেন এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমর্থন আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত চূড়ান্ত দাবীগুলি গ্রহণ করিতে মহাত্মাকে বাধ্য করা যাইতে পারে। উপরোক্ত বিবৃতিগুলি দিবার পর এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতার সহিত মহাত্মা একটি আলোচনা করেন। সেই সময়ে আমি দিল্লীতে ছিলাম এবং ঐ আলোচনার পর সেইদিন সন্ধ্যায়ই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি হতাশ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল কেন না তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীযুক্ত জিন্না কর্তৃক রচিত (ভারতে যাহা জিন্নার চৌদ্দ দফারূপে খ্যাত) চৌদ্দটি দাবী দিয়াছিলেন এবং তিনি বুঝিয়াছেন যে, উহার ভিত্তিতে কোনও মীমাংসা সম্ভব হইবে না। ইহাতে আমি মন্তব্য করিলাম যে, জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি মীমাংসার জন্যই কেবল কংগ্রেসের যত্নশীল হওয়া উচিত এবং ঐরূপ একটি সমাধানই জাতীয়তাবাদীদের দাবী বলিয়া গোল-টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত করা উচিত যাহাতে পারস্পরিক সম্মতি আছে এবং জাতীয়তাবিরোধী অন্যান্য লোকেরা কি ভাবেন বা বলেন তাহা লইয়া কংগ্রেসের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। মহাত্মা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতিতে আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা: কারণ এরূপ বলা যাইতে পারে যে, তৃতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি একসঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতে পারেন। ইহাতে আমি জবাব দিলাম যে, পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি জাতীয়তাবাদীদের মূলনীতি-বিরোধী এবং এবিষয়ে আমার মতামত এতই দৃঢ় যে, আমার মতে, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এমন কি স্বরাজও গ্রহণ করা উচিত নয়। এই আলোচনায় আমরা যখন ব্যাপৃত ছিলাম তখন ডাঃ আন্সারী ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত শেরওয়ানি প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, যদি কোনও কারণে মহাত্মা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যই যৌথ-নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর যে দাবী প্রতিক্রিয়াশীলগণ করিয়াছেন উহা মানিয়া লন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করিবেন কারণ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কেবল সমগ্র দেশের পক্ষেই নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও যে অনিষ্টকর ইহা তাঁহারা নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কঠোর মনোভাবের ফলেই পৃথক নির্বাচক-

মণ্ডলীতে রাজী হওয়ায় মহাত্মাকে বাধা দেওয়া, এবং যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তিনি নিজেকে[১] টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন উহা হইতে তাঁহাকে কোনও রকমে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করা অনেকাংশে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর শীঘ্রই, মহাত্মা এই বলিয়া প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতাদের দাবীগুলি তিনি মানিয়া লইতে পারেন না কারণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ঐগুলির বিরোধী।

সেই সময়ে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালের এপ্রিলে) দিল্লীর আবহাওয়া ছিল অভিসন্ধিপূর্ণ। মীমাংসার জন্য লর্ড আরুইন আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিলেও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহার বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে লর্ড আরুইনের আসন্ন বিদায় ও কড়া মানুষ বলিয়া খ্যাত লর্ড উইলিংডনের আগমন সম্ভাবনায় এই সকল গোঁড়া রক্ষণশীলরা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন আমরা দিল্লীতে ছিলাম তখন গোল-টেবিল বৈঠকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করিবেন ঐ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম। আমাদের বলা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীরা যাহাতে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মাতিয়া উঠেন তজ্জন্য সুরুতেই তুচ্ছ বিষয়গুলির দিকে মহাত্মা গান্ধীকে টানিয়া লইতে সর্ব প্রকারে চেষ্টা করা হইবে, যাহাতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির ব্যাপারে তাঁহারা বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক হইতে সমর্থ না হন, সংবাদটির সত্যাসত্য যাহাই হউক না কেন মহাত্মাকে এই সংবাদটি আমি যথারীতি জানাইয়া দিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা হইবে লন্ডনে পোঁছিয়াই সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহাদের নিকট হইতে আশ্বাস লাভ করিতে চেষ্টা করা। যদি তিনি সন্তুষ্টি বোধ করেন তবেই তুচ্ছ বিষয়গুলির দিকে তিনি মনোনিবেশ করিবেন—তাহা না হইলে ইংলন্ডে তাঁহার কাজ তখন ঐ অবস্থায়ই শেষ হইয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যের কথা, মহাত্মা গান্ধী যখন ইংলন্ডে ছিলেন তখন সংখ্যালঘুদের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত সমস্যাগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এপ্রিল মাসে দিল্লীতে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, ঘটনা সকল ঠিক সেভাবেই ঘটিল।

১৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড আরুইনের কার্যকাল শেষ হইল। দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্বে চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে, তিনি অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন—যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য তথাপি নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের পর, তাঁহার মত আর কোনও বড়লাট ভারতবাসীর প্রতি

[১] এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৩৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মনোভাব বোধগম্য নয়।

এরূপ সৌহার্দ্যের মনোভাব দেখান নাই। তিনি যে ভারতবর্ষের জন্য বেশী কিছু করিতে পারেন নাই উহার কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ও ইংলন্ড উভয় স্থানেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিল। লর্ড উইলিংডনের আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী মনোভাব কঠোর হইতে সুরু করিল। বিভিন্ন প্রদেশে কর্মচারিগণ চুক্তিটি কার্যকর করিলেন না। গুজরাটে বাজেয়াপ্ত জমিগুলি পুনরুদ্ধারে কৃষকগণ খুব অসুবিধা বোধ করিলেন এবং করাচী কংগ্রেস ও লন্ডন-যাত্রার মধ্যবর্তীকালে মহাত্মাকে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের এই সকল অভিযোগের সমাধানের জন্য তাঁহার সমস্ত সময় দিতে হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশে যদিও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হইয়াছিল তথাপি কৃষকেরা বলিলেন যে, কর দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি শতকরা ৫০ ভাগ পাওনা মিটাইয়া দিবার জন্য মহাত্মা তাঁহাদের যে পরামর্শ দিয়াছিলেন উহাকেও তাঁহারা কার্যকর করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বাঙ্গলা দেশেই পরিস্থিতি সর্বাপেক্ষা খারাপ দাঁড়াইয়াছিল। চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, বৈপ্লবিক আন্দোলন চালানো হইতেছে এই অজুহাতে দিনের পর দিন বিনা বিচারে আটক চলিতেই লাগিল। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ প্রায় এক হাজার রাজবন্দীর মধ্যে একজন বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হইল না। তখন এই প্রদেশে যে সকল ষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছিল সেগুলি যথারীতি চলিতেই লাগিল। সরকারী নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মাঝে মাঝে চলিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। চুক্তির পরে বাঙ্গলা দেশে সরকারী মনোভাবের আদৌ কোনও পরিবর্তন এবং সমগ্র ভারতবর্ষেও সরকারী তরফে শুভেচ্ছার লক্ষণ দেখা গেল না।

জুলাই নাগাদ কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে অভ্রান্ত সব প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চুক্তির শর্তগুলিকে কার্যকর করা হইতেছে না। সরকারী তরফ হইতে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্বলিত একটি 'অভিযোগ-পত্র' মহাত্মা ব্যক্তিগতভাবে সিমলায় ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিলেন। এরূপ গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, লন্ডনে যাইতে মহাত্মা স্বীকৃত হইবেন না। যে কোনও ভাবেই হউক না কেন, লন্ডনের কর্তৃপক্ষগণ মহাত্মাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার লন্ডনে যাওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য যাহাতে সম্ভাব্য সব কিছু করা হয় উহা দেখিতে বড়লাটকে চাপ দেওয়া হইল। আগস্ট মাসে, নূতন বড়লাটের সহিত মহাত্মার দীর্ঘ আলোচনা হইল যাহার ফলে উত্তেজনা যথেষ্ট হ্রাস পাইল। চুক্তি পালন না করা সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল ঐ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য মহাত্মা সালিশী চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে বড়লাট রাজী হইলেন না। যাহা হউক, মহাত্মা কর্তৃক আনীত বিশেষ বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। কংগ্রেস নেতা ও বড়লাটের মধ্যে

শেষ সময়ে কোনও রকমে একটি রফা হইল। বিশেষ ট্রেনযোগে মহাত্মা বোম্বাই রওনা হইলেন এবং এস. এস. রাজপুতানা জাহাজ ছাড়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সেখানে গিয়া পৌঁছাইলেন। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী দেশের মাটিতে মহাত্মা পা দিলেন। পরদিন তিনি লন্ডনে।

১২

ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী (১৯৩১)

কটি-বস্ত্র পরিহিত, পায়ে চপ্পল এবং নিদারুণ শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাত্র একটি চাদর-সম্বল অবস্থায় ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা মার্সাই-এ অবতরণ করিলেন। বৃটিশ ও ভারতীয় বন্ধু এবং অনুরাগীদের নির্বাচিত একটি দল সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে লন্ডনে যান। সেখানে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে সোজা লইয়া যাওয়া হয় 'ফ্রেন্ডস্ হাউস'-এ এক সম্বর্ধনা সভায়। স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে বৃটিশ গভর্নমেন্টের উল্লেখ করিয়া তিনি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেন : 'ভারত ও ইংলন্ডের সম্পর্কের মধ্যে আগে ভারসাম্য সৃষ্টি না করিলে আপনাদের বাজেটে যথার্থ ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।'

মহাত্মার পক্ষে তাঁহার স্বভাবসুলভ কটি-বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইউরোপ ভ্রমণ করা সঙ্গত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে যাঁহাদের এক সময়ে আশঙ্কা ছিল, লেখকও ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ইহার পূর্বে তিনি যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন তখন অবশ্য তাঁহার পোশাক ছিল ভিন্ন। কিন্তু এবার তিনি তাঁহার ঐ প্রিয় পোশাকের পরিবর্তন না করিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন। তাঁহার পোশাক সম্বন্ধে একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করিলে মহাত্মা একবার রহস্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন : আপনারা "প্লাস-ফোর" পরিধান করেন আমি "মাইনাস-ফোর" পরিয়া থাকি। অতঃপর অধিকতর গুরুত্ব সহকারে তিনি বলিয়াছিলেন : 'একজন ইংরাজ নাগরিকের ন্যায় যদি আমি এখানে থাকিয়া কাজ করিতে আসিতাম তাহা হইলে এ দেশের প্রথানুযায়ী আমি চলিতাম এবং ইংরাজের পোশাক পরিধান করিতাম। কিন্তু আমি এখানে আসিয়াছি এক মহান্ ও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া, এবং আমার এই কটি-বন্ধ– যদি আপনারা আমার পোশাকের এই বর্ণনাই দিতে চান—ভারতবাসীর পোশাক—যাঁহারা আমার প্রভুস্বরূপ।' তাঁহার দেশবাসিগণ আজ গর্ব বোধ করেন যে, তিনি যাঁহাদের সেবক তাঁহাদের পোশাক তিনি পরিত্যাগ করেন নাই এবং এমন কি বাকিংহাম প্রাসাদের ভোজসভায়ও ঐ পোশাকেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে থাকাকালীন

মহাত্মা বারো বাঁর গোল-টেবিল বৈঠকে[১] বক্তৃতা দেন—৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর, এই দুই বার বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে, ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে আট বার ও দুই বার সংখ্যালঘু কমিটিতে। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে প্রথম বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা এবং করাচী কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের কথা বুঝাইয়া দেন এবং বলেনঃ 'এক সময় ছিল যখন বৃটিশের প্রজা বলিয়া ও ঐরূপে অভিহিত হইয়া নিজে আমি গর্ব বোধ করিতাম। বহু বৎসর হইল নিজেকে বৃটিশের প্রজা বলা আমি ছাড়িয়া দিয়াছি; প্রজা না বলিয়া বরং আমাকে বিদ্রোহী বলা অনেক ভাল। কিন্তু এখন আমি যাহা চাহিয়াছি—এবং এখনও চাই—তাহা এই, সাম্রাজ্যের ভিতরে নয়, কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিয়া নাগরিকত্ব; যদি সম্ভব হয়, যদি ঈশ্বর কৃপা করেন—উহা হইবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে—একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারিত্ব যাহা জোর করিয়া এক জাতি আর এক জাতির উপর চাপাইয়া দিবে না।' (এই বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবটি সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বৃটেনের সহিত একটা মীমাংসার জন্য মহাত্মা চেষ্টা করিতেছিলেন।)

এস. এস. রাজপুতানা জাহাজে সাংবাদিকদিগের সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি ছিলেন পুরাপুরি আশাবাদী। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির যে দ্বিতীয় বৈঠক হয় উহার পূর্বেই মোহমুক্তি ঘটিতে লাগিল। গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যগণ যে কি প্রকৃতির তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে সুরু করিলেন। কাজেই, ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বক্তৃতার সুরুতেই তিনি বলিলেনঃ 'প্রতিনিধিদের তালিকাটি আমি বিচার করিয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছি যাহা পূর্বে আমি করি নাই; এবং পরিতাপের সহিত প্রথম যে অনুভূতি আমার মধ্যে জাগিতেছে তাহা এই যে, আমরা যে জাতির প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি তাহার মনোনীত প্রতিনিধি আমরা নই বরং গভর্নমেন্ট আমাদের মনোনীত করিয়াছেন। উপরন্তু অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে ভালরূপে জানি বলিয়া, যখন আমি

[১] ১০৭ জন সদস্য লইয়া দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন বৃটিশ ভারত হইতে, ২২ জন ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের এবং বৃটিশদিগের তিনটি দল হইতে ২০ জন। বৈঠকে যাঁহাদের লইয়া সংখ্যালঘু কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাঁহারা হইলেন—৬ জন বৃটিশ, ১৩ জন মুসলমান, ১০ জন হিন্দু, অনুন্নত শ্রেণীর ২ জন, শ্রমিকদের ২ জন, ২ জন শিখ, ১ জন পার্সী, ২ জন ভারতীয় খৃস্টান, ভারতে বসবাসকারী বৃটিশদের ২ জন, ১ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ৩ জন নারী—মোট ৪৪ জন। যে মুসলমানগণ ভারতীয় জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ, তাঁহাদের প্রতিনিধি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশী এবং একজন মাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমান তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

প্রতিনিধিদের তালিকাটি বিচার করিয়া দেখি তখন কিছু কিছু ফাঁক[১] আমার চোখে পড়ে, এবং সেজন্য আমাদিগের প্রতিনিধিত্বের অবাস্তবতার দ্বারা আমি পীড়িত বোধ করিতেছি।' বৃটিশ রাজনীতিকদের মতলব মহাত্মা ধরিয়া ফেলিতে সুরু করিয়াছিলেন—সেজন্য অবস্থার গতি তাঁহাদের প্রতিকূলে চালিত করিবার জন্য তিনি বাস্তব প্রস্তাব করিতে তাঁহাদের আহ্বান জানাইলেন। (ঐ আহ্বানের উত্তরে গভর্নমেন্ট সংখ্যালঘু কমিটির সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলিতে চেষ্টা করিলেন যাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।) ঐ সভাতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের জবাব দিতে গিয়া মহাত্মা বলিলেনঃ 'যদিও আজিকার গভর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে আমরা উহার পাল্টা একটি গভর্নমেন্ট গঠন করিয়াছি তথাপি আমি নিজ রীতি অনুযায়ী ঐ অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইতে চাই। যদিও আমরা পাল্টা কোনও গভর্নমেন্ট[২] প্রতিষ্ঠা করি নাই, আমাদের নিশ্চয়ই এই আকাঙ্ক্ষা আছে যে, কোনও না কোনও দিন বর্তমান গভর্নমেন্টকে আমরা উৎখাত করিব এবং যথাসময়ে, বিবর্তনের মধ্য দিয়া ঐ গভর্নমেন্টের ভারও গ্রহণ করিব।'

১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির সম্মুখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতা দেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে আশঙ্কার ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেন তাহা এখন উপলব্ধি করা হইয়াছিল এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি মীমাংসায় পৌঁছিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। যেহেতু সদস্যগণ ছিলেন গভর্নমেন্টের মনোনীত ব্যক্তি সেজন্য ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নেতৃবৃন্দের দিল্লী ইস্তাহারের বিরুদ্ধে লেখক ও অন্যান্য বিরোধিগণ যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন উহাতে স্পষ্টভাবেই এই ফলাফলের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে মহাত্মা বলিলেনঃ 'গভীর দুঃখ ও গভীরতর লজ্জার সহিত আমাকে আমার দিক হইতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সহিত ও তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘরোয়া আলোচনা হইয়াছে উহার মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের একটা সর্বসম্মত মীমাংসা খুঁজিয়া বাহির করার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করিতে হইতেছে......কিন্তু এই আলোচনার ব্যর্থতা যে আমাদের পক্ষে একটি চরম লজ্জার বিষয় ইহা বলিলে

[১] *ইহা বলা হইয়াছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে; অন্যান্যদিগের মধ্যে তাঁহাদের অনুপস্থিতি মহাত্মা এখন উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছিলেন। মহাত্মার এই আবিষ্কার যে কিছুটা দেরীতে হইয়াছে ইহা না ভাবিয়া উপায় নাই।*

[২] *১৯২৯ সালে লেখক লাহোর কংগ্রেসে এই মর্মে একটা প্রস্তাব আনিয়াছিলেন যে, পাল্টা একটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য কংগ্রেসের থাকা উচিত। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই, মহাত্মার সকল ভক্তগণই ইহার বিরুদ্ধে ভোট দেন।*

সম্পূর্ণ সত্য বলা হইবে না। ভারতীয় প্রতিনিধি দল যেভাবে গঠন করা হইয়াছে উহার মধ্যেই এই ব্যর্থতার কারণগুলি নিহিত ছিল। আমরা প্রায় সকলেই যে সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে তাঁহারা আমাদিগকে নির্বাচিত করেন নাই—আমরা এখানে আসিয়াছি গভর্নমেন্টের মনোনীত হইয়া। তাহা না হইলে সর্বসম্মত একটি মীমাংসার জন্য যাঁহাদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল তাঁহাদের এখানে দেখা যাইত। উপরন্তু, বলা বোধহয় অসংগত হইবে না যে—সংখ্যালঘু কমিটির সভা ডাকার পক্ষে ইহা উপযুক্ত সময় ছিল না। ইহা আমাদের বাস্তবতাবোধেরই অভাব যে, কি আমরা লাভ করিতে চলিয়াছি ইহা আমাদের জানা নাই......কাজেই আমি এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, সংখ্যালঘু কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা এবং যত শীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্রের মূল সূত্রগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হউক......গোল-টেবিল বৈঠকে চরম প্রয়াস পাইবার পরও যদি মীমাংসার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তথাপি প্রত্যাশিত শাসনতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করার প্রস্তাব আমি করিব যদ্দ্বারা একটি বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগের কথা বলা হইবে: উহা সমস্ত দাবীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং যে সকল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতে পারে সেগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দিবে।' এই বক্তৃতাটি পড়িয়া দেখিলে ইহা না ভাবিয়া উপায় নাই যে, 'গভর্নমেন্টের মনোনীত ব্যক্তিরা' যে সমস্ত ক্ষতিকর প্রস্তাব আনিয়াছিলেন উহাতে বাধা দিবার জন্য মহাত্মা যদি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের একটি পূর্ণ বাহিনী লইয়া লন্ডনে আসিতেন তাহা হইলে কি পরিবর্তনই না ঘটিত। ইহাও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়াই হইবে যে সংখ্যালঘু কমিটির প্রধান কাজ—করাচী কংগ্রেসের অনতিকাল মধ্যেই দিল্লীতে মহাত্মাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্ত্বেও, ইহা উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিচার বিভাগীয় সালিশী গঠনের প্রস্তাব করা নিশ্চয়ই মহাত্মার পক্ষে আর একটি ভুল হইয়াছিল যাহা অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং খুব সম্ভব প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ন্যায় একই দলিল পেশ করিবে। বৃটিশ গভর্নমেন্ট যদি মহাত্মার কথা মানিয়া লইয়া বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে মহাত্মার অবস্থা আজ কি হইত?

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসার পূর্বে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির তথাকথিত প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই চুক্তিটি সংখ্যালঘু চুক্তিরূপে অভিহিত—

উহা শাসনতন্ত্রে অত্যধিক সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস তাঁহাদিগকে দিয়াছিল। এই চুক্তিটি করা হইয়াছিল গভর্নমেন্টের পূর্ণ অনুমোদন লইয়া এবং ভারত হইতে আগত বৈঠকের বৃটিশ সদস্যগণের ইহাতে একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। যাহা হউক, শিখেরা এই চুক্তিতে যোগদান করেন নাই। এই চুক্তি করিবার পূর্বে, অনুন্নত শ্রেণীগুলির মনোনীত প্রতিনিধি ডাঃ আম্বেদকর মহাত্মার সহিত একটি চুক্তি করিতে চাহিয়াছিলেন যদ্দ্বারা হিন্দুদের সকল শ্রেণীর যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে আইনসভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। সেই সময়ে এরূপ কোনও আপোষের কথা মহাত্মা ভাবিতেও পারেন নাই। ডাঃ আম্বেদকর যখন সংখ্যালঘু চুক্তিতে যোগ দিলেন তখন তিনি কেবল অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য আসনের সংখ্যা সম্বন্ধেই নয় বরং তাঁহাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যাপারেও আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তখন যদি ডাঃ আম্বেদকরের সহিত একটা মীমাংসা করা হইত তাহা হইলে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মার ঐতিহাসিক অনশনের পর যে পুণা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল উহাপেক্ষা ইহার শর্তগুলি অনেক ভাল হইত।

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির সভায় চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যালঘু চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া দাবী করেন যে, ভারতের সাড়ে এগারো কোটিরও বেশী অধিবাসীর পক্ষে ইহা গ্রহণযোগ্য। পূর্বেকার সভায় মহাত্মা যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উহারও জবাব দেন এবং অপর পক্ষে জোর দিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে অসামর্থ্যই শাসনতন্ত্র রচনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। মহাত্মা তাঁহার বক্তৃতায় জোরের সহিত এই উভয় উক্তিরই যাথার্থ্য প্রমাণের আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং প্রথমটির উল্লেখ করিয়া দাবী জানাইয়াছিলেন যে, কংগ্রেস কেবল বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের নয়, সমগ্র ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগের প্রতিনিধি। ঐ একই বক্তৃতায় মহাত্মা একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছিলেন ঃ 'পূর্বে যাহা বলিয়াছি উহার পুনরুক্তি করিয়া আমি বলিতে চাই যে—হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোনও সমাধানই যদিও কংগ্রেসের পক্ষে সর্বদা গ্রহণীয় কিন্তু অন্য কোনও সংখ্যালঘুর[১] জন্য বিশেষ সংরক্ষণ বা বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী মানিয়া লইতে দল প্রস্তুত নয়।' মহাত্মা পুনরায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে চূড়ান্ত রায়দানের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগের উপর জোর দিলেন।

[১] এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুণা চুক্তিতে মহাত্মার অনুমোদন দুর্বোধ্য, কারণ ঐ চুক্তিতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা

১৯৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত যথোচিত গুরুত্বের সহিত ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে পেশ করিলেন। তিনি জোর দিয়া বলিলেন যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের আদালতের এক্তিয়ার যথাসম্ভব ব্যাপক হইবে এবং ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা হইতে যে সকল মামলার উদ্ভব হইবে মাত্র ঐগুলিরই নিষ্পত্তি করিবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের মামলার জন্যই একটি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা গভর্নমেন্টের মধ্যে পড়ে না এরূপ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জন্য আর একটি—দুইটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিলেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক বিষয়ে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সৈন্যবাহিনী, বৃটিশই হউক বা ভারতীয়ই হউক, দখলকারী সৈন্য-বাহিনী। 'আমি ইহা জোরের সহিত বলিব যে, বিদেশী শাসনের উত্তরাধিকারিরূপে সমস্ত প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে আমি ভারত গভর্নমেন্ট পরিচালনার প্রত্যাশিত দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে যদি সমগ্র এই সৈন্যবাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে না আসে তাহা হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত...... যদি বৃটিশ জাতি মনে করেন যে, উহার জন্য আমাদের একশত বৎসর লাগিবে তাহা হইলে ঐ একশত বৎসর কংগ্রেস দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং অবশ্যই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া পার হইবে......এবং যদি প্রয়োজন হয় ও ঈশ্বর চাহেন গুলিবর্ষণেরও সম্মুখীন হইবে।'

১৯৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে মহাত্মা প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে বৃটিশদিগের বাণিজ্যিক রক্ষাকবচ-গুলি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের পক্ষে স্বার্থহানিকর যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল উহার বিরোধিতা করেন; তিনি ইহাতে একমত হন যে, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকা অনুচিত। ইহাও তিনি স্বীকার করেন যে, 'বৈধভাবে অর্জিত ও সাধারণভাবে জাতির চরমতম স্বার্থের প্রতিকূল নয় বর্তমান এরূপ কোনও স্বার্থে, ঐগুলির প্রতি প্রযোজ্য আইনানুসারে ছাড়া, হস্তক্ষেপ করা হইবে না।' তবে ইহা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন যে, ভবিষ্যতের জাতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে 'দরিদ্রদিগের' অর্থাৎ অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বার্থে 'ধনীদের' বঞ্চিত করার প্রয়োজন হইতে পারে। বর্তমান স্বার্থগুলি সম্বন্ধে যখন প্রয়োজন হইবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হইবে—তবে ইহার সহিত কোনও জাতিগত প্রশ্ন জড়িত থাকিবে না। ভারতে ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বর্তমান অধিকারগুলিরও[১]

[১] যথা,—মামলায় ইউরোপীয় বিচারক কিংবা ইউরোপীয় জুরীলাভের অধিকার।

তিনি বিরোধিতা করেন। ২৫শে নভেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি তাঁহার পরবর্তী বক্তৃতায় এই অভিমত সমর্থন করেন যে, ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টকে যে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই, উহা পরীক্ষা ও নিরপেক্ষ তদন্তাধীন[১] হইবে। ভারতবাসীর দাবী অনুযায়ী মুদ্রামূল্যের হার ১ শিঃ ৪ পেঃ না করিয়া ১ শিঃ ৬ পেঃ ধার্য করায় তিনি নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন: 'ভারতবর্ষকে যদি সত্য সত্যই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় অর্থের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমি দাবী করিব। আমার মতে, যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের অর্থে একেবারে অবাধ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমাদের পক্ষে না সম্ভব হইবে দায়িত্ব গ্রহণ করা, না ইহা দায়িত্ব আখ্যা লাভের যোগ্য হইবে।' ঐদিনই আর একটি বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়া বলেন যে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রের দায়িত্ব অবশ্যই একসঙ্গে রাখিতে হইবে। 'বিদেশী কর্তৃত্বের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং দৃঢ় স্বায়ত্তশাসন (প্রদেশগুলির জন্য) পরস্পরবিরোধী উক্তি।' কেন্দ্রের দায়িত্বের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন: 'আমি কেন্দ্রের সেই দায়িত্ব চাই যাহা আমাকে সৈন্যবাহিনী ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দিবে, ইহা আপনারা সকলেই জানেন। আমি জানি যে, উহা এখানে এখনই আমি পাইব না এবং বৃটিশদিগের মধ্যে এমন একজন লোকও নাই যিনি উহা দিতে প্রস্তুত, ইহাও আমার অজানা নয়। কাজেই, আমি জানি, আমাকে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় দুঃখবরণের পথে জাতিকে আহ্বান করিতেই হইবে।'

৩০শে নভেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম বক্তৃতাটি একটি অমূল্য দলিল, যদিও একেবারে মোহমুক্তির নজির বলিয়া ইহা পাঠ করিলে বেদনা বোধ হয়। তিনি এই বলিয়া সুরু করিয়াছিলেন: 'এই সভায় অন্যান্য সমস্ত দলই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা বলিতে আসিয়াছে। একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র ভারত ও সকল স্বার্থের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতেছেন......এবং তথাপি এখানে আমি দেখিতেছি যে, কংগ্রেসকে ঐ সমস্ত দলগুলির একটি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে......সমস্ত বৃটিশ জননায়ক, বৃটিশ মন্ত্রীকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝাইয়া দিতে চাই যে, কল্যাণ সাধন করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে......কিন্তু না, যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তথাপি আপনারা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন না। যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তবু আপনারা ইহার

[১] এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেস কর্তৃক যে সরকারী ঋণ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয় উহার রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন।

সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করিতেছেন।' সাম্প্রদায়িক সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি এই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলেন 'যতদিন বিদেশী শাসনরূপ বেড়ার দ্বারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হইবে ততদিন প্রকৃত বাস্তব কোনও সমাধান, এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তব সৌহার্দ্য সম্ভব হইবে না।' জাতীয় দাবীর প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ছিল : 'যে নামই আপনারা গোলাপকে দিন না কেন, সেই নামেও ইহার সুগন্ধ থাকিবে; কিন্তু আমি যে গোলাপ চাই ইহা কোনও কৃত্রিম সৃষ্টি নহে, ইহাকে অবশ্যই স্বাধীনতার গোলাপ হইতে হইবে।' তারপর স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার দাবীকে নরম করিবার জন্য এই কথাগুলি বলিয়া তিনি আবেদন জানাইলেন : 'ইংরাজদিগের সঙ্গে আমি একজন অংশীদার হইতে চাই; কিন্তু আপনাদের জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আমি যথার্থভাবে সেই স্বাধীনতাই ভোগ করিতে চাই এবং শুধু মাত্র ভারতবর্ষ ও পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য এই অংশীদারি লাভ করিতে আমি চাহিতেছি না।' তারপর সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হইল দেখিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন : 'এই সকল বিপ্লবীরা তাঁহাদের রক্ত দিয়া যাহা লিখিতেছেন উহা কি আপনারা দেখিবেন না?' এবং তারপর তিনি বলিলেন : 'আশা নাই জানিয়াও আমি আশা করিব, আমার দেশের পক্ষে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য সর্বশক্তি দিয়া আমি চেষ্টা করিব......ঐ ধরনের একটি লড়াইয়ে আবার তাঁহাদের ঠেলিয়া দেওয়াটা আমার কাছে কোনও আনন্দ ও স্বস্তির ব্যাপার হইতে পারে না, কিন্তু আরও যদি অগ্নিপরীক্ষা আমাদের অদৃষ্টে থাকে তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বেশী এই আনন্দ ও সান্ত্বনা লইয়া আমি উহার সম্মুখীন হইব যে, যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই আমি করিয়াছি, দেশ যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই সে করিয়াছে।'

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনের যে শেষ বৈঠক হয় উহাতে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এই ঘোষণাটি করেন :

'বৎসরের (১৯৩১) সুরুতে তদানীন্তন গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে আমি একটি ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং বর্তমান গভর্নমেন্টের দ্বারা ইহার নীতি সম্বন্ধে আপনাদের এবং ভারতবর্ষকে নির্দিষ্ট কয়েকটি আশ্বাস দিতে আমি অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

'মহামান্য সরকার বাহাদুরের মত হইতেছে এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক —আইন সভাগুলিতে ভারত গভর্নমেন্টের দায়িত্ব দিতে হইবে,—সেই সঙ্গে পরিবর্তনকালে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা পালন এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশ্বাস প্রদানার্থ এবং সংখ্যালঘুদের রাজ-

নৈতিক অধিকার সকল রক্ষার জন্য তাঁহাদের পক্ষে যে আশ্বাসগুলি প্রয়োজন সেগুলির জন্যও প্রয়োজনমত ব্যবস্থাদি ইহাতে থাকিবে। পরিবর্তনকালের প্রয়োজনগুলি মিটাইবার জন্য রচিত ঐরূপ সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে যেন এমনভাবে গঠন ও প্রয়োগ করা হয় যাহাতে নূতন শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে তাহার নিজের গভর্নমেন্টের পূর্ণ দায়িত্ব লাভের পথে তাহার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

'কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুরের পূর্বেকার গভর্নমেন্ট ইহা পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট অবস্থা সাপেক্ষে আইনসভার প্রতি প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বের নীতি ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল—যদি উভয়টিই সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হইত।

'দায়িত্বের নীতিকে এই গুণসাপেক্ষ হইতে হইবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার অবশ্যই গভর্নর-জেনারেলের থাকিবে এবং অর্থ-দপ্তর সম্বন্ধে এরূপ শর্ত সকল অবশ্যই থাকিবে যাহা ভারতসচিবের ক্ষমতার নিকট দায়াবদ্ধ বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ ও ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব ও আমানতকে অটুট রাখা সুনিশ্চিত করিবে।

'সর্বশেষে ইহাই আমাদের মত যে, গভর্নর-জেনারেলকে আবশ্যক ক্ষমতাদি অবশ্যই দিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘুদের শাসনতান্ত্রিক অধিকারগুলি পালনের ব্যাপারে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখায় তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হন।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া মহাত্মা বলেন যে খুব সম্ভব তাঁহাকে ভিন্ন পথে চলিতে হইবে কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেন যদি সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ও উভয় পক্ষই বিরূপতা ত্যাগ করিয়া তাহা পরিচালনা করিবেন। তিন দিন পর মহাত্মা প্রধানমন্ত্রীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া লন্ডন ত্যাগ করিলেন। লন্ডন ত্যাগ করিবার পূর্বে সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় সুরু করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে, স্থানীয়ভাবে অন্যায় ও অত্যাচারের বিশেষ ঘটনার বিরুদ্ধে—যথা, বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে যে-সমস্ত জরুরী আইন চালু হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে—অসহযোগ আন্দোলন সুরু করা সম্ভব।

ইংলন্ডে প্রায় তিন মাস বসবাসকালে মহাত্মাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাঁহার দৈনিক কার্যসূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। কখনও কখনও একটানা কয়েক দিনের মধ্যে নিজেকে দুই ঘণ্টার বেশী ঘুমাইবার সময়ও দেন নাই। তিনি সেখানে নানা

ধরনের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন—পার্লামেন্টের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, মিশনারী, বিশিষ্ট সমাজনেত্রী, সমাজসেবক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ছাত্র, আরও কত। সাপ্তাহান্তিক ছুটিতে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড অথবা ল্যাঙ্কাসায়ারে ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁহার সকল কার্যে ধারাবাহিকতার অভাব ও লক্ষ্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় সদস্যেরা অনুযোগ করিতেন যে, প্রয়োজনের সময় মহাত্মাকে পাওয়া কঠিন হইত। গোল টেবিল্‌ বৈঠকের উদারনৈতিক সদস্যগণ অভিযোগ করিলেন যে, নিজের উপর সব দায়িত্ব না লইয়া তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দলগুলিকে একত্র করিয়া একটি সংযুক্ত জাতীয় দলের[১] নেতা হইয়া উঠিতে পারিতেন। এই সকল সমালোচনার যাথার্থ্য যাহাই হউক না কেন ইহাতে সন্দেহ নাই যে মহাত্মার ইংলন্ড ভ্রমণ ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল—আদৌ কোন পরিকল্পনা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ—এবং তাঁহার ব্যক্তিগত দলটির মধ্যে কোন দক্ষ পরামর্শ-দাতা ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লন্ডনের বৈঠকে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত লইতে ইতস্ততঃ করাই এই পরিকল্পনার অভাবের ও তাঁহার বিলম্বে লন্ডনে পৌঁছাইবার কারণ। এই বিলম্বের ফলে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সহিত তুলনায় গভর্নমেন্ট নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল পরিকল্পনা পূর্ব হইতে সযত্নে রচিত হইয়াছিল। লন্ডনে পৌঁছিবার পর তিনি বুঝিতে পারেন যে যেখানে কংগ্রেস উপস্থিত অনেকগুলি দলের অন্যতমমাত্র এবং তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি সেখানে গভর্নমেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সহিত সম্মেলনে মিলিত হওয়া কি ব্যাপার! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে অনেক সাধারণ লোক সাবধান করা সত্ত্বেও, মহাত্মার মত একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা এত বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু, লন্ডনে মহাত্মার ব্যর্থতার কারণ আরও গভীর। যদি মহাত্মা গোল টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তবে তাঁহার ১৯৩০ সালে যাওয়া উচিত ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে যে শর্তগুলি তাঁহাকে দেওয়া হয় তাহা ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বচ্ছন্দেই লাভ করিতে পারিতেন। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্‌ সম্বন্ধে যে আশ্বাস তিনি ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে দাবী করিয়াছিলেন তাহা তিনি ১৯৩১ সালেও পান নাই এবং গান্ধী-আরুইন চুক্তির অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে বলা যায় যে লর্ড আরুইন খুব সম্ভব যে-কোন সময়ে সেগুলিতে স্বীকৃত হইতেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস অত্যন্ত সহজেই

[১] ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার, জানুয়ারী, ১৯৩২ সংখ্যায় রাইট অনারেবল ভি. এম. শাস্ত্রী এই মত ব্যক্ত করেন।

বৈঠকের অর্ধেক আসন লাভ করিতে পারিত। ১৯৩১ সালে একাকী ও বন্ধুহীন ভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাকে এই কূটনৈতিক অসুবিধায় পড়িতে হইল যে, তিনি এমন এক সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন যাহা কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী সদস্যদের দলাদলির ভিত্তিতে মহাত্মাকে কাজ করিতে হইবে। ১৯৩০ সালে ইংলন্ডে যখন শ্রমিক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ও দিল্লীতে লর্ড আরুইন ছিলেন তখন কংগ্রেস বৈঠককে সম্পূর্ণ অন্য ধারায় চালিত করিতে পারিত। ১৯৩১ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রমিক মন্ত্রিসভার স্থলে একটি প্রায়-রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—লর্ড আরুইনের বদলে লর্ড উইলিংডন আসিয়াছেন এবং ইন্ডিয়া অফিসে ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেনের স্থানে স্যার স্যামুয়েল হোর বসিয়াছেন। যখন অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদল (জাতীয় গভর্নমেন্ট) বিপুল ভোটাধিক্যে ক্ষমতাসীন হইল তখন আমাদের শেষ আশাও লুপ্ত হইয়া গেল।

এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মহাত্মা যখন ইংলন্ডে গেলেন তাঁহার বৈঠকের কাজে একান্তভাবে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল যাহাতে গভর্নমেন্টের সব কলাকৌশল পরাস্ত করা যায়। খুব সম্ভব দীনবন্ধু এন্ড্রুজ প্রমুখ ভারতবন্ধু বৃটিশদের প্রভাবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই ধারণা হইল যে, বৃটিশদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সঞ্চার করার জন্য তাঁহার ঘুরিয়া বেড়ানো দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে ইংলন্ডে যান নাই এবং অল্প সময়ে তাঁহার সীমাবদ্ধ সামর্থ্য লইয়া এই কাজ করা সম্ভবও ছিল না। মহাত্মা যে-সমস্ত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেই তালিকাটি দেখিলে ইহা মনে না হইয়া পারে না যে, বেশীর ভাগ সাক্ষাৎকারই অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। তিনি যদি সাধারণ প্রচারমূলক ভ্রমণে আসিতেন তাহা হইলে তিনি যে-ধরনের সফরসূচী করিয়াছিলেন তাহা সার্থক ও যুক্তিসম্মত হইত।

মহাত্মার ব্যর্থতার আরও একটি গভীরতর কারণ ছিল। ইংলন্ডে বাসকালে তাঁহাকে মাঝে মাঝে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইত—রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা ও বিশ্বোপদেষ্টার ভূমিকা। একজন রাজনৈতিক নেতার শত্রু পক্ষের সহিত আলোচনাকালে যেমন ব্যবহার করা উচিত তিনি তাহা করিতেন না। তিনি যেন একজন প্রচারক—অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর নূতন বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছেন। এই দ্বিতীয় ভূমিকার জন্য এমন লোকেদের সহিত তাঁহার সময় ব্যয় করিতে হইত যাঁহারা তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রয়োজনে আসিত না। নিজের দলের পরামর্শদাতার অভাব তাঁহার ইংরাজ ভক্তরা পূরণ করিয়াছিল। তাঁহার ইউরোপে পদার্পণ করার মুহূর্ত হইতে শেষ দিন পর্যন্ত ইহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার পক্ষপাতিত্বশূন্যতা ও বিশ্বপ্রেম

প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একজন ইংরাজ রমণীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মহাত্মার সহিত তুলনায় ১৯২৯ সালের আইরিশ সিন ফিন সদস্যগণ ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বৃটিশদের সহিত সামাজিকতা পরিহার করিয়া চলিতেন। এই দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলা ও উদাসীনতা বৃটিশদের মনে মহাত্মার বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব অপেক্ষা অনেক বেশী রেখাপাত করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করায় লোকের সহিত ব্যবহারে মহাত্মার একটি নিজস্ব পদ্ধতি ছিল।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি গোল টেবিল বৈঠকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বৈঠকে ভারতীয় উদারনৈতিক রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহার প্রভাবের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সশরীরে একাকী উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাঁহার নামের সহিত যে জৌলুষ ও মহিমা জড়িত ছিল তাহার অনেকখানি হারাইলেন। ১০৭ জনের একটি দলে জনৈক একাকী ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিহিসাবে তাঁহাকে এক বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে কংগ্রেস সদস্যদের জন্য যে ১৫।১৬টি আসন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যদি তিনি গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার অবস্থা আজ অনেক বেশী দৃঢ় হইত। এক দল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির সহিত তর্কযুদ্ধে তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিতেন। উপরন্তু, মহাত্মা দর-কষাকষির ব্যাপারে ঠিক উপযুক্ত ছিলেন না। সেজন্য, ভার্সাই চুক্তির সময়ে প্রেসিডেন্ট উইলসনের যাহা হইয়াছিল তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। আমেরিকার এই অধ্যাপক-প্রেসিডেন্ট ওয়েলসের জাদুকর মিঃ লয়েড জর্জের একেবারেই সমকক্ষ ছিলেন না। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী-রাজনীতিকও চতুর মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সমকক্ষ ছিলেন না। বৃটিশদের পক্ষ হইতে মহাত্মার সহিত খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল। সামগ্রিকভাবে ইংলন্ডে তিনি অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেকথা তিনি ইংলন্ড ছাড়িবার পূর্বে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। লন্ডনে চলাফেরা করিবার সময় তাঁহাকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার দৈহিক নিরাপত্তার অজুহাতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুইজন বিশেষ কর্মী তাঁহার কাছে মোতায়েন করা হইয়াছিল। ফলে তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রম ও সাক্ষাৎকারগুলি সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবর সংগ্রহ করিতে কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইত না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই রক্ষী লইতে মহাত্মা কেন সম্মত হইলেন তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ। যদি রক্ষী নিতান্তই প্রয়োজন ছিল লন্ডনে তাঁহার অগণিত ভক্ত ও অনুচরবর্গের দ্বারা সহজেই সে কাজ হইতে পারিত।

একথা পূর্বেই বলিয়াছি যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতাসীন হইল তখন মীমাংসার শেষ আশাও বিলুপ্ত হইল। ভারতীয় অবস্থা এবং ভারতীয় নেতার সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা শ্রমিক দলের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তাঁহার উদারতা, স্পষ্টবাদিতা, বিনীত আচরণ, শত্রুপক্ষের প্রতি তাঁহার সুগভীর দরদ এই সমস্ত জন্ বুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে তো পারেই নাই বরং দুর্বলতারূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার সবকিছু খোলাখুলিরূপে আলোচনা করার অভ্যাস ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়দের সহিত ব্যবহারে চলে কিন্তু তাহা বৃটিশ রাজনীতিকদের কাছে তাঁহার মর্যাদার হানি করিয়াছিল। অর্থনীতি ও আইনের জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করার অভ্যাসও সত্যসন্ধানী দার্শনিকদের সমক্ষে দোষের হইত না কিন্তু যে ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ যত না জানেন তাহার অপেক্ষা বেশী জানার ভান করেন তাঁহারা ইহাই দেখিতে অভ্যস্ত: তাঁহাদের কাছে তাঁহার সম্মান কমিয়া গিয়াছিল। গোল টেবিল বৈঠকে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করার প্রস্তাব বার বার করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়াছিল। বৃটিশেরা ভাবিল গান্ধীজীর শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। ইংলন্ডের অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের কাছে এই ধরনের উক্তির কি ফল হইবে? "যতদিন প্রয়োজন হয় আমি এখানে থাকিব কারণ আমি আবার অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিতে চাই না। দিল্লীতে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাকে আমি একটি চিরস্থায়ী মীমাংসায় পরিণত করিতে চাই। দোহাই আপনাদের বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষটিকে একবার সুযোগ দিন। তাহার এবং যে প্রতিষ্ঠানের সে প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রতিষ্ঠানকে একটু দাঁড়াইবার ঠাঁই[১] দিন।"[২] অপরপক্ষে মহাত্মা যদি ডিক্টেটর স্ট্যালিন, ডুচে মুসোলিনী অথবা ফুয়েরার হিটলারের ভাষায় কথা বলিতেন—জন্ বুল তাহা বুঝিত ও শ্রদ্ধায় মস্তকাবনত করিত।—"কটিবস্ত্র পরিহিত এই শীর্ণকায় মানুষটি এতই কি ভয়ংকর যে শক্তিশালী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তাহার কাছে নতি স্বীকার করিতে হইবে? ভারতবর্ষ এমন একটি ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে যে পাদ্রী হইলে মানাইত এবং সেজন্যই যত গণ্ডগোল। যদি দিল্লীতে ও ইন্ডিয়া অফিসে একজন শক্ত লোক নিয়োগ করা যায় তবেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

১৯৩১ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা এইভাবেই পরিমাপ করা হইতেছিল। পাদ্রী, অধ্যাপক এবং খেয়ালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার সর্ববিধ প্রচার ভারতবর্ষের কোন কাজেই লাগিতেছিল না। তুমি নিজে যত শক্তিশালী তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিশালীরূপে নিজেকে প্রচার

[১] দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে উহারা ভালভাবে কোণঠাসা করিতে পারিয়াছিল।

[২] ৩০শে নভেম্বর ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে প্রদত্ত মহাত্মার বক্তৃতা।

করাই হইতেছে রাজনৈতিক দর-কষাকষির গোপন কথা। ভারতীয় রাজনৈতিকেরা যদি তাঁহাদের বৃটিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত দাঁড়াইতে চান তবে তাঁহাদের যাহা জানেন না এমন অনেককিছু শিক্ষা করিতে হইবে এবং যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার অনেককিছু ভুলিয়া যাইতে হইবে।

গোল টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত মহাত্মার বক্তৃতাগুলি অনুধাবন করিলে প্রতি পদে পদে বেদনা বোধ করিতে হয়। একেবারে শুরু হইতেই যে তাঁহাকে অন্যান্য দলগুলির সহিত বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া কংগ্রেসের মর্যাদা বিষয়ে সবিস্তারে বলিতে হইয়াছে এবং বার বার তাঁহার মন্তব্যগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে—ইহার দ্বারা শুধু বুঝা যায় যে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতেই একটি ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। বৈঠকে মহাত্মা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন কমিটিগুলি কর্তৃক যে সমস্ত রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে ঐগুলিতে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে,—অথচ তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া যে লিপিটি দিয়াছিলেন উহাকে একেবারে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন ইহা কেবল মাত্র এক ব্যক্তিরই মত প্রতিফলিত করিয়াছে। তাঁহার লন্ডন পেঁৗছিবার কয়েক সপ্তাহ পরেই মহাত্মা, অবস্থা যে আশাজনক নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কোনও রাজনৈতিক কৌশল থাকিত তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বৈঠক হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য উপযুক্ত সুযোগের সন্ধান তিনি করিতেন এবং তারপর বৈঠকের অবাস্তবতা প্রকাশ করিয়া দিতে ও ভারতের উদ্দেশ্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিতেন। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে থাকিয়া গিয়া তিনি অযথা এমন একটি সভাকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন, বিশ্বের জনমতের দরবারে যাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল।

ইংলন্ড ত্যাগ করার পর মহাত্মা কয়েক দিন প্যারিসে কাটান। সেখানে তাঁহার বন্ধু ও অনুরাগীর একটি দল জুটিয়াছিল—তাঁহারা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সংগ্রাম অপেক্ষা বিশ্বের কাছে একটি বাণী হিসাবে তাঁহার অহিংসায় অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্যারিসে তাঁহার স্বল্পস্থায়ী অবস্থানে খুব কাজ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতিকদের —কিংবা আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রকৃতই যে সমস্ত লোককে গণ্য করা হইয়া থাকে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে ভারতীয় প্রশ্নকে উত্থাপন করার কোন চেষ্টাও তিনি করেন নাই। প্যারিস হইতে তিনি জেনেভা যান। সেখানেও তিনি একদল বন্ধু পাইয়াছিলেন যাঁহাদের অনেকেই তাঁহার রাজনীতি অপেক্ষা তাঁহার দর্শনে অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেনেভায় গেলেও, জাতি সঙ্ঘ সংগঠনের গণ্যমান্য লোকদিগের সান্নিধ্যে তাঁহাকে লইয়া

যাওয়ার গুরুতর কোনও চেষ্টা হয় নাই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যালয়েও তিনি যান এবং ঐ পর্যন্তই। যাহাই হউক, তাঁহার সময়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটুকু অতিবাহিত হয় সুইজারল্যান্ডে সেই মহান্ ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ্—ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু রোমাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যে। ভারতের বাহিরে আজ এই মহৎ-হৃদয় ব্যক্তিটি অপেক্ষা তাহার আর বড় বন্ধু কেহ নাই, এবং সেজন্যই মহাত্মা এই ফরাসী পণ্ডিতের সান্নিধ্যে তাঁহার কিছু সময় কাটাইয়া ভারতের মহদুপকার করিয়াছেন। সুইজারল্যান্ড্ হইতে মহাত্মা ইটালীতে যান। ইটালীর অধিবাসী ও গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হইয়াছিল, এবং গভর্নমেন্টের প্রধান সিনর মুসোলিনী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সাক্ষাৎকার ছিল নিশ্চয়ই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইটালীর একচ্ছত্র নায়ক তাঁহার প্রয়াসে সাফল্য কামনা করিয়া ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানান। ইউরোপ মহাদেশে ইহাই ছিল একমাত্র ঘটনা যাহাতে মহাত্মা এমন এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যিনি বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক ইউরোপের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ফ্যাসিস্ট বিরোধী মহলে ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব, এবং ফ্যাসিস্ট বালকদিগের (ব্যালিল্লা) শোভাযাত্রায় তাঁহার অংশগ্রহণ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ইটালী ভ্রমণের দ্বারা মহাত্মা ভারতের অনেকটা উপকার করিয়াছিলেন। একমাত্র দুঃখ হইতেছে এই যে, তিনি সেখানে বেশীদিন থাকেন নাই এবং আরও লোকের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেন নাই।

সমগ্রভাবে মহাত্মার ইউরোপ-ভ্রমণকে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বলিতেই হইবে যে, দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এত বেশী সময় ইংলন্ডে ও ইউরোপ মহাদেশে এত অল্প সময় দিয়াছেন। এমন কি ইউরোপ মহাদেশেও রাজনীতিবিদ্, প্রধান প্রধান শিল্পপতি ও অন্যান্য লোক—যাঁহারা সত্য সত্যই আজিকার রাজনীতিতে গণ্যমান্য—তাঁহাদের প্রতি তিনি যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ দেন নাই। ঐ মহাদেশে এমন অনেক দেশ ছিল যেগুলিতে জনসাধারণ উৎসুক হইয়া তাঁহার ভ্রমণের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন এবং যে সব স্থানে তিনি সর্বাধিক আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিতেন। যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে অনায়াসেই তিনি ইউরোপে সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রধান দল ও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে পারিতেন—যাহাতে ভারতের যথেষ্ট উপকার হইত। কিন্তু হইতে পারে, উহাতে তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল না। ভারতের বাহিরে রাজনীতিবিদ্ ছাড়াও তিনি আর একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একই সঙ্গে দুইটি ভূমিকা গ্রহণ করা সব সময়ে সাধ্য নয়।